বহুমুখী

দ্বিতীয় সংখ্যা ● আশ্বিন ১৪২১

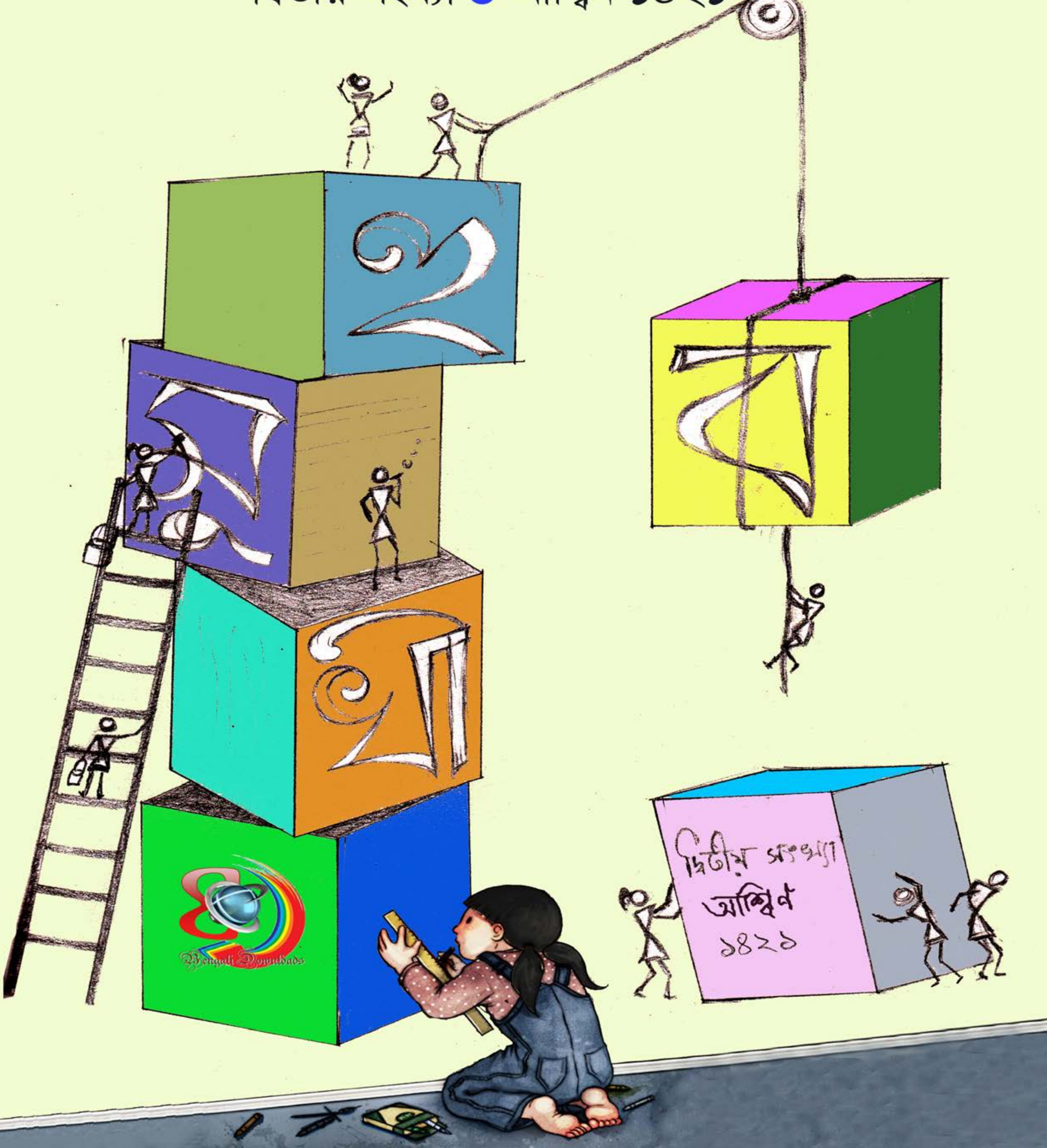

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৩

উপন্যাস

সবারে আমি নমি – অঞ্জন দত্ত ৫৪

গল্প

মৃত্যুঞ্জয়ী এক নায়িকা – প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮

একটি কবিতার জন্য – সৈকত ভট্টাচার্য ১২৫

হরিমটর – অঙ্কু ১০৫

মায়াজাল - অমলেন্দু ঠাকুর ২২

মধুসূদনদাদা - জয়ন্ত দাস ৩০

কমিক্‌স

ব্যাটম্যান ২ – অনুবাদ ও বাংলা চিত্রণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য ১৪৮

শার্লক হোমস – অনুবাদঃ সন্তু বাগ ও অঙ্কিতা মাইতি ৩২

প্রবন্ধ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও কেশব কাশ্মীরি ভট্টজির
তথাকথিত তর্কযুদ্ধ - রামশঙ্কর ভট্টাচার্য ৪৬

নস্ট্রাডামুসের ভবিষ্যতবাণী - দীপক মন্ডল ৫১

বিতর্ক

লেখকদের একটা সময়ের পরে অবসর নেওয়া উচিত ৪

রান্নাবান্না

জিভে জল - স্বাগতা ঘোষ ৪২

কবিতা

জীবন তৃষ্ণা - সঞ্জীব মিত্র ৩৮

দুটি কবিতা - চন্দ্রনীভ সরকার ৩৯

দীপাবলী - নবীন দাস ৪১

প্রচ্ছদঃ অঙ্কিতা মাইতি

সম্পাদকমন্ডলীঃ সুদীপ দেব, সন্তু বাগ ও প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশকঃ www.bengalidownload.com

সম্পাদকীয়

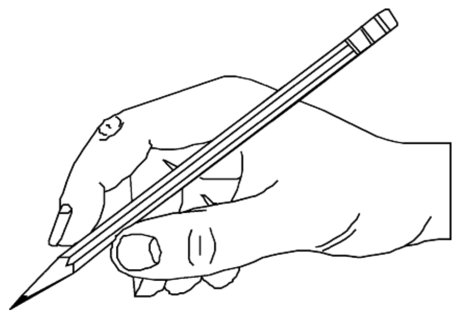

ইচ্ছে ছিল বহুমুখী একটি ষাণ্মাসিক পত্রিকা হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ পেতে আরেকটি শারদোৎসব এসে গেল। আগে মহালয়ার দিন একসঙ্গে সব শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ পেত। এখন তো রথের আগে থেকে নতুন পূজাবার্ষিকী পাওয়া যায়। বহুমুখীর যেহেতু বছরে একটাই সংখ্যা এবং ঘটনাচক্রে তার প্রকাশকাল বাঙালির শ্রেষ্ঠ সামাজিক ও সাহিত্য উৎসবের সময়, তাই দ্বিতীয় সংখ্যাটিও ঐতিহ্য মেনে মহালয়ার দিনই প্রকাশ করা হল। এক বছরে মানবশিশু হাঁটতে শেখে। ভবিষ্যতে বহুমুখী কতটা পথ অতিক্রম করতে পারবে তা সময়ই বলবে। আপাতত বেঙ্গলি ডাউনলোডের বন্ধুরা তাদের সুচিন্তিত মতামত জানিয়ে আমাদের পত্রিকাটিকে হাঁটতে সাহায্য করুন এই কামনাই করি।

বিতর্ক

বিষয়ঃ লেখকদের একটা সময়ের পরে অবসর নেওয়া উচিত

লেখকের অবসরের বয়স বলে কিছু হয় না। অনেক লেখক, যত বয়স হয়েছে তত বেশি পরিণত লেখা লিখেছেন। অভিজ্ঞতা তো বয়সের সাথেই বাড়ে। উদাহরণ, খুসবন্ত সিং যিনি নব্বইয়ের ঘরে ঢুকে গেছেন কিন্তু তাও কী চাহিদা! এছাড়া যাঁরা পেশাদার লেখক নন, তাঁরা অনেকেই লেখালিখির জগতে আসেন তাঁদের মূল পেশা থেকে অবসরের পর। স্বাভাবিকভাবেই ষাটের পর থেকে যাঁদের লেখা শুরু, তাঁরা তো আরও অনেক বছর লিখতে পারবেন। আমি বহু বিদেশি ব্লগের সদস্য, যেখানে অর্ধেক লেখকের বয়সই সত্তরের বেশি, অথচ লেখার কী ধার। আমার ব্যক্তিগত অভিমত, একটু বেশি বয়সে আত্মজীবনীমূলক লেখাগুলি বা একটু গবেষণামূলক লেখা খোলে বেশি। উদাহরণ, কুমারপ্রসাদ বাবু, রাধারমণ মিত্র প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথের কথা তোলা বাতুলতা মাত্র কারণ আশি বছর বয়সে মৃত্যুর এক-দুই দিন আগে অবধি লিখে গেছেন। হ্যাঁ, রচনাশৈলী নিশ্চয়ই পাল্টায়। সুনীল গাঙ্গুলির পালটেছে, বুদ্ধদেব গুহর পালটেছে, কিন্তু সেই পালটানোর ধরনটাই হয়ত বেশি পড়তে ভাল লাগে। নরসিংহ রাওয়ের আত্মজীবনী মনে পড়ে? ওই বৃদ্ধের হাত থেকে কী অনাবিল স্বীকারোক্তি বেরিয়েছিল।

-কৌশিক রায়

মানুষের জীবনে পাঁচটি অংশ থাকলেও সাহিত্যিকদের থাকে পাঁচটি বা তার চেয়েও বেশি, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, মধ্যবয়স, বার্ধক্য। সুতরাং জীবনের কোনও অংশ থেকে পাঠক বঞ্চিত হোক সেটা পাঠক সমাজ চায় না। জীবনের প্রতিটা স্তরে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়, লেখক যেভাবে তুলে ধরেন/ধরতে পারেন/ধরতে সক্ষম হন অন্যদের পক্ষে সেটা সম্ভব হয় না, তাই লেখকদের অবসর না নেয়ার পক্ষেই আমার মত, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস অবধি লিখে যাওয়া উচিত।

- আবু রাসেল

কোনও সৃষ্টিশীল মানুষ থেমে থাকতে পারেন না। কারণ থামা মানেই মৃত্যু। আমৃত্যু সৃষ্টি করার মতো আনন্দ আর কিছুতেই নেই। কিন্তু তার জন্য আপনাকে অফুরন্ত শক্তির অধিকারী হতে হবে – যেমন রবীন্দ্রনাথ, আশি বছর পর্যন্ত তিনি আমাদের যা দিয়ে গেছেন আমরা আজও তার আনেক কিছুই শেষ করে উঠতে পারিনি। তবে, কিছু লেখক-লেখিকা আছেন যাঁরা অবসর নিলে কোন ক্ষতিও নেই। অমিতাভ চৌধুরী একবার এক বিখ্যাত শিল্পী প্রসঙ্গে বলেছিলেন – “অনেক ছবিই এলেবেলে না থাকলে তাঁর নাম।” কিছু সংখ্যক লেখক-লেখিকার সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য এনাদের অনেকেরই বই ‘নাম’-এ কাটে।

- শঙ্খশুভ্র চট্টোপাধ্যায়

এটা নির্ভর করছে লেখক কী রকম লিখছেন। একই ধরনের লেখা বার বার পড়তে ইচ্ছে করে না। লেখা কারখানায় তৈরি হয় না, লেখককে নিজের থেকে লিখতে হয় – কল্পনা, বাস্তব সব কিছু মিশিয়ে। যখন দেখা যায় বেশ কয়েকটা লেখার পর লেখকের গল্প আকর্ষণ হারাচ্ছে, তখন অন্তত কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম নেওয়া উচিত। বিশ্রামে উদ্ভাবনী শক্তি ও কল্পনা শক্তি বেশ মজবুত হয়। এর পরেও যদি ভাল লেখা না পাওয়া যায়, তখন অবসর নেওয়া উচিত। অনেক লেখক কম লেখেন, কিন্তু ভাল লেখেন। তাঁদের অবসর নেবার প্রশ্ন আসে না। যতদিন ভাল লেখা যায় অবসরের কথা না ভেবে লিখে যাওয়াই উচিত।

- স্বাগতা ঘোষ

এখানে যেহেতু না বা হ্যাঁ উত্তর হতে হবে, তাই হ্যাঁ। ক্ষেত্রবিশেষে হ্যাঁ আর ক্ষেত্রবিশেষে না — এটা বোধহয়, সব দিক বাঁচিয়ে কমেন্ট হোল। আদপে ক্ষেত্রবিশেষে না বা ক্ষেত্রবিশেষে হ্যাঁ হওয়াই সঠিক। লেখক যদি ক্রমাগত একই গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েন, তাহলে থামাটাই যুক্তিসঙ্গত। কেউ কেউ আরও পরিপক্ক আরও পরিশীলিত লেখা শেষ বয়সে অবশ্যই লিখেছেন, কিন্তু সেগুলো দু-একটা ব্যতিক্রম।

আচ্ছা ধরুন না কেন — এখনকার যুগের গোটা দশেক লেখকের নাম নিন। আর তাদের কোন লেখাটি আপনার মনে অতীব দাগ কেটেছে দেখুন। অধিকাংশই দেখা যাবে সেগুলো খ্যাতির প্রথমের দিকে বা মধ্যাহ্নের লেখা। সায়াহ্নের লেখা বা সৃষ্টি অসামান্যই হয়েছে এমন ঘটনা কিন্তু খুব কম যে যার নিজেদের তালিকা করে মিলিয়ে নিলেই বোঝা যাবে। শেষ দিকের অধিকাংশ লেখাই লেখকদের সেই পুরোনো ঝলকের পান্ডুর প্রতিলিপি বলে মনে হবে। এটা সব ধরনের সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শিল্প, সাহিত্য, ছবি, গান, সুর ... সব।

আমার অন্তত এই অভিমত যে productivity-রও expiry date হয়। এবং তাকে স্বীকার করে নেওয়াটাই সম্মানের ও যুক্তিযুক্ত।

-বিভাস ভট্টাচার্য্য

প্রথমেই জানিয়ে রাখি আমার মনে হয় বয়সের সীমারেখা সরিয়ে কোনও লেখকের লিখে যাওয়া উচিত যতদিন পর্যন্ত তাঁর মস্তিস্ক সচল থাকে। একজন লেখকের লেখনীতে পরিস্ফুত হয় তাঁর জ্ঞান, পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা ও কল্পনা শক্তির মেলবন্ধন। মজার কথা হল এই তিনটিই বয়সের নিরিখে বেড়ে চলে সমানুপাতিক হারে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একজন লেখক তাঁর পূর্বেকার লেখাগুলির ভুলভ্রান্তিগুলি অনুধাবন করতে পারেন খুব সহজেই। জানার আগ্রহ এবং কল্পনা শক্তির বিকাশের ফলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লেখনীতে একজন অভিজ্ঞ পাঠক পরিণতির ছাপ লক্ষ করেন। বাংলা সাহিত্যে লেখকের কথা উঠলেই প্রথমেই আসে রবি ঠাকুরের কথা। মৃত্যুর সাত দিন আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিশীল ছিলেন। আধিকাংশ সফল লেখকই আমৃত্যু লিখে গেছেন এবং কিছু লেখা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। সত্যজিৎ রায় বেঁচে থাকলে আমরা আরও নতুন নতুন ফেলুদার অ্যাডভেঞ্চার অবশ্যই পেতাম।

-দীপক মণ্ডল

যে কোনও পেশার মতো, যদি কোনও লেখক আর অবদান করার মত অবস্থায় না থাকেন, তাহলে তাঁর অবসর গ্রহণ করাই উচিত। যখন লেখাটা মাত্র টাকা কামাবার একটা উপায় হয়ে দাঁড়ায় তখন চক্ষুলজ্জার খাতিরেই কলম থামানো উচিত। লেখকদের আমরা বুদ্ধিজীবী শ্রেণিতে ফেলি। তা, যখন তাঁদের লেখায় বুদ্ধির খোরাকই না পেলাম, তো তাঁদের অবসর নেওয়াই উচিত নয় কি? খুব কষ্ট হয়েছে শেষের দিকের কাকাবাবু, ফেলুদা এবং বর্তমানে শীর্ষেন্দুর গল্প পড়তে। মনে হয়েছে পুনরাবৃত্তিমূলক। গল্পের কোন বাঁধনই নেই, যেন লেখকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। ঘটনা, সত্যজিত বাবুর শেষের দিকের চলচ্চিত্র নিয়েও, একই মতামত পেশ করেছেন মৃণাল সেন এবং চিদানন্দ দাশগুপ্ত। তাই আমার মতে, যতদিন লেখক নিজের গুনমান বজায় রাখতে পারছেন ততদিন ঠিক আছে, তারপর অবসর নেওয়া উচিত।

- শুভাশীষ মিত্র

এটা তো একটা সৃষ্টিশীল কর্ম। আর কোনও সৃষ্টিশীলতাই কোনও ধরাবাঁধা নিয়মে চলে না। হতে পারে বর্তমানে অনেক প্রথিতযশা লেখক আমাদের যা উপহার দিচ্ছেন, তাতে মনে হতে পারে এঁরা নিঃশেষিত পানপাত্র। কিন্তু আমার মনে হয় ঘোষিত ভাবে "আমি অবসর গ্রহণ করলাম"- এর কোনও মানে নেই। কারণ কে বলতে পারে হঠাৎ কোন ঘটনা বা কোন দৃশ্যের অবতারনা লেখকের মস্তিষ্কে নতুন করে সৃষ্টিশীলতার ইন্ধন জোগাবে না?

- প্রলয় ব্যানার্জি

সাহিত্য বা অন্য যে কোনও সৃষ্টিশীল কাজ আর পাঁচটা ধরাবাঁধা কাজের সাথে তুলনীয় নয়. বয়েসের সাথে সাথে মানুষের বোধ ও চেতনার পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক. সেই পরিপ্রেক্ষিতে একজন লেখকেরও কালক্রমে বোধের পরিবর্তন হয়, তাই কোনও একটা বিষয়ে দশ বছর আগে তাঁর লেখা এবং দশ বছর পরে ওই একই বিষয়ে তাঁর নতুন লেখা আলাদা হতেও পারে। প্রসঙ্গতঃ জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে রাশিয়া ঘুরে এসে রবীন্দ্রনাথ তার 'রাশিয়ার চিঠি'তে সমাজতন্ত্রের বিষয়ে তাঁর উপলব্ধির কথা জানান। তাই একটা নির্দিষ্ট বয়সের পরে লেখকদের অবসর নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে হ্যাঁ, যে সব তথাকথিত লেখকরা নেহাত জীবিকা নির্বাহ করার জন্যে লেখেন বা প্রকাশকের তাগাদা মেটাতে পূজাবার্ষিকীর জন্যে যেমন তেমন করে লেখা দিয়ে দেন, তাঁরা অবসর নিলেই সাহিত্যের মঙ্গল।

- সৌরভ সেন

একদম অবসর নেওয়া উচিত যদি একটা সময়ের পরে বোঝা যায় তিনি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছেন। যদি না হয়ে থাকেন, তবে ঠিক আছে। সৃষ্টিশীল কাজের বয়স থাকে না ঠিকই, কিন্তু বিষয়ে লেখা আছে ‘একটা সময়ের পরে’, একটা বয়সের পরে কিন্তু লেখা নেই। একজন লেখক যদি ১১১ বছর পর্যন্ত তাঁর লেখা চালিয়ে যেতে পারেন পুরোদমে, সেটার কথা বলা হচ্ছে না, কিন্তু একটা ‘সময়ের’ পরে তাঁর streak বন্ধ হয়ে গেলে ?

- কাঞ্চন মল্লিক

আমরা সবাই সুনীলবাবুর ঘটনা দেখেছি। ওঁর শেষ দিকের লেখা আর পড়াই যাচ্ছিল না। ব্যতিক্রম থাকলেও বয়সের সঙ্গে সৃজন ক্ষমতা কমে যায়, সৃষ্টিশীল চেতনা ভোঁতা হয়ে যায়। এটাই মানব ধর্ম। কবে ঘি খেয়েছিলাম তার গন্ধ কি আর এখন শোঁকা যায় !

- রামশঙ্কর ভট্টাচার্য

আমার মনে হয় লেখার যেমন কোনও বয়স হয় না, তেমনি লেখকেরও না। বরং যত দিন যায় আরও পরিণত ও ক্ষুরধার হতে থাকে তাঁর লেখনী। সাহিত্যের ইতিহাসে এর ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে। তাই জীবনের অন্তিম লগ্ন অবধি নতুন নতুন সৃষ্টির আশায় ও আনন্দে মেতে থাকুন তিনি, এটুকুই আন্তরিক কামনা।

- রাজু দত্ত

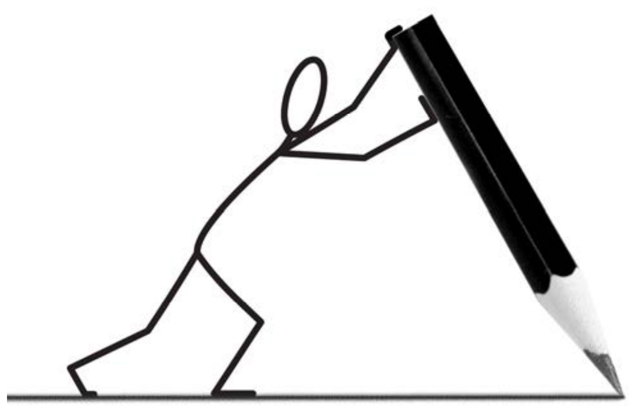

রহস্য গল্প

আলিপুর

পার্ক রোডে গাড়িটা পার্ক করিয়ে রোনাল্ড শে রোডে ঢুকতেই গায়ে বৃষ্টির কয়েকফোঁটা লাগল। দেবময় আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন আবছা তারাগুলো আর চোখে পড়ছে না। তার মানে ঈশ্বর তাঁর সহায়! প্ল্যানমাফিক সব কাজই হবে ভেবে তাঁর কনফিডেন্স লাফিয়ে চাঁদ ছুঁয়ে ফেলল।

গাড়ির চাবিটা ক্যামেরার ব্যাগে লুকিয়ে হাঁটার গতি অনেক কমিয়ে দিলেন দেবময়। তাতেও হালকা সবুজ রঙের বাংলো বাড়িটা তাড়াতাড়িই চলে এল প্রায়। এদিক ওদিক চেয়ে বাড়ি খুঁজে বের করার ভান করলেন তিনি। এতে বৃষ্টিটা জোরে নামার সময় পাবে।

এই রাস্তাটা চিরকালই বেশ ফাঁকা। বড়লোকদের এলাকা বলেই হয়তো। আশেপাশে কোনও দোকানপাট কিচ্ছু নেই যে বৃষ্টি এলে মাথা গোঁজা যাবে।

বাংলোটার সামনে গাঢ় সবুজ রঙের বিশাল লোহার গেট বন্ধ রয়েছে। পাশে পাথরের ফলকে বড় করে লেখা 'যুথিকা ভিলা'। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁধভাঙা খুশিতে মনটা ভরে গেল দেময়ের। যতবারই এবাড়ির পাশ দিয়ে গিয়েছেন মনে এভাবেই খুশির দোলা লেগেছে।

উচ্ছ্বাস চেপে মনটাকে সংযত করে দরজার পাশের কলিং বেলটা টেপার সঙ্গে সঙ্গেই দমকা হাওয়া দিয়ে ঝড় উঠল। দরজার একদিকে একটা ঢাকনা দেওয়া চৌকো ফোকর। সেই ঢাকনা খুলে মুখ বাড়াল টুপি পরা এক সিকিউরিটি গার্ড। যদিও দেবময় এদের এখনও দারোয়ান বলতেই পছন্দ করেন।

"কাকে চাই?"

"যুথিকাদেবীর সঙ্গে দেখা করব।"

"অ্যাপয়েনমেন তো নেই?"

"না। উনি তো কাউকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন না বলেই জানি।"

"তাহলে থানা থেকে পারমিট এনেছেন?"

"না, মানে —"

"কাঁধে ওটা ক্যামেরা তো। রিপোর্টার? আমনারা তো সব নিয়ম জানেন। ম্যাডাম কারও সঙ্গে দেখা করেন না অনেক বছর হল। কাউকে তাঁর দরকার পড়ে না। কোনও এমার্জেন্সি কেসে নিজে ডেকে নেন। তাতেও থানার পারমিট নিয়ে আসতে হয়। আরে, ভিআইপিদের সাথেই ম্যাডাম দেখা করেন না তো রিপোর্টার! যান যান বিস্টি আসচে।"

"না, আমি ঠিক রিপোর্টার নই।"

"আমনি ঠিক যা-ই হোন, দেখা হবে না যান।"

এবার হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়ল বৃষ্টি। বড় বড় ফোঁটা রাস্তার ধুলো ভিজিয়ে কাদা বানাল মুহূর্তে। এলাকা কাঁপিয়ে একটা ভয়ঙ্কর বাজ ফেলে সে-বৃষ্টির রাগ আরও বেড়ে গেল।

দারোয়ান ঢাকনা বন্ধ করে চলে গিয়েছে। ভিজছেন দেবময়বাবু। ছাতা আনেননি ইচ্ছে করেই। ঝাড়া তিন মিনিট ভেজার পরে কলিং বেল টিপলেন আবার।

"কী ব্যাপার, আমনি এখনও জাননি?"

"হ্যাঁচ্চো! বলছিলাম, একটু যদি তোমার ঘরটায় — মানে বৃষ্টিটা তো খুব —"

"দেখুন কারও ঢোকার কিন্তু নিয়ম নেইকো। ম্যাডাম জানতে পারলে কিন্তু —"

"আর তো কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই ভাই। হ্যাঁচ্চো!"

দরজা খুলে দিল দারোয়ান। বিশাল বাগান চিরে পাথর ছড়ানো পথ সোজা চলে গিয়েছে পঞ্চাশ মিটার দূরের প্রাসাদোপম বাংলোয়। তার পোর্টিকোয় পুরোনো মডেলের কিন্তু খুব দামী একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাস্তার দুধারে পুরোনো ধাঁচের বেঁটে দুটো ল্যাম্পপোস্টের একটায় আলো জ্বলছে। দেবময়বাবু তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে চললেন।

"ওদিকে কোথায় যাচ্চেন!"

মাথায় বড়ো একটা ছাতা ধরে রাস্তা আটকে দিল দারোয়ান। ডানদিকে মেন গেটের গোড়ায় একটা ছোট ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ওই যে আমার ঘর। ওখানে চলুন।"

ঘরে একটা চৌকি পাতা রয়েছে। আর দরজার পাশে টেবল-চেয়ার। টেবলে একটা ফোনও আছে। ঘরের অন্য পাশ দিয়েও আর একটা দরজা আর তার পরে একফালি বারান্দা। দরজা দিয়ে একটা আমগাছ দেখা যাচ্ছে।

নিজের অবস্থা ভেবে মনে মনে হাসলেন দেবময়। শেষকালে কিনা তাঁকে একটা দারোয়ানের ঘরে বসতে হবে! মানুষ প্রয়োজনে কী না করে!

জামাটা বেশ ভিজে গিয়েছে। কয়েকটা বোতাম খুলে ফেললেন। মাথা গড়িয়ে জল পড়ছে। দড়িতে ঝোলানো একটা তোয়ালে দেখিয়ে দারোয়ান বলল "মাথাটা মুচে নিন। টেবেল ফ্যানটা চালিয়ে দিচ্চি। খাতায় নাম-ঠিকানা এন্টির করে বসুন। টাইমটা ঠিক লিকবেন। নটা বাজতে পাঁচ এখন।"

তোয়ালেটা দিয়ে ঘষে ঘষে মাথাটা মোছবার সময় সিকিউরি-গার্ডটাকে ভাল করে লক্ষ করলেন দেবময়বাবু। বয়েস পঞ্চাশের কাছে। বেশ শক্তপোক্ত চেহারা। গায়ের রং চামড়ার ব্যাগের মতো কালো। ছ'ফুটের বেশিই লম্বা। একটা মোটা গোঁফ আছে আর গাল সুন্দর করে কামানো। তার থমথমে মুখটা দেখে গুণ্ডা ভেবে ভয় হয়। টুপিটা খুলে টেবলে রাখাতে তার কালো চুলের মাঝের গোল টাকটা প্রকট হল। সে টেবলের বড় খাতাটা খুলে কোথায় লিখতে হবে দেখিয়ে দিল।

টেবলে ক্যামেরার ব্যাগটা রেখে খাতায় নাম-ঠিকানা, সবই ঠিক লিখলেন দেবময়। শুধু এখানে আসার উদ্দেশ্যটা লিখলেন 'একান্ত গোপনীয়'।

আবার খুব জোরে একটা বাজ পড়ল। বৃষ্টি এখন ঝাপসা করে দিয়েছে যুথিকাদেবীর বাংলোটাকে। আলিপুরে এরকম একটা পেল্লায় বাংলো রয়েছে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বাড়িটার কোণের ঘরটা ছাড়া আর কোথাও আলোও জ্বলছে না। কোনওরকম জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ শোনা যাচ্ছে না। অথবা বৃষ্টির আওয়াজ সব শব্দকে ঢেকে দিয়েছে। দারোয়ানের ঘরে হলুদ দেওয়ালের ওপরে বসে টিউবলাইটটা একভাবে চেয়ে আছে দেবময়ের দিকে। আর, টিউবের নীচে চেয়ে আছেন আর-একজন। একটা মাঝারি ফোটোফ্রেমের মধ্যে বসে এক অপরূপা সুন্দরী। সাদাকালো ছবিতে তাঁর রূপ ঠিকরে পড়ছে। ইনিই যুথিকাদেবী। মিসেস যুথিকা সাক্সেনা।

বাংলা ছায়াছবির জগতে যুথিকাদেবী এক চিরস্মরণীয় নাম। বাংলা ছবির গোড়া থেকে এই নাম লেগে রয়েছে। রীতিমতো ঈর্ষা করার মতো তাঁর রেকর্ড। ভাবলে অবাক হতে হয় যে আড়াইশোটিরও বেশি ছবিতে কাজ করেছেন যার মধ্যে দুশো দশটাতেই নায়িকার ভূমিকায়। আরও অবাক করার ব্যাপার হল প্রথম নির্বাক বাংলা চলচ্চিত্র 'বিল্বমঙ্গলে'

তিনি অভিনয় করেছিলেন ১৯১৯ সালে। শুধু তা-ই নয়, ১৯৩১ সালে প্রথম সবাক বাংলা ছবি 'দেনা পাওনা' মুক্তি পেয়েছিল, তাতেও ছিলেন তিনি। প্রথম ছবিতে অভিনয় করার এই ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের রঙিন বাংলা ছবিতেও স্বমহিমায় ছিলেন যুথিকাদেবী। তবে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য তাঁর বয়স। একশো সতেরো! ১৮৯৭ সালে জন্মেছেন এবং তিনটে শতাব্দীতেই পদচারণা করেছেন। ভাবা যায়!

এটা যে কীভাবে সম্ভব সেটাই জানার বড্ড ইচ্ছে দেবময়ের। আর জানতে ইচ্ছে হয় বাংলার সেই ডাকসাইটে সুন্দরী নায়িকা এখন দেখতে কেমন হয়েছেন। চলতে-ফিরতে পারেন?

ছবিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে দেবময় বলে উঠলেন, "বাঃ! এটা তো একানব্বই বছর আগের তোলা ছবি। অ্যানটিক পিস। এর প্রিন্ট খুব বেশি বেরোয়নি। তোমার ঘরে ওঁর এখনকার কোনও ছবি আছে?"

শুনে দারোয়ান হাসল। বলল, "আমনারা তো জানেন যে ম্যাডাম অনেক বছর ধরেই ছবি তোলান না। আর, ছবি তো ছবি, আমার পঁচিশ বছর হয়ে গেল ম্যাডামের বাড়ি কাজ করচি, তাঁকে সামনা সামনি আমি নিজেই কি দেকিচি নাকি তেমন! বড়জোর পেচন থেকে দেকিচি। হাতে গুনে বলে দিতে পারি কবার ম্যাডামের মুখ দেকিচি। তাও, গত দশবছরে তো একবারও না। যা কথা সবই জুঁই ম্যাডামের সাথে হয়। ওনার সেক্কেরটারি, জানেন তো? তা জুঁই ম্যাডামেরও তো বয়েস কম হল না। সত্তর তো হবেই।"

"তোমার নামটা?"

দারোয়ান তার নাম বলল শ্যামাপদ পাইন। দেবময় বললেন, "বুঝলে শ্যামাপদ, যুথিকাদেবী আমার কাছে এক বিরাট মানুষ। তাঁর ভক্ত আমি ছোটবেলা থেকেই। আসলে আমাদের বাড়িতে যুথিকাদেবীর নামের খুব চর্চা ছিল। তার কারণ আমার মাকেই দেখতে ছিল যুথিকাদেবীর মতো। তার উপরে চলন সাজপোশাক কথাবার্তা মা অনেকটাই যুথিকাদেবীর মতো রপ্ত করেছিলেন। বিয়ের আগে অবধি নাটক থিয়েটার একটু-আধটু করতেন মা। একবার তো আমার যখন পাঁচ বছর বয়স তখন কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল যুথিকাদেবীর জীবন নিয়ে সিনেমা হবে তাই নতুন আর্টিস্ট চাই। এখনও আমার মনে আছে বুঝলে, আমাকে নিয়েই অডিশন দিতে ছুটেছিলেন মা। বাবার আপত্তি ছিল না। যে-পাঁচজনকে বাছা হয়েছিল ফাইনাল অডিশনের জন্য তাদের মধ্যে মায়ের নামও ছিল। একমাস পরে ডেট দেওয়া হয়েছিল ফাইনাল অডিশনের। কিন্তু তারপরেই ছবির প্রোডিউসারদের মধ্যে অংশীদারি নিয়ে কীসব ঝামেলা বেধে গিয়ে ছবিটা আর হলই না। এটা নিয়ে আপশোশ কম ছিল না মায়ের। তারপর তো মা মারাই গেলেন।"

সারা জীবন যুথিকাদেবীকে নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন দেবময়। যুথিকাদেবীর যত ছবি, যত ইন্টারভিউ, যত সমালোচনা, যত তথ্য — সব নিয়ে নিজের বাড়িতেই একটা মিনি লাইব্রেরি করেছেন। যুথিকাদেবীর জীবন ও কাজ নিয়ে দুটো বই লিখে ফেলেছেন। নিজের বয়স পঞ্চান্ন পেরোল, সংসারে স্ত্রী, ছেলে, বৌমা রয়েছে, এক বছরের নাতনিও আছে অথচ এখনও প্রতিদিন রাতে শোবার আগে ১৯২৮ সালে তোলা যুথিকা দেবীর একটা ছবি না দেখে ঘুমোতে যেতে পারেন না তিনি।

বৃষ্টিটা তেড়েফুঁড়ে নেমেছে আজ। শ্যামাপদর সঙ্গে গল্পগুজবটাও ভালই জমেছে। নিজের পরিচয় দিয়ে এর মধ্যে ভাল সমীহ আদায় করে নিয়েছেন দেবময়। তিনি যে কলকাতার জনপ্রিয় ফিলমি পত্রিকার সম্পাদক সেটা জানার পর শ্যামাপদ একটু সমঝে কথা বলছে দেবময়ের সঙ্গে।

ঠিক ন'টা পঁয়ত্রিশে শ্যামাপদর টেবলের ফোনটা বেজে উঠল। ফোনটা যে ওই অন্ধকার বাংলোর ভিতর থেকে এসেছে সেটা শ্যামাপদর কথা বলার ভঙ্গিতেই স্পষ্ট। ফোন রেখে সে বলল, "আমনি বসুন আমি একটু ওপর থেকে আসচি। জুঁই ম্যাডাম ডাকচেন।" এই বলে সে রেজিস্ট্রি খাতাটা নিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ফিরে এল পনেরো মিনিট পরে। এসে খাতা রেখেই সে কাঁচুমাচু মুখে হাত জোড় করে দাঁড়াল। দেবময় অবাক হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। শ্যামাপদ বলল, "আমাকে মাফ করে দিন স্যার। আমনাকে এখানে বসানো ঠিক হয়নিকো। কী করব বলুন, আমি তো জানতাম না। ম্যাডাম রাগারাগি করচেন। বলচেন আমনাকে নীচের বসার ঘরটা খুলে দেওয়া উচিত ছিল।"

"না না সে ঠিক আছে।" দেবময় চেয়ারে বসে গা এলিয়ে দিলেন। জমিদার বংশের রক্তকণিকাগুলো তাঁর শিরা-উপশিরায় আবার জানান দিচ্ছে।

এইসময় আবারও ফোন এল। শ্যামাপদ ফোনটা তুলে "হ্যাঁ ম্যাডাম দিচ্চি" বলে রিসিভারটা দেবময়ের দিকে বাড়িয়ে বলল, "জুঁই ম্যাডাম আমনার সঙ্গে কথা বলবেন। আমনি এইখানে দাঁড়িয়ে ওই ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে কথা বলুন।"

এতক্ষণে খেয়াল করলেন দেবময়। টেবলের সামনে স্ট্যান্ডে লাগানো একটা ক্যামেরাও রয়েছে। তাতে একটা ছোট নীল আলো জ্বলছে। রিসিভার কানে দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে দেবময় "হ্যালো" বললেন।

"আয়্যাম সো সরি দেবময়বাবু। এ বাড়িতে এখন কোনও অতিথি আসেন না। কিন্তু যদি কেউ এসে পড়েন তাহলে তাঁকে নীচের ড্রয়িং রুমে বসতে দেওয়া হয়। আপনি অনাহুত বলেই হয়ত শ্যামাপদ ভুলটা করে ফেলেছে।"

"নট আ প্রবলেম ম্যাডাম। আমার কোনও অসুবিধে হয়নি। আসলে একটা ইন্টারভিউ—"

"কিন্তু যুথিকাদেবী যে কাউকে ইন্টারভিউ দেন না, ছবিও তুলতে দেন না সেটা তো নিশ্চয়ই আপনার জানার কথা।"

"হ্যাঁ, জানি বলেই তো আমি কোনও জার্নালিস্ট টিম না পাঠিয়ে নিজেই এসেছি। তাছাড়া, ফিলম পত্রিকার সম্পাদক ছাড়াও আমার আর একটা পরিচয় আছে।"

"সেটা কী? আর আপনি এখানে আসার উদ্দেশ্য লিখেছেন কনফিডেনশিয়াল। সেটাই বা কী?"

"কনফিডেনশিয়াল যখন, তখন সেটা যুথিকা ম্যাডাম ছাড়া আর কাউকে বলতে পারব না।"

"যুথিকাদেবীকে যা বলবেন, তার সবই আপনি আমাকে বলতে পারেন। উনি আপনার কথা শুনছেন আর আপনাকে দেখতেও পাচ্ছেন।"

"আর আপনাদের সিকিওরিটি গার্ড শ্যামাপদ? সেও কি শুনতে পারে?"

"শ্যামাপদকে বলে দেওয়া আছে। ও এই মুহূর্তে ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছে। আপনি বলুন মিঃ ঘোষাল।"

পিছন ফিরে দেবময় দেখলেন সত্যিই শ্যামাপদ ঘরে নেই। তারপর ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললেন, "যুথিকা দেবীর রক্ত খানিকটা আমার শরীরেও বইছে।"

ওপাশ থেকে কোনও সাড়া এল না। প্রায় এক মিনিট চুপ থাকার পরে জুঁইয়ের কণ্ঠ ভেসে এল, "তা, এতদিন পরে কী মনে করে? কী মতলব?"

"না না ম্যাডাম, আমি সম্পত্তির ভাগ চাইতে আসিনি। শুধু ওঁকে সামনে থেকে একটু দেখব। আর যেটা এতদিনে কেউ করতে পারেনি — কয়েকটা ছবি, একটা ছোট ইন্টারভিউ — এই উনি কীভাবে আছেন, ওঁর লাইফস্টা—"

"ফোনটা শ্যামপদকে দিন।"

দেবময় রিসিভারটা টেবলে রেখে বাইরে গিয়ে শ্যামাপদকে ডেকে দিলেন।

ভীষণ জোরে একটা বাজ পড়ল ঠিকই কিন্তু বাজের শব্দ কোনওদিনই দেবময়কে কাঁপায়নি। আজ তাঁর বুকটা কাঁপছে অন্য কারণে। তির ছুড়ে দিয়েছেন তিনি। সেটা ঠিক জায়গায় গিয়ে লেগেছে কিনা বুঝতে পারছেন না। এবার হয় তিনি ইন, না হয় আউট।"

"আসুন আমার সঙ্গে।" ফোন রেখে শ্যামাপদ ডাকল।

তার মানে তিনি আউট নন, ইন! ওষুধে কাজ দিয়েছে। ব্যাপারটা দেবময়ের কাছে কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগছে। হাতে চিমটি কেটে ব্যথাটা অনুভব করে তিনি ক্যামেরার ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিলেন।

"না না ওটা এখানেই রাখুন। আর আমনার সঙ্গে মোবাইল, মানিব্যাগ যা কিছু আছে সব এই টেবিলে রেখে দিন। ওসব নিয়ে ওপরে যাওয়া যাবে না।"

কিঞ্চিৎ হতাশ হয়ে দেবময় সব রাখলেন টেবলে। তারপরে শ্যামাপদ তাঁর সারা গায়ে হাত দিয়ে সার্চ করে নিশ্চিত হয়ে একটা ছাতা ধরিয়ে এগিয়ে গেল বাংলোর দিকে। দেবময় তাকে অনুসরণ করলেন।

পোর্টিকোর মধ্যে দিয়ে গিয়ে বাংলোর দরজাটা ঠেলে খুলল শ্যামাপদ। হাতের সামনের একটা সুইচ টিপতেই ভিতরের ঘন অন্ধকার একছুটে আনাচে কানাচে ঢুকে গেল। একটা ডিম লাইট জ্বালানো হয়েছে। এতে অন্ধকার পুরো কাটে না। কার্পেট বিছোনো ড্রইংরুমের বাঁদিক দিয়ে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। আলো-অন্ধকার জড়াজড়ি করে সেই সিঁড়িকে এক ভৌতিক রূপ দিয়েছে। রাত্রিবেলায় এত কম আলো জ্বালানো রয়েছে কেন সেটা দেবময়বাবুর মাথায় ঢুকল না। হয়ত অপ্রয়োজনীয় আলো জ্বালানো নিষেধ এ বাড়িতে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে দালান। সেখানেও আলো জ্বলছে না। শুধু দালানের শেষের একটা ঘর থেকে অনেক আলো ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাইরে। বড় বড় পাথরের মূর্তি, ফুলদানি, অয়েল পেন্টিং আর পশুদের খুলি লাগানো দালান পেরিয়ে সেই ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল শ্যামাপদ। সে নিজে ঘরে ঢুকল না। ইশারায় দেবময়কে ঢুকতে বলে বেরিয়ে চলে গেল।

বাইরে জুতো ছেড়ে মোজা পরে ঢুকলেন দেবময়। ঘরটা বেশ বড়ো। দুনিয়ার যত পুরোনো জিনিস সবই যেন এ ঘরে এসে জড়ো হয়েছে। পেন্টিং, ফুলদানি এ-ঘরেও বিস্তর রয়েছে। রয়েছে ফ্রেমে আঁটা নানা ধরনের পোশাক। বিখ্যাত কিছু ছবিতে সেগুলো কস্টিউম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। কয়েকটা তো দেবময় চিনতেই পারলেন। ঘরে পাতা সোফাগুলোও পঞ্চাশ বছর আগেকার মডেলের। ঘরের ভিতরটা যথেষ্ট ঠাণ্ডা, কিন্তু এসিটা কোথায় আছে দেখতে পেলেন না দেবময়। বরং মাথার উপরে দেখলেন একটা টানা পাখা। ঘরের একপাশে একটা তানপুরা, সেতার, তবলা ইত্যাদি রাখা। দেওয়ালে-দেওয়ালে যুথিকাদেবীর কম বয়সের অনেক ছবি রয়েছে। আর রয়েছে প্রচুর বই। যে সোফাটায় দেবময় বসলেন তার সামনে কিছুটা দূরের দেওয়ালে একটা পেন্ডুলাম-দেওয়া বড়ো ঘড়ি। সেই দেওয়ালে ঠেকানো একটা খুব বড়ো টেবল। আর টেবলের সামনে গদি আঁটা বেশ উঁচু পিঠওয়ালা একটা চেয়ার।

বাইরের বৃষ্টির আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দই নেই। পেণ্ডুলাম ঘড়িতে রাত দশটা বাজতে চলল। ভূতে দেবময়ের বিশ্বাস মোটেই না থাকলেও আজ যদি তিনি যুথিকাদেবীকে দেখতে পান তাহলে সেটা ভূত দেখার চেয়ে কিছু কম আশ্চর্যের হবে না। একশো সতেরো বছর বয়সি একজন মানুষকে জীবন্ত চাক্ষুষ করা আর তাঁর সাথে কথা বলা কজন মানুষের ভাগ্যে জোটে! তার উপরে তিনি যদি দেশ কাঁপানো অভিনেত্রী হন! বাংলা ছবির সেরা জুটি বলতেই তো লোকে বংশীকুমার-যুথিকার নাম জানে। কী সব হিট ছবি করেছিলেন দুজনে মিলে। এখন এই ঘরে বসে সেইসব ছবির দৃশ্যগুলো ভেসে আসছে দেবময়ের চোখে আর গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। এইরকম বর্ণময় একজন অভিনেত্রীর ঘরে তিনি বসে আছেন! আচ্ছা, তিনি বেঁচে তো আছেন, কথা বলতে পারেন তো? চলতে-ফিরতে পারেন? নাকি মৃতদেহের মতো নির্জীব হয়েই শুয়ে আছেন এই বাংলোর কোথাও? কে বলতে পারে, হয়তো এই বাড়ির কর্ত্রী আসলে সেই জুঁই নামের মহিলা।

"এত রাতে এলে!"

কথাটা ভেসে এল সামনে থেকে। উঁচু পিঠওয়ালা চেয়ারটায় যে কেউ বসেছিল সেটা খেয়ালই করতে পারেননি দেবময়। যিনি বসেছিলেন খুব সম্ভবত তিনি টেবলে মাথা রেখেছিলেন। এবার সেই চেয়ারটা ঘুরে গেল। সাদা চাদর গায়ে দিয়ে এক বৃদ্ধা দেবময়ের দিকে ফিরলেন। তাঁর খোলা চুলের পুরোটাই সাদা। গায়ের চামড়াও হলদেটে সাদা। কিন্তু চোখ ঘোলাটে হয়ে যায়নি। চশমাও নেই। মুখের মধ্যে দাঁতও রয়েছে মনে হল। তবে বাঁ কানে কিছু একটা গোঁজা আছে যেন। তার মানে কানে কম শোনেন।

ইনি যুথিকাদেবী! ইনি! বয়স তো দেখে মনে হচ্ছে সত্তর পঁচাত্তরের বেশি নয়। তাহলে কি ইনি যুথিকাদেবীর সেক্রেটারি জুঁই? কিন্তু তা-ই বা হবে কী করে? নাকের আদলটা যে যুথিকাদেবীর মতোই সেটা, একটু দূর থেকে হলেও, ভালই বোঝা যাচ্ছে। আর চোখ দুটো, হ্যাঁ তা-ও যুথিকাদেবীর চোখ। মুখশ্রী অনেক পাল্টে গিয়েছে, কিন্তু কেউ যদি বলে দেয় তাহলে এঁকে যুথিকাদেবী বলে চিনে না নেওয়ার কোনও কারণ নেই। কাছ থেকে দেখার যদি সুযোগ হয় তাহলে নিশ্চয়ই ঠোঁটের ডানপাশে যুথিকাদেবীর চিরপরিচিত তিলটাও দেখা যাবে। কিন্তু একশো সতেরো বছর বয়সের একজন বৃদ্ধা নিজের বয়স এতটা কমিয়ে ফেলতে পারেন কী করে! প্রায় তিরিশ বছর আগে শোনা গিয়েছিল যুথিকাদেবী যোগসাধনা করছেন। এটা কি তারই ফলশ্রুতি?

"কী ব্যাপার, চুপ করে আছ কেন? আমিই যুথিকা। এখন বলো।"

যুথিকাদেবীর কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ মৃদু আর তাতে বয়সজনিত সামান্য কাঁপন ধরেছে। দেবময় উঠে গিয়ে যুথিকাদেবীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। তাঁর বাঁপায়ের কড়ে আঙুলের পাশটা একটু ফোলা। তারপর ওঠার সময়ে লক্ষ করলেন তাঁর ঠোঁটের ডানপাশের তিলটা। আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন দেবময়। বললেন, "আপনি তো সারারাত জাগেন, পড়াশুনো করেন, উপাসনা করেন। আর সকাল বেলায় ঘুমিয়ে পড়েন। এরকমই শুনেছি। তাই ভাবলাম রাত করেই—"

"তা, এই রাতের বেলায় কী খাবে, সরবত?"

"হ্যাঁ, তা খেতে পারি। কিন্তু আপনি আবার ব্যস্ত —"

"রক্তের সম্পর্কটা এতদিন বাদে মনে পড়ল যে?"

আচমকা মোক্ষম প্রশ্নে সামান্য চমকে গেল দেবময়। কিন্তু সে তৈরিই ছিল। বলল, “আজ্ঞে! হ্যাঁ, জানলামই তো মাত্র কয়েক মাস হল।”

“মাত্র কয়েক মাস আগে জানলে! আচ্ছা! কী রকম?”

“আপনার এক দাদা ছিলেন মনে পড়ে? সুধীর ভাদুড়ি? নাইনটিন থার্টিথ্রিতে আপনি প্রথম সেই দাদার ব্যাপারে একটা সংবর্ধনা সভায় জানান। বলেছিলেন যে তাঁর কথা আপনার খুব মনে পড়ে।”

“মনে আছে।” কিন্তু তুমি কী জানো সেটা বলো।

“সেইসময় আপনি আপনার দাদার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছিলেন। ভাইবোন বলতে আপনার ওই একমাত্র দাদা। আপনার চেয়ে বারো বছরের বড়ো। তিনি জন্মেছিলেন আঠেরোশো পঁচাশিতে আর আপনি সাতাব্বই। আপনার জন্মের পরেই মা মারা গিয়েছিলেন বলে দাদার আপনার উপরে খুব মায়া ছিল। থিয়েটার নাটক করতে খুব ভালবাসতেন সুধীরবাবু। কিন্তু আপনার বাবার একদম পছন্দ ছিল না। বাবার সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলেই দাদা ঘর ছাড়লেন। আপনার বয়স তখন মাত্র পাঁচ। বলেছিলেন দাদার মুখটা খুব আবছা মনে পড়ে আপনার। আপনার বাবা নাকি পুলিশে খবর দিয়ে দাদাকে অনেক খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কোনও ফল হয়নি।”

দেবময় বলেই চলেন, “এর সাত বছর পরে, আপনার বয়স যখন বারো, একটি লোক আপনার হাতে একটা চিঠি ধরিয়ে চলে যায়। খুলে দেখেন আপনার দাদা সুধীর ভাদুড়ির চিঠি। পড়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। চিঠিটা সুধীরবাবু আর কাউকে দেখাতে বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন ঠিকানাটা মুখস্থ করে আপনি যেন কাগজটা পুড়িয়ে দেন। তা-ই দিয়েছিলেন আপনি। কিন্তু ঠিকানাটা আপনার দাদারও নয়। আপনাকে যে লোকটি চিঠিটা দিয়ে গিয়েছিল, তার। ওই ঠিকানাতেই আপনি দাদাকে চিঠি লিখতেন। দাদাও লিখতেন, আর লোকটি আপনাকে দিয়ে যেত। সুধীরবাবুর কথামতো ওঁর প্রত্যেকটা চিঠি পড়ে পুড়িয়ে ফেলতেন। কিন্তু এক বছর পরেই আপনি বাবার কাছে ধরা পড়ে গেলেন। ছেলের হাতেরলেখা দেখে বাবা চিনতে পারলেন।

“ঠিকানা আপনি আপনার বাবাকে কিছুতেই বলেননি। সুধীরবাবু বলেছিলেন ঠিকানা কাউকে বললেই নাকি তিনি মরে যাবেন। বাবাকে সেই কথা বলায় বাবা আর জিজ্ঞাসা করেননি। কিন্তু চিঠি লেখাও আর হয়নি।

“আরও বড়ো যখন হলেন, দাদার মতো আপনিও থিয়েটারে জয়েন করলেন। কিন্তু এবারে আপনাকে আপনার বাবা বাধা দেননি। তারপরেই তো আপনার যখন বাইশ বছর বয়স তখন বাংলা ছবিতে চান্স পেয়ে গেলেন।

“প্রথম ছবিতে অভিনয় করার পরে আপনি সেই ঠিকানায় চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু কোনও সাড়া পাননি। তারপর একদিন চলেই গেলেন ঠিকানাটা ধরে। দেখলেন সেটা একটা দু-কামরার একতলা ঘর। সেখানে অন্য ভাড়াটে এসেছে। আগের লোকের খোঁজ কেউ দিতে পারেনি।”

এই অবধি বলে দেবময় থামলেন। সরবত চলে এসেছে। দিয়ে গিয়েছে বছর ষাটের এক বৃদ্ধ চাকর। সরবতে চুমুক দিয়ে দেবময় বললেন, “জানেন ম্যাডাম, আমার মা জন্মেছিলেন কেরালায়।”

“জেনে আমি কী করব?” ঝাঁঝিয়ে উঠলেন যুথিকা দেবী।

“না, মানে সেই সূত্রেই একটা কথা আপনাকে জানানোর আছে।”

“তাহলে সেটাই জানাও।”

“আপনি মালয়ালম সিনেমার ভেঙ্কটরাঘবনকে চেনেন?”

"গত তিরিশ বছর ধরে বাংলা ছবির জগতের কোনও খবর আমি রাখি না। অন্য কোনও রাজ্যের ছবির খবর রাখা তো তার আগেই বন্ধ করেছি। আর, আমাকে প্রশ্ন করার জন্য কাউকে আমার বাড়িতে ঢোকানোও বন্ধ হয়েছে অনেকদিন।" ধীর কিন্তু অতি কঠিন গলায় বললেন যুথিকাদেবী, "তোমার যা বলার বলে যাও। আমাকে প্রশ্ন কোরো না।"

"আয়াম সরি" বলে নিজেকে গুছিয়ে নিলেন দেবময়। তারপর বললেন, "ওয়েল, ভেঙ্কটরাঘবন মালয়ালম সুপারস্টার। বয়স তিনি সত্তর পেরিয়েছেন কিন্তু এখনও দশ কোটির কমে ছবি সাইন করেন না। ইনি সম্প্রতি একটা খুব বড়ো বাজেটের দক্ষিণী ছবিতে কাজ করছেন। এই ফেব্রুয়ারিতে কেরালার কোট্টায়ামে পাঁচ দিনের শুটিং ছিল। উনি প্রেসকে খুব একটা পাত্তা দেন না, কিন্তু আমার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক আছে। তাই ঠিক করেছিলাম আমি নিজে গিয়ে পাঁচদিন ওঁর সঙ্গে থেকে একটা বড় স্টোরি করব। দেখলাম আমাকে উনি না করলেন না। কিন্তু ওখানে গিয়ে শুনলাম তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গলায় হঠাৎই ক্যান্সার ধরা পড়েছে আর তাই চিকিৎসার জন্য উনি ইংল্যান্ড উড়ে গেছেন।

"এত বড় সুযোগ পেয়েও সব ভেস্তে যেতে দেখে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। হঠাৎ মনে পড়ল কোট্টায়াম থেকে মাত্র ষোল কিলোমিটার দূরেই কুমারাকোম গ্রামে আমার মা জন্মেছিলেন। মায়ের বাবা মানে আমার দাদু হিমাংশু আচার্যের ছিল কাঠের ব্যবসা। জমিজমা ছিল, আর ছিল অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা দোতলা বাড়ি। জমিবাড়ি সবই ছিল দাদুর বাবা সীতাংশু আচার্যের। অত বড় বাড়ি অথচ দাদুর একমাত্র সন্তান হয়েও থাকতেন দুটো মাত্র ঘরে। কারণ বাকি ঘরগুলো দেওয়া হয়েছিল একটা অনাথ আশ্রমকে। দাদুর বাবা সীতাংশু মারা যাবার আগে সেরকমই উইল করে গিয়েছিলেন। আমার মায়ের যখন দুবছর বয়স তখন দাদুর মাও মারা গেলেন। আর দাদু পুরো বাড়িটাই অনাথ আশ্রমকে দান করে পাকাপাকিভাবে চলে এলেন কলকাতায় একটা বেসরকারি চাকরি নিয়ে।"

"তুমি কি এই রাত্রে আমাকে আত্মজীবনী শোনাতে বসলে?" যুথিকাদেবী অধৈর্য হয়ে পড়লেন।

"ব্যাস্ ম্যাডাম, হয়ে গিয়েছে। আর একটু শুনুন প্লিজ।"

"তাড়াতাড়ি শেষ করো। আমার উপাসনার সময় হতে চলেছে।"

"ম্যাডাম, এই সব আমি জেনেছিলাম আমার মা গায়েত্রী ঘোষালের কাছ থেকে। আমার আট বছর বয়সে বাবা মারা যান। তারপরে বাড়ির একাংশ ভাড়া দিয়ে আর বাড়ি-বাড়ি গানের টিউশনি করে খুব কষ্টে মা আমাকে বড় করেছিলেন। কোট্টায়াম গিয়ে আমার সব মনে পড়ল। ভাবলাম এত কাছে এসেছি আর মায়ের জন্মস্থানটা দেখে যাব না! ছুটলাম কুমারাকোমে। ছবির মতো সুন্দর গ্রাম। পায়ে পায়ে হেঁটে ঘুরে নিলাম পুরোটা। শেষে গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে নজরে পড়ল 'সীতাংশু আচারিয়া মেমোরিয়াল অরফ্যানেজ'। আমার দাদুর বাবার নামে। ওখানেই আমার মা জন্মেছিলেন। সকালে গিয়ে যখন পৌঁছেছি তখন সীতাংশু আচার্যের আবক্ষ মূর্তির সামনে প্রেয়ার হচ্ছিল। আমার সঙ্গে আলাপ করে অধ্যক্ষ মিঃ এন পিল্লাই হেসে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, 'তোমরা কি বংশপরম্পরায় যুথিকাদেবীর ফ্যান?' আমি বললাম, 'কেন?' উনি বললেন, 'শুনেছি ছাদের ঘরটা ছিল সীতাংশুবাবুর কাজের ঘর। শুতেনও ওই ঘরেই। ঘরটা বন্ধই থাকে। বছর দেড়েক আগে ওই ঘরের একটা পুরোনো ট্রাঙ্ক থেকে আমরা কয়েকটা ডায়রি আর যুথিকাদেবীর প্রচুর ছবি পেয়েছি। তা, ওইরকম ডানাকাটা পরি একজন ফিলমঅ্যাকট্রেস বলে কথা, কাঁচা বয়সে তাঁর ছবি রাখার লোভ তো আমিও সামলাতে পারতাম না।' বলে খুব হাসলেন। আমি বললাম, 'আমি তো যুথিকাদেবীর

লাইফ নিয়ে এখনও কাজ করে চলেছি, ওই কাগজপত্রগুলো পেলে ভাল হত।' বললেন, 'তা নাও না, নিয়ে যাও। ও জিনিস তোমারই। এখানে পড়ে থেকে তো কোনও কাজের কাজ হচ্ছে না।'

"সব গুছিয়ে নিয়ে চলে এলাম কলকাতায়। তাঁর ডায়রিগুলো সব পড়ে ফেললাম। আপনাকে খুব ভালবাসতেন সীতাংশু আচার্য —"

দেবময়কে থামিয়ে যুথিকাদেবী বললেন, "শোনো দেবময়, গোটা পৃথিবীর বাঙালিদের কথা তো ছেড়েই দিলাম, শুধু এই পশ্চিমবঙ্গেই আমার ফ্যানের সংখ্যা গুনলে কয়েক কোটি ছাড়িয়ে যাবে। আর তারা সকলেই সেরা জুটি বলতে বংশী-যুথিকাই বোঝে। কোন এক মরে ভূত হয়ে যাওয়া সীতাংশু আচার্য কেরালার কোন গ্রামে বসে আমাকে ভালবাসছিল সেটা জেনে আমাকে কি এই একশো সতেরো বছর বয়সে ঘুঙুর পরে নাচতে হবে!"

"ম্যাডাম, সীতাংশু আচার্যের আসল নাম সুধীর ভাদুড়ি। ভালবাসতেন বলতে আমি স্নেহ করতেন বোঝাতে চেয়েছিলাম।"

যুথিকাদেবীর মাথার ওপরের ঘড়িতে জোরে শব্দ করে এগারোটা বাজল। তারপর সবকিছু চুপচাপ। বাইরের বৃষ্টিটাও বোধহয় থেমে গিয়েছে। ঘড়ির টিকটিক শব্দ এখন শোনা যাচ্ছে। প্রায় মিনিট তিনেক যুথিকাদেবী কথা হারিয়ে ছিলেন। এবার বললেন, "তুমি ঠিক বলছ তো? আর ইউ শিওর?"

দেবময় বললেন, "সীতাংশু আচার্যের ডায়রিতে তাঁর নিজের সব কথাই লেখা আছে, নিজের আসল নামটাও। আর, ডায়রির খাঁজে গোঁজা আছে আপনার বারো বছর বয়সে তাঁকে পাঠানো চিঠিগুলো। সব চিঠিতেই পেনসিলে কিছু না কিছু আঁকা। আপনি আপনার দাদাকে সম্বোধন করেছিলেন 'ভাইয়া' বলে আর আপনি নিজের নামের জায়গায় লিখেছিলেন 'ঝুনু'। এই নামদুটোর কথা বহুদিন আগে আপনি একটা ইন্টারভিউতে জানিয়েছিলেন। একটা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া সেই ডায়রিগুলোর একটা আমি সঙ্গে করে এনেছি। নীচে আমার ক্যামেরার ব্যাগে রয়েছে।"

"তার মানে তুমি আমার দাদার নাতনির ছেলে?"

"সেরকমই তো দাঁড়াচ্ছে।"

"আমার কাছে কী চাও?"

"ম্যাডাম, সম্পত্তি কিছু দেবেন কি না দেবেন সেটা আপনার ব্যাপার। আমি আসলে আপনার একটা সাক্ষাৎকার আর কয়েকটা ছবি নিতে চাই। প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে চলল আপনি জনসমক্ষে আসেননি। আপনাকে কেউ দেখেনি। আপনি সেই দুষ্টুমিষ্টি নায়িকা হয়েই জনগণের মনে রয়ে গিয়েছেন।"

"কেন, উনিশশো সাতানব্বইতে আমার শততম জন্মদিনে ফোনে একটা বাইট তো আমি দিয়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ছে তোমাদের পত্রিকারই কাউকে দিয়েছিলাম।"

সেখানেই তো মুশকিল ম্যাডাম। আপনার জন্ম শতবর্ষের পুরোটা কভার করেছিল বিভাস প্রামাণিক। আর তারপরে এই সতেরো বছরে সে আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে। যত বড় বড় অ্যাসাইনমেন্ট সব ও সাকসেসফুলি হ্যান্ডেল করেছে। আমার ভাগে লবডঙ্কা। আমার অনেক জুনিয়ার ছিল ও। কিন্তু এখন আমার জায়গাটাই কেড়ে নিতে চলেছে। নেক্সট মান্থেই আমাকে সরিয়ে ওকে এডিটরের সিটে বসানোর কথা চলছে। তাই আমি আজ আপনার কাছে চলে এলাম। সাকসেসফুল হব কিনা তো জানি না, তাই কাউকে জানাইনি এখানে আসছি বলে। এখন আপনিই আমার শেষ

ভরসা ম্যাডাম। প্লিজ একটু ভাবুন। আমি আপনাকে নিয়ে রিসার্চ করেছি। ছোটোবেলা থেকেই আপনার বিরাট ফ্যান। আমার মা ফ্রম দ্য বটম অফ হার হার্ট আপনার ফ্যান ছিলেন।”

“ছিলেন মানে? এখন নেই?”

“মারা গিয়েছেন। একটা অ্যাক্সিডেন্টে। আমার বয়স তখন ছাব্বিশ। হারিয়ে ফেলেছি আমার মাকে।”

“কীরকম অ্যাক্সিডেন্ট?”

“মা মারা গেছেন জলে ডুবে।”

“মিথ্যে কথা! তোমার মাকে মেরেছ তুমি!”

আঙুল উঁচিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন যুথিকাদেবী। তাঁর চোখ রক্তবর্ণ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে। পরক্ষণেই আবারও চেঁচিয়ে উঠলেন, “জুঁই! জুঁই!”

দরজায় এসে দাঁড়ালেন আর এক বৃদ্ধা। বয়স পঁচাত্তরের কম নয়। পরনে সাদা থান। এসে তিনি যুথিকাদেবীর দিকে তাকালেন।

“জুঁই। এই যে দেবময় ঘোষাল। নিজেই এসে ধরা পড়েছে ইঁদুর কলে। ওর মা গায়েত্রী তোমার বন্ধু ছিল তো? ওখানে বসে বলো তুমি কী জানো।”

অপরাধবোধে বোবা বনে গিয়েছেন দেবময়। তাঁর পাশের সিঙ্গল সোফায় ধীর পায়ে বসলেন জুঁইদেবী। তাঁরও দু’চোখ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে প্রচণ্ড রাগ। নিজেকে সংযত করে বলতে শুরু করলেন, “আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগেকার কথা। বিধবা গায়েত্রী অনেক কষ্টে তার একমাত্র ছেলে দেবময়কে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বিয়ের একবছরের মধ্যেই ছেলে গেল বিগড়ে। গায়েত্রী ছিল ধার্মিক। পুজোআচ্চা করত খুব। দেবময় তাকে নিয়ে এল নবদ্বীপে। নানা মন্দির দর্শনের পরে নিয়ে এল এক আশ্রমে। আশ্রমের অধ্যক্ষ-মহারাজ গায়েত্রীকে আলাদা করে ডেকে বললেন সংসার ছেলেবউয়ের হাতে ছেড়ে চিরকালের মতো আশ্রমেই থেকে যেতে। মহারাজের কথা গায়েত্রী অমান্য করতে পারেনি। কলকাতার বাড়িটা দেবময়ের নামে লিখে দিয়ে সে আশ্রমবাসী হয়ে গেল।

“আশ্রমটার গা দিয়েই বয়ে চলেছে হুগলি নদী। নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে রোজ ভোরবেলায় স্নান করা ছিল গায়েত্রীর প্রাত্যহিক অভ্যাস। কয়েকমাস বাদে বর্ষা এল। সকলে বলাবলি করতে লাগল বর্ষায় নদীতে বান এলে আশ্রমে বুক সমান জল জমে যায়, ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে হয়, খাওয়াদাওয়ার অসুবিধে হয়। গায়েত্রী ফোন করল দেবময়কে দু’তিন সপ্তাহ কলকাতায় তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখার জন্য। দেবময় বলল, ‘আরে জল তো আর হুড়মুড় করে বুক সমান হয়ে যাবে না, যখন দেখবে জল ঢুকছে, একটা রিকশা নিয়ে স্টেশনে এসে আমাকে ফোন করবে, আমি গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব।’

“পরেরদিন গায়েত্রীর কানে এল অদ্ভুত একটা তথ্য। দেবময় তার মাকে আশ্রমের রাখার বিনিময়ে নাকি প্রতি বছর মোটা টাকার চাঁদা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আশ্রমের অধ্যক্ষকে। এটা জানার পরে গায়েত্রীর মন ভেঙে যায়। ঠিক করল সে তার ছেলেকে আর ফোন করবে না। এর দুদিন পরে ভোরে গায়েত্রী ঘাটে নামার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে তুমুল বেগে জল এসে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। জলের তোড়ে গায়েত্রী ভেসে গেল।

“সেবার এইভাবে নবদ্বীপ থেকে বেশ কিছু মানুষ ভেসে গিয়েছিল। সাতজনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। বাকি সকলেই নিখোঁজ। নিখোঁজের তালিকায় গায়েত্রীও ছিল।

“গায়েত্রী কিন্তু তখন মরেনি। সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তার জ্ঞান যখন ফিরেছিল তখন সে কালীনগরের হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকে তাকে জানানো হয় যে তাকে পাওয়া গেছে কালীনগরের ঘাটে। নবদ্বীপ থেকে কালীনগরের দূরত্ব পাঁচ-ছয় কিলোমিটারের বেশি নয়।”

এতক্ষণ দেবময় চুপ করে শুনছিল। কিন্তু এখন সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। কিছু একটা সে বুঝে নিতে চেষ্টা করছে।

জুঁই বলে চলেন, “গায়েত্রী নিজের পরিচয় কাউকে দেয়নি। থানার এসডিপিও গায়েত্রীকে স্থানীয় একটা বৃদ্ধাশ্রমে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। সেই বৃদ্ধাশ্রমে আমিও ছিলাম। গায়েত্রীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয় সেখানেই। তারপরে ক্রমশই বন্ধুত্ব অনেক বেশি গাঢ় হতে থাকে।

“আমরা দুজনের কেউই তখনও বৃদ্ধ হইনি। বয়স পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশের বেশি নয়। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে দুজনেরই ওখানে ঠাঁই হয়েছিল। সেখানকার বয়স্কদের দেখাশোনার ভার পড়েছিল আমাদের উপরে। নুয়ে পড়া মানুষগুলোর সেবা শুশ্রূষা করে তাদের দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে দেবার গুরুদায়িত্ব আমাদের কাঁধে এল।

“আমরা সকলেই জানতাম যে সেই বৃদ্ধাশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী আমাদের সকলের প্রিয় যুথিকাদেবী। ভারতের বহু বৃদ্ধাশ্রমের জন্যই অর্থ সাহায্য করেন তিনি। একদিন আচমকাই যুথিকাদেবীর বাড়িতে গায়েত্রীর ডাক পড়ল—”

জুঁইকে বাধ্য হয়ে থামতে হয়েছে। কারণ দেবময় অদ্ভুত একটা কাণ্ড করেছেন। তিনি নিজের বাঁপায়ের মোজাটা এক টানে খুলে ফেলে বললেন, “দেখুন জুঁইদেবী, দেখেছেন, আমার বাঁ পায়ের আঙুলের সংখ্যা ছয়। কড়ের পাশে আরও একটা কড়ে এক্সট্রা।” এই বলেই দেবময় লাফিয়ে উঠে গিয়ে যুথিকাদেবীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে উঠলেন, “মা, মা গো, আমাকে ক্ষমা করে দাও মা—”

দেবময়কে ছাড়িয়ে যুথিকাদেবী বললেন, “তোর বুদ্ধিতে এখনও খুব বেশি মরচে ধরেনি দেখছি। প্রণাম করার সময়ে আমার বাঁ পা টা খেয়াল করেছিলিস। যাক গে, তোর মাকে তুই তিরিশ বছর আগেই মেরে ফেলেছিস। এখন আমি আর তোর মা নই। এখন আমি গায়েত্রী ঘোষাল নই। এখন আমি যুথিকা সাক্সেনা। যিনি চিরতরুণী, মৃত্যুঞ্জয়ী।”

যুথিকা ওরফে গায়েত্রী তাঁর ছেলেকে আদেশ করলেন, “যা, নিজের জায়গায় গিয়ে বোস।” তাঁর কণ্ঠস্বর এখন মৃদু নয়, আর কাঁপছেও না। টেবল থেকে তুলে তিনি এক গ্লাস জল খেলেন। তারপর চেয়ারে বসে শুরু করলেন নিজের বক্তব্য, “থ্যাঙ্কস, জুঁই। এর পর আমি বলছি। দেবু তুই জানিস যুথিকাদেবী তিনবার বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের আগে তিনি ছিলেন মিস যুথিকা ভাদুড়ি। তাঁর শেষ স্বামীর নাম ছিল হিতেশ সাক্সেনা। সেই থেকে তিনি হলেন মিসেস যুথিকা সাক্সেনা। যদিও সকলে তাঁকে যুথিকাদেবী নামেই বেশি চেনে। তিনবার বিয়ে করেছিলেন অথচ একটিও সন্তান হয়নি যুথিকাদেবীর। সন্তানের শোকে ভেঙে পড়ে দত্তক নেবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময় আসানসোলের এক বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে তাঁর নতুন চেতনা হল। আপন সন্তানেরাই নিজেদের মা-বাপকে কীরকম কষ্ট দেয় তা তিনি নিজের চোখে দেখলেন। তখন থেকে সন্তানের মায়া তাঁর সম্পূর্ণ কেটে গেল। সন্তান ব্যাপারটার ওপরেই একটা ঘৃণা জন্মাল। বৃদ্ধদের জন্য চিরকাল করে যাবেন ঠিক করলেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁরা যাতে তারুণ্য নিয়ে বাঁচতে পারেন তার জন্য একটা ট্রাস্ট তৈরি করলেন। নিজে ছিলেন খ্যাতনামা অভিনেত্রী। তার উপরে অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে তিনি ইনভেস্টও করেছিলেন। তাই তাঁর টাকার কোনও অভাব ছিল না। তোর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন যুথিকাদেবীকে নিয়ে একটা সিনেমা তৈরির কথা হয়েছিল মনে আছে? সেটায় নায়িকার রোলে আমি অডিশন দিতে গিয়েছিলাম। তারপর সিনেমার

সেই প্রজেক্টটা বানচাল হয়ে যায় এরকমই সকলে জানে। কিন্তু আসল ঘটনা ছিল যে, কোনও সিনেমা করার জন্য ওই অডিশনটা হয়নি। অডিশন হয়েছিল রিয়্যাল লাইফে অভিনয় করার জন্য। যুথিকাদেবীর ট্রাস্ট দায়িত্ব নিয়েছে তাঁকে অমর করে রাখার। পুরো ব্যাপারটাই অত্যন্ত গোপনীয়। আজ একজন বাইরের লোক হয়ে তুই জানলি।

"অডিশনের পরে পাঁচজন সিলেকটেড হয়েছিল যাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। এই পাঁচজনের গতিবিধির উপরে খুব সন্তর্পণে নজর রাখা হয়। এদের সকলকে অনেকটাই যুথিকাদেবীর মতো দেখতে। কিন্তু সেটুকুই যথেষ্ট নয়। বৃদ্ধা যুথিকাদেবীর ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য এদের জীবনেও যথেষ্ট কারণ থাকার দরকার। সেই কারণ আমার মধ্যে ছিল। সন্তানের প্রতি আমি বীতশ্রদ্ধ ছিলাম। তাই বৃদ্ধাশ্রম থেকে ডাকা হয় আমাকে। যুথিকাদেবী নিজে এই বাড়িতে ডেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর আসন গ্রহণ করতে আমি রাজি কিনা। আমার কোনওরকম পিছুটান ছিল না। তাই আমি তাতে নির্দ্বিধায় সম্মতি দিই।

"এর পরে শুরু হয় আমার ট্রেনিং। যুথিকাদেবীর জীবনের খুঁটিনাটি জানা আর তাঁকে হুবহু নকল করা, তাঁর মনোভাব, জীবানাদর্শকে আত্মীকরণ করা। সব পরীক্ষাতেই সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলাম আমি। তারপর ছোটো প্লাস্টিক সার্জারি করে আমার মুখের আর শরীরের কিছু জায়গা মেকআপ করা হল। বাঁ পায়ের বাড়তি আঙুলটা কাটা গেল। যুথিকাদেবী আমাকে দেখে বুকে টেনে নিলেন। এখন আমিই মিসেস যুথিকা সাক্সেনা। আমার পরে আর একজন আসবে। তারও ট্রেনিং চলছে। তার পর আসবে আরও অন্য কেউ। এইভাবে জনগণের চোখে চিরঅমর, চিরতরুণী, চিররূপসী রয়ে যাবেন যুথিকাদেবী।"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শুনছিলেন দেবময়। এবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু আসল যুথিকাদেবী?"

ঘড়িতে বারোটা বাজল। উঠে পড়লেন গায়েত্রী। বললেন, "আমার উপাসনার সময় হয়ে গিয়েছে। তুমি যদি চাও তো আমার সঙ্গে নীচে উপাসনার ঘরে আসতে পারো।"

সিঁড়ি দিয়ে নেমে ডানদিকে সদর দরজা। আর গায়েত্রী চললেন বাঁদিকে। তাঁকে অনুসরণ করলেন দেবময়। একটা করিডর পড়ল। তার শেষ মাথার ডানদিকের দরজা খুলে ঢুকলেন গায়েত্রী। ঘরটা দেখে মন্দির ছাড়া আর কিছু মনে হবে না। কিন্তু কোনও বিগ্রহ নেই। দেওয়াল, মেঝে সবকিছুই শ্বেত পাথরে বাঁধানো। ঘরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে শ্বেতপাথরের আয়তাকার বড়ো একটা বেদি। সেটা ঘিরে চারপাঁচজন বৃদ্ধবৃদ্ধা বসে। প্রত্যেকেরই সামনে বেদির উপরে একটা করে প্রদীপ জ্বালানো। প্রদীপের আলো ছাড়া ঘরে অন্য কোনও আলো নেই। এ ঘরটাও বেশ ঠাণ্ডা। গায়েত্রীকে ঢুকতে দেখে বাকি সকলে উঠে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। বেদির পেটের কাছে এক প্রান্তে গায়েত্রী বসলেন। দেবময়কে উলটোদিকে বসতে ইশারা করলেন। বাধ্য ছেলের মতো দেবময় বসলেন। তিনি লক্ষ করলেন যে, দেওয়ালের এক জায়গায় অনেকগুলো বৃত্ত আঁকা আছে যাদের প্রত্যেকটার কেন্দ্রবিন্দু একটাই। সেই কেন্দ্রের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন গায়েত্রী। তারপরে চোখ বুজলেন। মিনিট দশেক পরে চোখ খুলে বললেন, "তোমার আর কোনও প্রশ্ন থাকলে এবারে করতে পারো।"

একটু নড়েচড়ে বসে দেবময় বললেন, "এই যে জুঁইদেবী, শ্যামাপদ বা অন্য যাঁদেরকে দেখলাম তাঁরা কি—"

"শ্যামাপদ বাদে সকলেই বৃদ্ধাশ্রম থেকে এসেছেন। আমার কাজে যাঁরা সাহায্য করেন তাঁরা সকলেই বৃদ্ধ কিন্তু খুবই দক্ষ। সবচেয়ে বড়ো কথা সকলেই হৃদয় দিয়ে কাজ করেন।"

"আর— আসল যুথিকাদেবী?"

"বাইশ বছর ধরে এই বেদির নীচে শুয়ে আছেন।"

শিউড়ে উঠলেন দেবময়। আর তাঁর কিছু জানার নেই। বললেন, "আচ্ছা, আমি তাহলে এবার চলি।"

"রাত তো অনেক হল। থেকে যাও। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ো।"

"থেকে যাব?"

"কেন, অসুবিধে হবে?"

"না, অসুবিধে নেই। বাড়িতে তো বলেই এসেছি আজ রাতটা ফিরব না। বেশিরভাগই আমি রাতে অফিসে থাকি।"

"তাহলে খেয়ে শুয়ে পড়ো। শুতে অবশ্য তোমার একটু অসুবিধেই হবে।" গায়েত্রী চোখ বুজে ফেললেন, "কারণ, এই উপাসনাঘরের পিছনে যে বাগানটা আছে—"

"বাগানে!" দেবময় হেসে ফেলল, "সে ঠিক আছে।"

"হ্যাঁ, ওর জমির নীচেই তোমাকে শুতে হবে চিরকালের মতো।"

দেবময়ের হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল। মৃত্যুভয় অজগর সাপের মতো তাঁর আগাপাশতলা পেঁচিয়ে ধরল। ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, "কী! কী বলছ মা! তুমি আমাকে মারবে? আমাকে? তুমি? কত কষ্ট করে আমাকে বড় করেছ মা তুমি, কত দুঃখ সহ্য করেছ তোমার ছেলেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। সেই তুমি—"

"এই ঘরের দুদিকে দুটো ফোকর আছে খেয়াল করোনি বোধহয়। সেই ফোকর থেকে দুটো পিস্তল রয়েছে তোমার দিকে তাক করে। আর দরজার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো চারজন ঢুকছেন তোমার শোয়ার বন্দোবস্ত করবেন বলে। চুপ করে ওদের সঙ্গে পাশের ঘরে যাও। আর, তোমার কাছে তোমার মা তো বেঁচে নেই। তুমিও মরে গিয়েছ তোমার মায়ের কাছে, বহুদিন আগেই। এখন তোমার সামনে বসে রয়েছেন যুথিকাদেবী, যিনি সন্তান জিনিসটাকেই ঘৃণা করেন। তাছাড়া, তাঁর অমরত্বের রহস্য বাইরের কেউ জানুক এটাও তিনি কিছুতেই চান না। তাই, আমার কর্তব্য আমি করবই।"

"তুমি... মানে আপনি... মানে তুমি ভুল করছ মা। বিরাট ভুল। আমার গাড়িটা একটু দূরে পার্ক করানো আছে। তুমি কিন্তু ধরা পড়ে যাবে।"

"সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। ও গাড়ির চাবি তোমার ক্যামেরার ব্যাগে পেয়েছে শ্যামাপদ। তোমার মোবাইলের সেন্ট আইটেমেও একটা ম্যাসেজ পেয়েছে সে। তুমি গাড়ি করে মেদিনীপুর যাচ্ছ বলে লিখেছ তোমার স্ত্রীকে। আজ রাতে ফিরবে না বলেছ। সব খবরই আমার কাছে এসেছে এই বাঁ কানের ইয়ারফোনটার মাধ্যমে। মেদিনীপুরের রাস্তায় তোমার গাড়িটাকে অ্যাক্সিডেন্ট করিয়ে জলে ফেলে দেওয়া আমার লোকেদের কাছে কঠিন নয়। আর তোমার লাশ না পাওয়া গেলে তুমিও নিখোঁজের তালিকায় থেকে যাবে চিরকালের মতো।"

অলংকরণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

মজার গল্প

গাড়িটা

কাছে আসতেই পঞ্চানন এগিয়ে এল। অনিমেষ জানলার কাচটা অর্ধেকটা নামাল। 'আসেন স্যার, আসেন স্যার...নমস্কার' - বলে পঞ্চানন হাত দুটো কপালে ঠেকায়। দেখাদেখি অনিমেষও হাতটা একটু নিজের কপালের দিকে তোলে।

পঞ্চানন লোকটা মাঝবয়সি, ছিপছিপে চেহারা, সবসময় একটা ঢোলা পাজামা আর খাটো পাঞ্জাবি পরে থাকে। লোকটা খুব কাজের, ওর সাহায্য ছাড়া এই এলাকাতে এই ব্যাবসাটা শুরু করাই সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। এর জন্য তুলতুলির বাবাকে, মানে নিজের শ্বশুরমশাইকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হয়। তিনিই পঞ্চাননের সাথে যোগাযোগ করার কথা বলেছিলেন। পঞ্চাননের মুখে কথার খই ফুটছে সর্বদা। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এবং সর্বদা পজিটিভ কথা বলে। ওর সাথে তাই কথা বলতে ভাল লাগে অনিমেষের, মনে যেন একটা বল পায়।

'কাজকর্ম সব ঠিকঠাক চলছে তো? কোনো অসুবিধা হলে জানিয়ো, আমি তো সবসময় থাকতে পারি না...' – অনিমেষ বলল।

'ও আপনি কিচ্ছু ভাববেন না স্যার, আমি সব সামলে নেব...' – পঞ্চানন এর ঝটপট উত্তর।

সল্টলেকের এই সেক্টর ফাইভ এর কাছাকাছি রাজারহাট নামক জায়গাটাতে ব্যাঙের ছাতার মতো হাজার হাজার বাড়ি উঠছে, এইখানেই যে এই ব্যাবসাটা ভাল চলবে সেটা পঞ্চাননই বলেছিল। আর জায়গাটাও অনিমেষের ভাল লেগেছিল, একটু বেশ ফাঁকা ফাঁকা, রাস্তাঘাটও বেশ একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মেন শহরের তুলনায়।

আর এখানে এইসব বাড়িগুলিতে যেসব দম্পতিরা থাকেন তাঁরা সবসময় ব্যস্ত নিজেদের কাজ নিয়ে, কত কাজ, অফিসের কাজ ছাড়াও পার্টি, ফেসবুক, হোয়াটসাপ ইত্যাদি নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন এনারা যে অনেক সময় নিজেদের যে বংশবৃদ্ধি করতে হবে সেটাও ভুলে যায়। হঠাৎ করে একদিন হয়তো খেয়াল হল, 'আরে! বংশে বাতি দেবার তো কেউ নেই! কী হবে!...' , কিন্তু তখন যা লেট হবার হয়ে গেছে।

তা এইসব পরিবারের লোকেরা যে নিজে হাতে বাসন মাজবে না, সে তো বলাই বাহুল্য। তার ওপর আজকাল কাজের লোকের যা আকাল পড়েছে, তাই বাসনমাজার কারখানাটা এই এলাকাতেই রমরমিয়ে চলবে, তাতে আর আশ্চর্য কী। হ্যাঁ, তাই এখানে অনিমেষ কুড়ি একর জায়গা কিনে নিয়েছিল, পুরো এলাকাটাকে ছোট ইঁটের পাঁচিল দিয়ে ঘিরে তার মধ্যে চারটে বিশাল বিশাল চৌকোন ঘর বানিয়েছিল, তারপর প্ল্যানমত প্রত্যেকটা ঘরে তিনটে লাইনে সার সার দিয়ে সিঙ্ক আর তার ওপর দিয়ে কলের জলের লাইন বসিয়েছিল। সিঙ্কগুলো কোমরের হাইটে , সিঙ্ক এর নীচে খোপ খোপ করা, সেখানে বাসন মাজার সাবান, ওয়াশিং স্ক্রাবারগুলি থাকে। অনিমেষ যখন আমেরিকাতে থাকত, তাদের রান্নাঘরেও ঠিক এরকম ব্যবস্থা ছিল, অনেকটা সেই স্টাইলেই বানানো। প্রত্যেক সিঙ্কের পিছনে একটি করে প্রশস্ত জায়গা করা আছে, বাসন মেজে রাখার জন্য, তার পরেই আর একটা সিঙ্ক এর লাইন শুরু হয়েছে। এইভাবে তিনটে সারিতে।

অনিমেষের গাড়িটা আর একটু এগিয়ে তার ছোট্ট অফিস ঘরটার কাছে থামতেই, অনিমেষ নেমে পড়ল। বয়সটা যে সত্তর পেরোল বুঝতে পারে, এখন আর হুট বলতে পুট করে কোনো কাজ করতে পারে না। সব কিছুই একটু ধীর লয়ে করতে হয়। রাস্তায় দাঁড়িয়েই জোরে একটা নিশ্বাস নিল। চারটে ঘর থেকেই বাসন মাজার শব্দ আসছে, সাবানের হালকা মিষ্টি গন্ধে বাতাসটা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। চোখ বুজে অনিমেষ আর একবার জোরে নিশ্বাস নিল ,তার স্বপ্ন অনেকটাই সফল হয়েছে ... ফিরে গেল সেই আমেরিকার দিনগুলিতে...

ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরেই একটু ল্যাপটপে টুকিটাকি করছিল, তুলতুলি অফিস থেকে একটু লেট করে ফেরে। একটু পরেই ও ঢুকেছিল।

'কী গো, এসেই আবার ল্যাপটপ নিয়ে বসে পড়েছ ? সিঙ্ক এর ওপর যে কাল রাতের ডাঁই করা বাসন পত্তর রয়েছে , সেগুলি কে মাজবে ? মাজা থাকলে রান্নাটা এখুনি শুরু করতে পারতাম,' – তুলতুলি একটু রেগেই বলল।

'ও হ্যাঁ , মাজছি...' - অনিমেষ বলল।

এই ব্যাপারটা প্রথম দিকের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। বাসন মাজতে তার কোনোদিনই ভাল লাগত না। সেই ছোটবেলায় দেখত বাড়ির চাকরানিটা যখন বাসন মাজত ,কিরকম মুখ ব্যাজার করে থাকত। তখন থেকেই মনের মধ্যে একটা ধরণা দানা বেঁধেছিল, বাসন মাজাটা নির্ঘাত একটা বিতিকিচ্ছিরি কাজ, তবুও মাজতে তো হবেই, না হলে কে মাজবে ? এখানে তো আর কাজের লোক নেই! তুলতুলি রান্না করে এবং আরও কত ঘরের কাজকর্ম করে। তাই কাজ ভাগ করা আছে। অনিচ্ছসত্ত্বেও বাসন মাজার কাজটা তার ভাগে এসে পড়েছিল।

কিন্তু ধীরে ধীরে কী যে হল, সেই বিতিকিচ্ছিরি কাজটাই অনিমেষের কেমন যেন ভাল লাগতে শুরু করল। ভাল লাগতে লাগতে এমন ভাল লাগা শুরু হল যে বাড়িতে আর কোনো এঁটো-কাঁটা বাসন আর পড়েই থাকে না। সিঙ্কে আর

কোনো বাসন পড়েই থাকে না। একদম পরিষ্কার। ঝকঝকে তকতকে। ভীষণভাবে ভালবেসে ফেলল এই কাজটাকে। সিঙ্কে নোংরা বাসন দেখলেই হাতটা নিশপিশ করত, আর তখুনি ডান হাতে তুলে নিত স্ক্রাবার নামক এক অস্ত্র আর বাঁহাতে সাবানের বোতল। তারপর মাজত বাসনগুলো। নেশাখোররা যেমন নেশার জিনিস পেলে তা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে, অনিমেষও এই কাজটাকে সেইভাবে উপভোগ করত।

শুধু তাই নয় , বাসন মাজার খুঁটিনাটি নিয়ে তার মাথায় নতুন নতুন দিগন্ত খুলে যেতে থাকল, ব্যাপারটা একটা আর্ট এর পর্যায় চলে এল তার কাছে। বাসন মাজা মানে তো শুধু সাবান আর ছোবরা নিয়ে ঘসর ঘসর করে 'যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায়' এই মনোভাব নিয়ে কাজ করা নয়! এর মধ্যেও অনেক জিনিস শেখার আছে। কত কম জল ও সাবান খরচা করে অথচ কোয়ালিটি ঠিক রেখে বাসন মাজা যায়, সেটা যে মাজছে তার কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হওয়া উচিত। বাসন মাজার একটা প্রেলুড থাকে যেটা অনেকেই ভুলে যায়। মাজার দুই ঘন্টা আগে কিছু বাসন জলে ভিজিয়ে রাখা অবশ্য কর্তব্য। তাহলে টাফ ময়লাগুলো খুব সহজেই তুলে ফেলা সম্ভব হয়, তাতে জল, সাবান এবং পরিশ্রমও অনেক কম হয়। ভিজিয়ে রাখা সত্ত্বেও বাসনে কিছু বেয়াড়া ময়লা থাকে, যেগুলি কোনোভাবেই উঠতে চায় না। অনিমেষ এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল এবং এটা নিয়ে একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এটা বুঝেছিল যে বাসন এর স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেটাকে সিঙ্কের সাথে ৪৫ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ধরে যদি ময়লাটির পাদদেশ ধরে একটি টর্ক প্রয়োগ করা যায়, তাতে ময়লাটি অতি সহজেই খুলে আসে। তাহলে বাসন মাজা শুধু আর্টই না, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে ফলিত বিজ্ঞান বা অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স এর কতকিছু কারিকুরি। আর একটা অদ্ভুত জিনিস অনিমেষ খুব অনুভব করত, নোংরা বাসনগুলি মাজার পর পরিষ্কার করা বাসনগুলির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হত, সে যেন একদন বিপথগামী মানুষকে আবার সমাজের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মূলস্রোতে ফিরিয়ে এনেছে। নিজেকে কেমন একটা সমাজসেবীর মত মনে হত।

তা এহেন কাজটি, যার মধ্যে কিনা শিল্প ও বিজ্ঞানের এক অদ্ভুত সমাহার, সেটা করতে লোকে নাক সিঁটকায় কেন, অনিমেষ বুঝতে পারে না। আসলে অন্যেরা হয়তো সেভাবে কাজটাকে দেখেনি, যেভাবে অনিমেষ এখন দেখে। অন্যেরা শুধু খারাপ জিনিসটাই দেখেছে। আরে বাবা! সব জিনিসের মধ্যেই ভাল খারাপ তো থাকে, সেক্ষেত্রে খারাপ জিনিসটাকে ঘৃণা করার থেকে, ভাল জিনিসটাকে ভালবেসে পুরো জিনিসটাকে ভালবাসাই তো বুদ্ধিমানের কাজ, যখন কাজটা তোমাকে করতেই হবে।

যাইহোক কী যে হল এরপর থেকে, মাথায় সবসময় বাসনমাজা নিয়ে চিন্তা ভাবনা ঘুর ঘুর করত। অফিস থেকে বাড়ি গিয়ে কখন সে সিঙ্ক এর সামনে দাঁড়িয়ে নোংরা বাসন গুলি মাজবে, তার জন্য হাতটা নিশপিশ করতে থাকত, অদ্ভুত এক আনন্দ অনুভব করত সে। তখনি সে মনে মনে ভেবে নিয়েছিল, যে এই বাসনমাজা নামক কাজটাকে একটা লেভেল এ নিয়ে যেতে হবে। আর তখনি মনে এসেছিল যে বাসনমাজার একটা কোম্পানি খুললে কেমন হয়! সে তো এখন বাসনমাজার ব্যাপারে একজন মোটামুটি বিশেষজ্ঞ, কিছু লোককে একটু ফরম্যাল ট্রেনিং দিয়ে কাজ শুরু করবে। শুনতে একটু হাস্যকর শোনাবে বটে, যে বাসন মাজার ওপর আবার ট্রেনিং! কেউ কেউ হয়ত শুনে ভিরমিও খাবে, এ আবার কী রে বাবা! এ তো বাপের জন্মেও শুনিনি, কিন্তু অনিমেষের মনে হয় এটার দরকার আছে, আপাতদৃষ্টিতে বাসনমাজা হেলাফেলার কাজ মনে হলেও, এটা যে তা নয় এবং এর মধ্যেও যে কতটা গভীরতা আছে , সেটা ফরম্যাল ট্রেনিং দিলেই কর্মচারীরা বুঝতে পারবে।

আরও ঠিক করল বাসনমাজা নিয়ে কিছু বইও লিখবে ‘বাসন মাজার শৈল্পিক দিকসমুহ’, ‘বাসনমাজা – এক অবহেলিত শিল্প’, এরকম গোছের কিছু নাম দেবে। ইংরেজিতেও লিখবে যাতে বিশ্বব্যাপী লোক এর গুরুত্ব সম্বন্ধে অবগত হতে পারে। ‘The Art of Cleaning Utensils While Facing the Sink’ এরকম একটা নাম দেবে ভাবল। আর অনেকগুলো ছোট ছোট চটি বই লিখবে যাতে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট সংক্ষেপে লেখা থাকবে বাসন মাজার পদ্ধতি, ছোটখাট সমস্যার সমাধান বা Troubleshooting, অনেকটা ‘কুইক রেফারেন্স গাইড’ এর মত। প্রত্যেক কর্মচারীর বুক পকেটে একটা করে থাকবে কাজের সময়, কর্মক্ষেত্রে সেটাই হবে তাদের বাইবেল। এছাড়া কোনও নামকরা ম্যাগাজিনে বাসন মাজার ওপর মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লেখারও ইচ্ছা আছে।

এই কোম্পানিটা অবশ্যই দেশে গিয়ে খুলতে হবে, আমেরিকাতে হবে না। এদেশে সবাই নিজের কাজ করতে খুব অভ্যস্ত আর তাছাড়া শ্রমিকদের মজুরিও অনেক বেশি দিতে হয়। তাই আরও বেশ কিছু টাকা জমিয়ে কলকাতাতে গিয়েই খুলবে, এটাই ঠিক করেছিল।

তুলতুলি ব্যাপারটা ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছিল, দোষটা অনিমেষেরই, বাসন মাজার ওপর ভালবাসাটা ওর এমন একটা লেভেল এ পৌঁছেছিল যে ও সবসময় ডান পকেটে একটা স্ক্রাবার ও বাঁ পকেটে একটা ছোট্ট সাবানের শিশি রাখত। একদিন অফিস থেকে ফিরে এক ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে তুলতুলি সেগুলি দেখে ফেলে। সেই প্রথম তুলতুলি বুঝতে পারে তার বাসনমাজাকে ঘিরে তার স্বামীর কিছু একটা ব্যাপার চলছে।

‘এ মা! পকেটে সাবান, ছোবড়া কেন? এ আবার কী ? তুমি কি পাগল ?’ – তুলতুলি বেশ উৎকণ্ঠার সাথে বলেছিল।

‘কেন!, ডাক্তাররা যেমন গলায় স্টেথো রাখে, পুরোহিতরা যেমন নামাবলি গায়ে জড়িয়ে রাখে, মেকানিকরা যেমন কাছে সবসময় স্ক্রুড্রাইভার রাখে, সেরকম আমিও সাবানের শিশি আর বাসন মাজার ছোবড়া রাখি, কারণ এটা আমাকে প্রায়ই করতে হয় তাই! এবং আমি এটা ভালবাসি তাই...এতে আসুবিধার কি হল ?’ – অনিমেষ উত্তর দিয়েছিল।

‘তুমি একটা পাগল!’ – তুলতুলি হতভম্ব হয়ে বা কী বলবে ভেবে না পেয়ে বলেছিল।

শুধু যে নিজের বাড়িতেই সিঙ্কে নোংরা বাসন দেখলে হাত নিশপিশ করত তাই নয়, কোনও বন্ধুদের বাড়িতে হয়তো গেছে নিমন্ত্রণে, সেখানে তাদের রান্নাঘরে নোংরা বাসনপত্তর দেখলেও ভিতরটা কেমন যেন ছটফট করে উঠত। ইসস! এগুলি যদি মাজা যেত! একবার একজনের বাড়িতে গিয়ে মেজেও ছিল কয়েকখানা বাসন, সবার অলক্ষে।

পকেটে তো সরঞ্জাম থাকেই সবসময়, অনিমেষের আবার নিজস্ব পছন্দের কিছু স্ক্রাবার ও সাবান আছে, অন্য ব্রান্ড তার আবার অত পছন্দ না। তাই নিজের ব্রান্ডটা সে নিজের পকেটে রাখতেই পছন্দ করে। সুপারমার্কেটে গেলেই অনিমেষ দেখে আসে নতুন কোনও ভাল বাসনমাজার সাবান বা ওয়াশিং স্ক্রাবার এল কিনা। তবে তুলতুলি একবার দেখে ফেলার পর অন্যের বাড়ি গিয়ে রান্নাঘরে প্রবেশ একদম নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

‘স্যার, একটু চা আর জলখাবার এনেছি, ভেতরে আসুন, বাইরে যা গরম!...’ – পঞ্চাননের ডাকে সম্বিত ফিরে পায় অনিমেষ।

‘হ্যাঁ, চল...’ অনিমেষ বলে, যদিও গরমটা তার কোনও সমস্যা নয়। ঠান্ডার থেকে উত্তাপ তার ভাল লাগে। অফিসের চারদিকে সুন্দর করে কিছু কিছু জায়গায় পঞ্চানন লোক লাগিয়ে ফুলের বাগান করিয়েছে, খুব সুন্দর লাগছে।

অনিমেষ ভিতরে এসে বসে। চা খেতে খেতে অফিসের কিছু কাগজপত্তর দেখে নেয়, কয়েকটা চেকে সাইন করে। পঞ্চাননের সাথে টুকিটাকি কথা হয় কাজের ব্যাপারে। পঞ্চানন লোকটা আগে ধোবিগিরি করত। সবার কাপড় কাচত। তাই মনে হয় ও বাসন মাজার ব্যাপারটা এত ভাল বোঝে। আসলে যদি দেখা যায়, কাপড়কাচা আর বাসনমাজার মধ্যে নীতিগতভাবে অনেক মিল। যদি বলা হয় 'বাসন-কাচা' বা 'কাপড়-মাজা', কথাটা খটমট শোনালেও, খুব একটা ভুল না। ধোবিরা যেমন প্রত্যেকজনের কাপড় আলাদা আলাদা করে ট্যাগ করে, যাতে এর জামা ওর ঘরে না চলে যায়, এখানে বাসনমাজার ক্ষেত্রেও সেরকম করতে হয়। পঞ্চানন কিছু কর্মচারীকে ট্রেনিং দিয়ে দিয়েছে, কীভাবে সেগুলি করবে। কাজটা একদম ছেলেখেলা না, এই হাজার হাজার বাসনের মধ্যে কোন লোকের কোনটা বাসন সেটা ঠিকঠাক চিহ্নিত করতে না পারলে, পুরো ব্যাপারটাই ভোগে চলে যাবে।

পাঁচটা ছোট ছোট ট্রাক অনিমেষ ভাড়া নিয়েছে, সেগুলি ভোরবেলা বেরিয়ে যায়, বাড়ি বাড়ি গিয়ে এঁটো-কাঁটা বাসন সংগ্রহ করে কারখানাতে ফিরে আসে। তারপর সেগুলো ট্যাগিং হয়, প্রিওয়াশ হয়ে মাজার কাজ শুরু হয়। মাজা হয়ে গেলে ড্রাই করা হয়, বিকেলের দিকে সব আবার ফেরত যায় যার যার বাড়িতে। এটা অবশ্য দুই খেপে হয়, পরের খেপের গাড়িগুলো একটু দুপুরের দিকে যায় আবার যায় সন্ধের দিকে। প্রথম কয়েকটা বাড়ি ছিল, ধীরে ধীরে এখন অনেক বাড়ি বেড়েছে। সেইজন্য এখন কাজের চাপও বেশি।

প্রত্যেক সপ্তাহে একবার সব কর্মচারীদের নিয়ে একটা মিটিং হয়। অনিমেষ সেখানে একটু বাসনমাজা নিয়ে কথা বলে। এই যেমন বাসনমাজা নিয়ে সারা দুনিয়াতে মানুষের সচেতনতা বা awareness, নতুন নতুন কী কী সম্ভবনার কথা এবং আরও নানারকম টেকনিক্যাল কথাবার্তা, সবই বাসনমাজা নিয়ে। কর্মচারীরা শুনে খুবই উৎসাহিত হয়। অনিমেষের ভাল লাগে। তাদের কথাও অনিমেষ মন দিয়ে শোনে। বাসন মাজতে গিয়ে কারও কোনও সমস্যা হলে বা কোথাও কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে সেগুলো ভাল করে বুঝিয়ে দেয়। যদিও প্রত্যেক কর্মচারী বুকপকেটে বাসন মাজার কুইক রেফারেন্স গাইড থাকে, তবুও অনেকসময় কিছু কিছু জিনিস বই পড়ে তো হয় না! অনিমেষ সেটা বোঝে। অনিমেষ আজ এসেছে সেই সাপ্তাহিক মিটিং সারতে। জলখাবারটা খেয়ে চেয়ারে গা টা একটু এলিয়ে দিল, ভেবে নিল কী কী বলবে আজ। তারপর আবার সেই পুরোনো দিনের আমেরিকার ঘটনাগুলো মাথায় আসতে লাগল।

আমেরিকাতে গেছিল ছাত্র হয়ে। ছোট থেকেই সে প্রচন্ড মেধাবী ছাত্র ছিল। আমেরিকার একটা নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেয়েছিল সে Higher Study করার। তখন সবাই খুব আশির্বাদ করেছিল, এ ছেলে একদিন খুব বড়ো হবে, সবার মুখ উজ্বল করবে। করেওছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার প্রত্যেকটি ধাপেই সে দারুন ফল করেছিল, প্রফেসররা সবাই তাকে খুব ভালবাসত। ফরম্যাল পড়াশুনা শেষ হলে, সেখানেই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের কাজ পেয়ে যায়। সাথে সাথে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেত। তারপর বিয়ে হল, বাচ্চা হল, একদিন সে প্রফেসরও হল। সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। এরই মাঝে মাঝেই এই বাসনমাজার ওপর Passion বা ভালবাসা বা Obsession যা-ই বলা যায়, সেটা শুরু হয়েছিল। গোল বাধল তখন থেকে যখন অনিমেষ তুলতুলিকে বললও কলকাতায় গিয়ে একটা বাসনমাজার কম্পানি খোলার ইচ্ছার কথা এবং তাহলে পুরোপুরিভাবে দেশে ফিরে যেতে হতে পারে।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? এখানে তুমি কত বড় একটা কাজ কর, বাচ্চা এখানকার জীবনযাত্রায় অভ্যাস্ত হয়ে গেছে, এখন তুমি ওদেশে ফিরে যাবে ? আমি একদম যাব না...' – তুলতুলি রেগেমেগে বলেছিল...'আর তাছাড়া আমাদের বাড়ি, তোমাদের বাড়ির কেউই মেনে নেবে না এ ব্যাপারটা! এখানে এরকম একটা সম্মানজনক কাজ ছেড়ে দেশে গিয়ে কিনা বাসন মাজবে ? ছিঃ ছিঃ, ভাবলে কী করে এটা ?...'

'আরে আমি কি বাসন মাজব নাকি ? আমার আন্ডারে কর্মচারীরা মাজবে...' – অনিমেষ বোঝানোর চেষ্টা করেছিল।

'ওই একই হল, দেশে আমাদের আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশীরাই বা কী বলবে ? সবাই বলবে তুলতুলির বর তো দেশে ফিরে এসেছে, এখন বাসন মাজে... সেটা কি খুব শুনতে ভাল লাগবে ?' – তুলতুলি প্রচণ্ড উত্তাপের সাথে কথাগুলি বলেছিল।

অনিমেষের মনে পড়েছিল সেই এক অনুপ্রেরণীয় বক্তার কথা, কোনও বড় কাজের নামার আগে সবথেকে যেটা প্রথমেই বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায় 'সবসে বড়া রোগ, কহেঙ্গে কেয়া লোগ', এই রোগটাকে না কাটাতে পারলে, কিছুই করা যাবে না।

এর পরের দিকের ঘটনাগুলি খুব সুখকর ছিল না। প্রায়শই ঝগড়া লেগে থাকত। দুই বাড়ি থেকেই প্রবল আপত্তি ছিল, অনেকে বলেছিল 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়!' কিন্তু অনিমেষ প্রতিজ্ঞা করেছিল সে যাবেই, বাকি জীবনটা সে বাসনমাজা নিয়ে থাকতে চায়। একথা শুনে সবাই হেসেছিল। আমেরিকার বন্ধুরাও প্রবল আপত্তি জানিয়েছিল। কেউ মেনে নিতে পারে নি। হ্যাঁ দেশে অনেকেই ফিরে যায়, একই প্রফেশনে থেকে আরও ভাল পদে চাকরি পেয়ে, ওদেশের অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও, কিন্তু বাসনমাজার কম্পানি বানানোর এই উদ্ভট পরিকল্পনা নিয়ে দেশে ফেরাটা কেউই ঠিক মেলাতে পারছিল না। সবাই ভেবে নিয়েছিল অনিমেষের মাথাটা পুরোটা না হলেও কিছুটা যে বিগড়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

সবার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও শেষমেশ অনিমেষেরই জিত হয়েছিল। তুলতুলি ওর সাথে অনেকদিন কথা বন্ধ করে দিয়েছিল। আমেরিকার বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে আসাটা একদমই সুখকর ছিল না তুলতুলির কাছে। অনিমেষেরও কি ভাল লেগেছিল ছাই! কিন্তু কী করবে বাসনমাজা তাকে এমনভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল যে সে সেটাকে নিয়ে কিছু একটা করবার জন্যই তো দেশে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে এখানে এসে নিজের পরিবার পরিজনকে কাছে পেয়ে তুলতুলি ধীরে ধীরে আবার শান্ত হয়ে গেছিল। সময় সবাইকে অদ্ভুতভাবে চুপ করিয়ে দেয়! ফিরে যাওয়াটা যখন ঠিকই হয়ে গেছিল, তখন তার শ্বশুড়মশাই মানে তুলতুলির বাবা অনেক সাহায্য করেছিল কম্পানি খোলার প্রাথমিক কাজকর্মের ব্যাপারে।

ছেলেটার এখানে এসে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হয়েছিল বটে, পরে সব ঠিক হয়ে গেছিল। সে উচ্চতর গবেষণার সুত্রে এখন আমেরিকাতেই থাকে। ওখানেই হয়ত স্থায়ীভাবে থাকবে, যদি না বাপের মত মাথায় বাসন মাজার বা অন্য কোনও ভূত চাপে। তুলতুলি প্রতিজ্ঞা করেছে, ছেলের বিয়ে দেবার আগে বউকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেবে যে বাসন যেন ছেলেকে দিয়ে না মাজায়। হয় বউ মাজবে, বউয়ের অসুবিধা থাকলে অন্য কোনও লোক রাখবে। অনিমেষ ও তুলতুলি মাঝে মাঝে ছেলেকে দেখে আসে আমেরিকাতে গিয়ে।

'স্যার, সব রেডি' – পঞ্চাননের ডাক দিল দরজা থেকে।

অনিমেষ মিটিং রুমে যাবার জন্য উঠে পড়ল। ওর অফিস এর পিছনেই একটা মোটামুটি বড় হলঘর মতো আছে। সেখানে অনেক চেয়ার পাতা আর তাদের সামনে একটা টেবিল ও চেয়ার, যেটাতে অনিমেষ বসে। বসে বসেই বক্তৃতা, কথাবার্তা ইত্যাদি চলতে থাকে।

অনিমেষ ঘরে প্রবেশ করতেই সকলে দাঁড়াল। 'বোসো, বোসো...' – অনিমেষ হাত তুলে সবাইকে বলল। সবাই আবার বসে পড়ল। কিছুক্ষণ একটু চুপচাপ...

'তোমরা কি তোমাদের ঘরেতেও বাসন মাজো ?' – অনিমেষ সবার উদ্দেশে বলল।

'হ্যাঁ, মাজি , স্যার' – অনেকেই বলল।

'বাহ! ...তা বাসন মাজাতে কোন ত্রুটি হলে তোমরা কি তোমাদের স্ত্রীয়ের কাছে কখনও বকা খেয়েছ বা তার রক্তচক্ষু দেখেছ ?' – অনিমেষ বলল।

'হ্যাঁ স্যার , মাঝে মাঝে বকা খাই, রক্তচক্ষুও দেখতে হয়' - বেশিরভাগ কর্মচারীই উত্তর দিল।

'বাহ খুব ভাল কথা, এটাকে একেবারেই খারাপ ভাবে নেবে না, এই রক্তচক্ষুই তোমাদের বর্তমান পেশাটাকে আরো উন্নতি করতে সাহায্য করবে...' – অনিমেষ আরও অনেক কিছু বলতে থাকে।

....

মিটিং শেষ হতে আজ একটু দেরিই হল। যাইহোক পঞ্চাননের সাথে আরও কিছু কাজের কথা সেরে অনিমেষ যাবার জন্য তৈরি হল। গাড়ি এসে গেছে। গাড়িতে উঠে বসল অনিমেষ।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে, মেন গেটের কাছাকাছি আসতেই দেখল, দ্বিতীয় খেপের একটা ট্রাক ঢুকছে, পিছনে বোঝাই করা নোংরা বাসন-কোসন। মালিকের গাড়ি চোখে পড়তেই ট্রাকচালক একটু জোরেই ব্রেক মারল বোধ হয়, সাথে সাথে ট্রাকটাতে একটা ঝাঁকুনি হল, একটা নোংরা বাসন ছিটকে বেরিয়ে পড়ে গেল পিছনের ডালা থেকে, ঝন ঝন আওয়াজ করতে করতে বাসনটা অনিমেষের গাড়ির দিকেই আসতে লাগল। কী আওয়াজ রে বাবা!...

বৃদ্ধ ফুটবল খেলোয়াড় যেমন মাঠে তরুণদের খেলা দেখলে পাদুটো নিশপিশ করে ওঠে, নোংরা বাসন দেখে এই বৃদ্ধ বয়সেও অনিমেষেরও হাতটা আবার নিশপিশ করে উঠল, নিজের অজান্তেই হাতটা ডান পকেটে চলে গেল বাসন মাজার স্ক্রাবারটা খুঁজতে...বাসন নিজে আর সে মাজে না আজকাল...তার প্রিয় জায়গা সিঙ্ক থেকে সে আজকাল দূরেই থাকে... একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অনিমেষ...যাইহোক বাসনটা গড়িয়ে গড়িয়ে তার গাড়ির একদম সামনে এসে স্থির হল, অনিমেষের গাড়িও ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে...কিন্তু আওয়াজটা তো থামছে না! কি ব্যাপার ? কানের কাছে ঝনঝনানির আওয়াজটা বেড়েই চলেছে...আরে! এই আওয়াজটা এবার অনেকটা তুলতুলির গলার মত শোনাচ্ছে কেন!...একটা ঠেলা অনুভব করল...কী ব্যাপার রে বাবা!...এবার পরিষ্কার কানের কাছে শুনতে পেল...

'কী গো, কী ভাবছ তখন থেকে বাইরের দিকে তাকিয়ে ? বাসনটা তাড়াতাড়ি মেজে আমাকে এবার উদ্ধার করো...সিঙ্কটা খালি করে আমাকে এবার কাজ করতে দাও, একটু পরেই লোক আসা শুরু হবে, অনেক কাজ পড়ে আছে এখনও...' - পরিষ্কার তুলতুলির গলা।

অনিমেষ এক ঝটকায় বাস্তবে ফিরে এল। এ কী! কোথায় তার সাধের কারখানা! কোথায় পঞ্চানন!...সে তো আমেরিকাতে তার বাড়ির রান্নাঘরের সিঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে! ডানহাতে সাবানজল সিক্ত নীল রঙের প্রিয় স্ক্রাবারটি ধরা...ট্যাপ থেকে টুপ টুপ করে জল পড়ে চলেছে।...আর সেও মোটেই সত্তর পার করা বৃদ্ধ না...চল্লিশ পার করা টগবগে যুবক...

'অ্যাঁ? অ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যাঁ...এই আর পাঁচ মিনিট' – অনিমেষ একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে উত্তর দিল।

'সেই কখন থেকে দেখছি , সামনের জানলার দিকে তাকিয়ে কী যে ভেবে চলেছ, তাড়াতাড়ি করো তো এবার...' – তুলতুলি অসহিষ্ণুভাবে বলে।

অনিমেষ বাসন মাজায় মন দিল। এতক্ষণ যেটা তার চোখের সামনে ভাসছিল, সেটা কী জীবন্ত ছিল! ভাবতেই পারছে না যে ও এটা এতক্ষণ ধরে কল্পনা করছিল! তার মনের মধ্যে আগে এরকম একটা চিন্তা ছিল না যে তা নয়, কিন্তু এত বিস্তারিত ভাবে কোনওদিন ভাবেনি ...কেমন একটু হতভম্ব হয়ে রইল, কল্পনার মায়াজালে যেটা সম্ভব ছিল, বাস্তবে কি এটা রূপায়িত করা যাবে? তুলতুলির সাথে একবার কথা বলবে ওর এই ভাবনাটা নিয়ে? ও কি মানবে?...যদিও না মানার সম্ভবনাটাই বেশি...তবুও বলতে দোষ কী? তাছাড়া কল্পনাতে ও নিজে যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, বাস্তবে কি সেভাবে পারবে? একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে মনটাকে দোদুল্যামান রেখে এবং বাসন মাজা শেষ করে সিঙ্কের কাছ থেকে তথা রান্নাঘর থেকে বের হল অনিমেষ।

অলংকরণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

ছোটগল্প

অলংকরণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

মধুসূদনদাদা

...মধুসূদনদাদা...

ফটিক অনেকবার ডাকল। কিন্তু বনের মধ্যে থেকে কেউ বেরিয়ে এল না। ফটিক তখন কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে সে বলল মধুসূদনদাদা তুমি একবার এসো, পণ্ডিতমশায় তোমায় দেখতে চান।

দূর থেকে মধুসূদনদাদার গলা শোনা গেল, "ফটিক তোমার সরল বিশ্বাস আর ভক্তিতে আমি তোমার কাছে যত সহজে যেতে পারি। পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে পারি না।"

আমতলার জঙ্গলে খেলতে খেলতে যখনই কোন বিপদ হবে, তখনই এক মনে মধুসূদনদাদাকে ডাকবি, তিনিই তোদের রক্ষা করবেন। বলেই লকাইয়ের মা দুহাত জোড় করে মাথায় একবার ঠেকিয়ে নিল। অন্যদিকে লকাইয়ের বাবা দরজা ঠেলে ঢুকল।

"শুনছ, আমতলার মাঠে বড় মন্দির হবে গো, রাখালরাজার" বলেই দুহাত জোড় করে মাথায় একবার ঠেকিয়ে নিল। "তাই কাল থেকে গাছকাটা শুরু হবে।"

"বাবা, তাহলে আমাদের খেলা?" "আরে খেলা কী রে, গ্রামে মন্দির হবে সবাই পুজো দিতে যাবে, সে কত পুন্যির কাজ বল দেখি?"

লকাই শুধু মৃদুকণ্ঠে বলল "ও।"

*****

আমগাছের সেই দোলনাটা দুদিকে অনেক দূর পর্যন্ত ঝুলছে। লকাই তাতে বসে দোল খাচ্ছে। আরও জোর, আরও জোর লকাই আমবাগানের গাছগুলোর মাথায় যেতে চায়। তাদের সাথে অনেক গল্প করতে চায়।

...হঠাৎ দোলনাটা ছিঁড়ে গেল, লকাই আছড়ে পড়ল মাটিতে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সে চেঁচিয়ে উঠল মধুসূদনদাদা...মধুসূদনদাদা...

আমগাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এক সুদর্শন রাখাল। লকাইকে মাটি থেকে তুলে তার গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিল। প্রচণ্ড বিস্ময়ে লকাই তাকে জিজ্ঞাসা করল "তুমি কে?" সেই রাখাল বলল "আমি তোমার মধুসূদনদাদা।" আবেগে লাফিয়ে লকাই বলে উঠল, "তুমি মধুসূদনদাদা, সত্যি। দ্যাখো না মধুসূদনদাদা দোলনাটা ছিঁড়ে গেল। এবার আমরা কী করে খেলব?"

মধুসূদনদাদা তাকে একপাশে দাঁড় করিয়ে সেই দোলনা বেঁধে দিল। তারপরে তাকে জোরে জোরে দোল দিতে লাগল।

"জানো মধুসূদনদাদা, বাবা বলছিল এই আমগাছ সব কেটে নাকি বড় মন্দির হবে। এতে নাকি খুব পুন্যি হবে। কিন্তু আমরা কেমন করে আর খেলব, তোমার সাথেই বা কেমন করে দেখা হবে?"

...লকু...লকু ওঠ বাবা দেখ কত বেলা হয়ে গেল। মায়ের ডাকে লকাইয়ের ঘুমখানা গেল ভেঙ্গে। "যাহ্‌ মধুসূদনদাদা ..."

বেলায় সে ছুটে গেল আমতলার মাঠে। সব গাছ এক এক করে কাটা শুরু হয়ে গেছে। সেই আমগাছটা লোকগুলো এত্ত বড় একটা করাত দিয়ে কাটছে। পাশে পড়ে আছে তাদের ছেঁড়া দোলনা। লকাইয়ের চোখ জলে ভরে এল। সে তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে সেই জল মুছে ফেলল। বাবা বলেছে মন্দির হলে পুন্যি হবে, কিন্তু সে কাঁদলে যদি পাপ হয়। তখন তো মধুসূদনদাদা আর আসবে না। তাই সে গুটিগুটি পায়ে বাড়ি ফিরে এল।

*****

দিন যায়, গাছ যত কাটা হতে থাকে আকাশে তত ঘন কালো মেঘ দানা বাঁধতে শুরু করে। কিন্তু বৃষ্টির দেখা নেই।

মাসান্তে মন্দিরের ইট গেঁথে তাতে প্লাস্টার ধারানো শুরু হয়ে গেল। এদিকে রাখালরাজার মূর্তি স্থাপনের শুভ তিথি আসন্ন।

কী হয় ? সবশেষে সর্বজনগৃহীত মতে তৃণশূন্য প্রান্তরে রাখালরাজাতলার (পূর্বে আমতলার জঙ্গল) রঙহীন, কাঁচা প্লাস্টারের মন্দিরে জাঁকজমক করে প্রতিষ্ঠিত হলেন রাখালরাজা। সবাই ঈশ্বরের বন্দনা করতে লাগলেন। এবার সবার মুক্তি ঘটবে।

হ্যাঁ, ঠিক তাই, মুক্তি ঘটল এত দিন ধরে আকাশে জমে থাকা কালো মেঘের। টানা এক সপ্তাহ ধরে চলল অবিরাম বৃষ্টি।

দুকুল ছাপিয়ে গেল মন্দিরের দুপাশের দিঘি। সারা গ্রাম জল থই থই। ধুয়ে গেছে মন্দিরের প্লাস্টার, জলের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে কঙ্কালসার রাখালরাজার মন্দির। লকাইয়ের মা বলে উঠল, "ও গো, আমাদের এ কী সব্বোনাশ হল গো। এ কোন রোষে পড়লাম। আমাদের এর থেকে কে রক্ষা করবে গো?"

লকাই মায়ের আঁচলে মুখ গুঁজে মৃদু স্বরে বলল "মা, গাছ তো এখন নেই, মধুসূদনদাদা কী করে আসবে?"

চিত্রকাহিনী

রঙ্গমঞ্চে শেষ পর্দা উত্তোলনে

শার্লক হোমস

বাংলা অনুবাদ - সন্তু বাগ ও অঙ্কিতা মাইতি

একজন ডাক্তার এবং আম্বুলেন্স আসছে, সার্জেন্ট! আপনার সঙ্গের ভদ্রলোক কি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ?
হলে তো ভালই হত ! ইনি হলেন বিখ্যাত ইংরেজ ডিটেকটিভ শার্লক হোমস !
ধন্যবাদ ফ্লাহেরতি! এখন চল কারাইনি -কে দেখা যাক !
আমার মনে হয় উনি মরে গেছেন! আত্মহত্যা! মনে হচ্ছে গ্যাস প্রয়োগ করেছিলেন !
আশ্চর্য ... গন্ধটা চেনা চেনা লাগছে
যাই ব্যবহার করুন না কেন গন্ধটা খুব বাজে !
এই ছোট শিশিটায় ছিল সেই জিনিসটা, যা কারাইনির মৃত্যুর জন্য দায়ী !
সায়ানাইড গ্যাসই মনে হচ্ছে ! ঘর খোলার পরেই গন্ধটা ছড়িয়ে পড়েছে !
ছড়িয়ে পড়ুক আর নাই পড়ুক, আপনার নাকের সামনে থেকে ওটা সরান! আপনার কিছু হয়ে গেলে আমি খুবই আঘাত পাবো !
আপনাকে আর গোয়েন্দাগিরি ফলাতে হবে না এখানে ! কারাইনি নিজেই তার জীবন শেষ করেছেন, হোমস !
আপনি কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন ?
এছাড়া আর কিবা হতে পারে? ঘরে কোন জানালা নেই আর কারাইনি দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন ভিতর থেকে! চাবি এখনো তালায় লাগান রয়েছে !
আমার এখনো এটাকে খুন বলেই মনে হচ্ছে সার্জেন্ট!
2

আজকাল জলশা তার জীবনের একটা বড় মুহূর্ত ... তার বিদায় আনুষ্ঠান! যদি তিনি আত্মহত্যাই করতে চাইবেন, তিনি অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত আপেক্ষা করতেন! না, ভদ্রমহোদয়গণ, এর পিছনে অন্য কিছু আছে
আমার রঙ্গমঞ্চে এর আগে কখনো খুন নিয়ে কুৎসা ছড়ায়নি, হোমস! আপনি এ ব্যাপারে নাক গলাবেন না ... পুলিশকে তাদের কাজ করতে দিন!
আমি আপনাকে অপছন্দ করতে শুরু করেছি, স্মল ... আর এটাই শেষে আমার কাজকে সহজ করে দেবে!
সার্জেন্ট ফ্লাহেরতি হতবুদ্ধি হয়েছিলেন, কিন্তু হোমসের প্রতি শ্রদ্ধায় সে কৌতুকপূর্ণ কথোপকথন চালিয়ে গেলো বিখ্যাত ডিটেকটিভের সাথে ...
এরপর কি করবেন স্যার ?
দেখা যাক। প্রথমে আমরা হোটেলে যাবো এবং আমার বেহালাটি নেব। তারপর আমরা এই শহরের সবচেয়ে সূক্ষন কাঁচের শিশি প্রস্তুতকারকের কাছে যাবো!
তারপর ...
আপনি নিশ্চয়ই জানেন আপনি করছেন। কিন্তু আমি কিছুই বুজতে পারছি না!
আমি নিজেই অন্ধের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছি!
খুব সূক্ষ্ণ কাচ ! আপনি বলছেন যে আপনার একটি ছোট কাচের শিশির প্রয়োজন যেটার মুখ আপনি নিজেই বন্ধ করবেন
একদম ঠিক বলেছেন! কাজটা করতে যত সময় লাগে আপনি নিন! আমরা অপেক্ষা করব!
তিন ঘন্টা পরে ....
সার্জেন্ট অস্থির হবেন না, আসল কাজ এবার শুরু হবে !
AMES CHEMICAL SUPPLY HOUSE
3

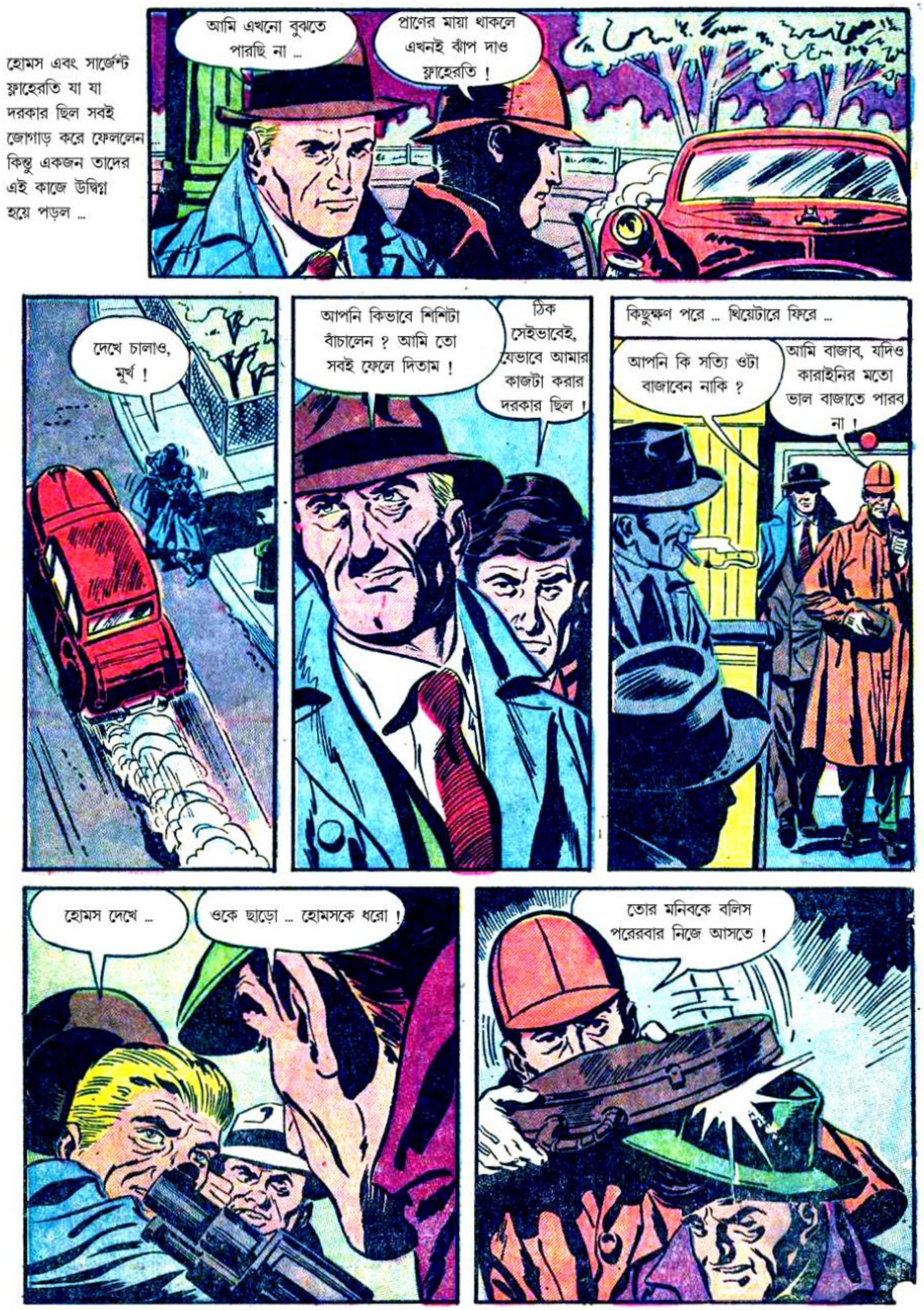
হোমস এবং সার্জেন্ট ফ্লাহেরতি যা যা দরকার ছিল সবই জোগাড় করে ফেললেন ... কিন্তু একজন তাদের এই কাজে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল ...
আমি এখনো বুঝতে পারছি না ...
প্রাণের মায়া থাকলে এখনই ঝাঁপ দাও ফ্লাহেরতি !
দেখে চালাও, মূর্খ !
আপনি কিভাবে শিশিটা বাঁচালেন ? আমি তো সবই ফেলে দিতাম !
ঠিক সেইভাবেই, যেভাবে আমার কাজটা করার দরকার ছিল !
কিছুক্ষণ পরে ... থিয়েটারে ফিরে ...
আপনি কি সত্যি ওটা বাজাবেন নাকি ?
আমি বাজাব, যদিও কারাইনির মতো ভাল বাজাতে পারব না !
হোমস দেখে ...
ওকে ছাড়ো ... হোমসকে ধরো !
তোর মনিবকে বলিস পরেরবার নিজে আসতে !

একটা হইচই শুনলাম মনে হলো । সব কিছু ঠিক আছে ?
না স্মল ... সব ঠিক আছে । আপনি কি আমাদের কারাইনির সাজঘরে নিয়ে যাবেন ?
আপনি কি বেহালা বাজান নাকি, হোমস ? এটা কি ধরনের মজা হচ্ছে ?
স্মল, আমি সন্দিহান আপনি যদি এটাকে হাস্যকর ভাবেন ! দেখছি ভাঙ্গা দরজাটা সারাই করে ফেলেছেন!
ফ্লাহেরতি তার অতিথির ব্যবহারে খুবই অস্থির হয়ে পড়লেন ...কিন্তু লাইম্যান স্মলের চোখে ভয়ের ছায়া দেখা গেলো ...
ঐ শিশিটা একই বেধের আগেরটার মতো । এখন আপনি যদি দরজাটা বন্ধ করেন, আমরা মিঃ কারাইনির মৃত্যুর সময়ের ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাবো।
খুবই সুন্দর আয়োজন! দেখুন হোমস, আমি একজন ব্যস্ত মানুষ। আপনার শিশুসুলভ কৌশল দেখার সময় আমার নেই !
হ্যাঁ, আপনি থাকবেন স্মল ! যতক্ষণ হোমস চাইবেন !
আমি চেষ্টা করব একই সুর বাজানোর, যেটা মিঃ কারাইনি তার মৃত্যুর সময়ে বাজাচ্ছিলেন । আশা করি একই ঘটনা ঘটবে !
এটা তো পাগলামি ! বন্ধ করুন ... এটা করে কি প্রমাণ করতে চাইছেন?
ঐ শিশিটা ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে সায়ানাইড গ্যাস ছড়িয়ে পড়েছিল, যখন কারাইনির বাজনার একটি বিশেষ সুর ঐ শিশির সাথে মিলে গিয়েছিল! ঐ শিশিটা একই রকম, একই রকম ভিতরের সায়ানাইডটাও।

ঐ শিশিতে সায়ানাইড ছিল ? তুমি কি পাগল হলে হোমস !
লাইম্যান স্মলের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হতে লাগল। শেষে আতঙ্ক যুক্তিকে পরাস্ত করল ...
ওটা কাঁপছে ... শীঘ্রই ওটা ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে !
বন্ধ করো! বন্ধ করো ... দয়া করো
দেখলেন স্মল? আমার পরীক্ষা সফল !
আমরা সবাই ইঁদুরের মত মরবো ! আমাকে বাইরে যেতে দাও।
তুমিই এটা করেছ, করোনি তুমি ? তুমিই শিশিটা এই ঘরে রেখেছিলে !
হাঁ, হাঁ । আমিই করেছি । আমি দোষ স্বীকার করব। আমি সায়ানাইডের গন্ধ পাচ্ছি।
তুমি যে গন্ধটা পাচ্ছো সেটা সায়ানাইড নয়, ঠিক সায়ানাইডের মতো গন্ধযুক্ত বাদাম তেল।
আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি স্যার ! আমি ভেবেছিলাম আপনি কিছুক্ষণের জন্য অন্যদিকে চলে যাচ্ছিলেন
ফ্লাহেরতি শুধু তোমাকে দেখাতে চেয়েছিলাম যে, মাঝে মাঝে বেহালা শুনতে যাবারও প্রয়োজন আছে !
সমাপ্ত

জীবন তৃষ্ণা

সঞ্জীব মিত্র

তৃষ্ণা,
তোমরা কি কেউ চেন এই তৃষ্ণাকে,
এ তৃষ্ণা কোনও নারী নয়,
এ তৃষ্ণা কোনও জড় নয়,
সকলে জানে তাকে বোঝে তাকে,
তবুও কেন তবে বঞ্চিত সে
কেন তাকে মরতে হয় মনের অন্ধকারে
আমরা নিজেদের বাস্তবিক ভাবি
তাই তো অন্যের তৃষ্ণাকে ভাবি নেশা
বলি লোকটা মাতাল ...... নেশাখোর,
বাস্তবে আমরা কি জানি
আমরা কি বুঝি আমাদের তৃষ্ণাকে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ও তো দমন করা যায়
কিন্তু এ তৃষ্ণা হল অদমনীয়,
মন জন্মানোর প্রথম দিনে
হয় এ ভূমিষ্ট তারপর ক্রমে ক্রমে
শিশু থেকে কৈশোর থেকে যৌবন থেকে বার্ধক্য
এর ব্যপ্তি।
এর মৃত্যু নেই,
এ খুঁজে নেয় এর নিজ বংশধর।
তোমরা কি চেনো এই তৃষ্ণাকে
এ আর কেউ নয় এ আমাদের জীবনতৃষ্ণা।।

দুটি কবিতা

চন্দ্রনীভ সরকার

চৈতালির কুকুর

চৈতালিদের বাড়িতে রোজ যেতাম
ঢোকামাত্রই ওদের কুকুরটা পায়ের কাছে এসে গরগর করত
একটু পরেই চৈতালি ড্রেসিং গাউন পরে বেরিয়ে এসে
আড়মোড়া ভাঙত।
আর চৈতালির বাবা লনে বসে কাগজ পড়তে পড়তে
একটা বল ছুঁড়ে দিয়ে বলতেন
"গো গেট ইট"
আর আমি যেহেতু বুঝতে পারতাম না কাকে বলা হচ্ছে
আমি আর টমি দুজনেই দুজনার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম।
কুকুরটাকে আমার একেবারেই সহ্য হত না।
চৈতালিকে বললাম
"দূর করে দাও ওকে"
ও বলল "ওকে আমি খুব ভালবাসি।"
আমি ভয় পেয়ে বললাম
"আমার থেকেও বেশি?"
চৈতালি হাই তুলল।
তারপর একদিন ওরা বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কোথায় যেন
চলে গেল।
যাওয়ার আগে টমিকে রেখে দিয়ে গেল।
একদিন দেখলাম ও ডাস্টবিন থেকে খাবার খাচ্ছে।
ওর সামনে দাঁড়িয়ে বললাম
"চৈতালি এটা করতে পারল?"
টমি বলল "ঘেউ!"
তারপর থেকে টমি আমার সঙ্গেই থাকে।

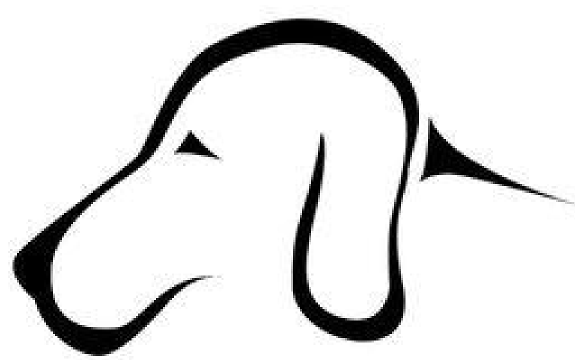

বন্ধুদের প্রেমিকারা

বন্ধুরা যখন তাদের প্রেমিকাদের কথা বলে,
তাদের মুখ হঠাৎই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।
তারা তাদের হাসি–রাগ-অভিমানের গল্প বলতে থাকে,
আর আমি একটা হিংসুটে লোককে দেখতে পাই।
মানুষটা আমার বন্ধুদের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়
কদর্য চিন্তা করে তাদের প্রেমিকাদের নিয়ে।
বন্ধুরা যখন তাদের প্রেমিকাদের দেওয়া উপহার দেখায়
সেই লোভী লোকটা চার অক্ষরের খিস্তি দেয় একটা।
আমার প্রিয় বন্ধুদের জীবনে এমন একটি উপগ্রহ,
লোকটিকে আমি সহ্য করতে পারি না।
আমার ভয় হয়
কোনওদিন যদি আমারও কোন প্রেমিকা থাকে
লোকটি তার সম্বন্ধেও এরকম কুৎসিত চিন্তা করবে?
আমার লোকটাকে খুন করে ফেলতে ইচ্ছা হয়।
তার বুকে আমি ছুরি বসাই।
তার হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ঝরতে থাকে।
হিংস্র চোখে সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।
আমি আয়না থেকে মুখটা সরিয়ে নিই।

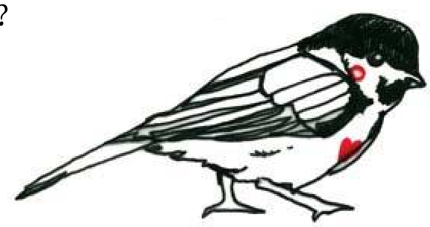

দীপাবলী

নবীন দাস

।। ১ ।।

আলোকমালায় সাজে আমাদের পুরনো দুনিয়া
অথচ অতীত আজ বিদ্রূপ ক'রে ফিরে ফিরে
এ কেমন সাজ বলো দুনিয়াদারীর চোখ বেঁধে
আমাদের বেঁচে থাকা মৃত্যুপূরক ব'লে ভাবি
আজ থাক শ্মশানের গল্প আরেক দিন হবে
আতসবাজির রাত কিরকম ঘোর লাগে চোখে
চারিদিকে আলো আর ভীষণ শব্দ খেলা চলে
আগুনের ছোঁয়া পেয়ে অতীতেরা খাঁটি হোক তবে
তোমরাও ঘরে এসো দেখে যাও আলোর দুনিয়া
নোন্‌তা দেয়ালে হাসে ইলেকট্রিকের মোমবাতি
সাজানো আগুনে যদি এতটুকু আঁচ লেগে থাকে
স্মৃতি নিয়ে পুড়ে যাবো কিছুটা তো ভালো হ'তে পারি

।। ২ ।।

মাটির দীপ দুয়ারে জ্বলে
উৎসবের রাত
ভিতর ঘরে অন্ধকার
কিছুতে সরে না
তবুও থাকি দুয়ার খুলে
আলপনাতে যখন মেয়ে
সাজায় তার বা'র
হাজার মোমবাতি জ্বলে ওঠে
পাপ নেইকো তবুও জানি

চাইতে গেলে ভয়
তার চে' ভালো অতীত নিয়ে
কুঁকড়ে পড়ে থাকি
সে তবু চায় নিষ্পলকে
পালিয়ে আসি দুয়ার থেকে
সমর্পনে সুখে থাকুক
ভালো থাকুক ভাবি
আর যা কিছু আমার হ'ল
মুঠোয় ভরা পাখি

জিভে জল

স্বাগতা ঘোষ

প্যানকেক:

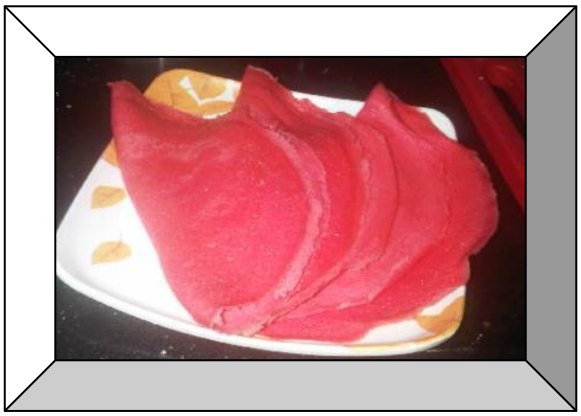

এক কাপ ময়দা, আধ কাপ চিনি, ১ চা-চামচ বেকিং পাউডার নিয়ে তার সাথে ৩ টে ডিম মিশিয়ে ভাল করে একটা ঘন গোলা বানাও। এবার ওতে ১/৩ কাপ দুধ মিশিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নাও।

একটা ননস্টিক ফ্রাইং প্যান গরম করে একটু মাখন দিয়ে প্যানটিতে ভাল করে মাখিয়ে নাও। আঁচ একটু কম করে এক বড় হাতা গোলা দিয়ে প্যানটিতে ভাল করে গোলাটি ছড়িয়ে নাও। একদিক হতে বেশি সময় নেবে না, এক-দেড় মিনিটেই হয়ে যাবার কথা। হয়ে গেলে অন্যদিকটিও হাল্কা করে ভেজে নাও। তৈরি হয়ে গেল প্যানকেক। এতে ফুড কালার মিশিয়ে নিলে দেখতে বেশ রঙিন হবে। প্যান কেক নোনতাও বানানো যায়। হাল্কা মিষ্টি প্যানকেক এমনি এমনিও খাওয়া যায়। নোনতা প্যানকেক সস্ দিয়ে খাওয়া যায়; বা হাল্কা সেদ্ধ সব্জি মেয়নিজ দিয়ে মেখে পুর ভরে জলখাবারে দেওয়া যায়; প্যানকেকের ভেতর পনির বা ডিমের ঝুরি দিয়েও খাওয়া যায়। আমি এখানে যে ছবিটা দিয়েছি, সেটা মিষ্টি গোলাপি প্যানকেকের। হাল্কা ডিনারের জন্য বেশ ভাল। ভাজতে বেশি তেল বা মাখনও লাগে না।

বেক্‌ড ফিশ উইথ পট্যাটো:

এই রেসিপিটি আমার স্বামীর কাছ থেকে শেখা। সময় পেলেই এটি উনি নিজেই বানান, জোগাড় আমি করে দিই।

যেকোনও কাঁটা কম মাছের একটু মোটা ফিলে নিয়ে ৩০ মিনিট সামান্য নুন ও লেবুর রসে ডুবিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। এবার একটা বড় ছাঁকনিতে মাছের ফিলেগুলি রেখে জল ঝরিয়ে নিতে হবে।

আলু সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে একটু খোলা জায়গায় রেখে গায়ের জলটা শুকিয়ে নিতে হবে। সেদ্ধ করা আলুর সাথে একটু মাখন, কোরানো চিজ, নুন ও সাদা মরিচের গুঁড়ো মোলায়েম করে মেখে নিতে হবে।

এবারে হোয়াইট সস্ বানাতে হবে - একটা সস্‌প্যানে ঢিমে আঁচে

১ টেবলচামচ মাখন গলিয়ে নাও। আঁচ বাড়াবে না, কম আঁচেই মাখনের মধ্যে ৩ টেবল চামচ ময়দা, ১/৪ চা-চামচ নুন, সামান্য সাদা মরিচের গুঁড়ো একসাথে ভাল করে মিশিয়ে নাও। খুব ভাল করে নাড়তে থাকো, যাতে কোন ডেলা না থাকে এবং ভালভাবে মাখনে সব মিশে যায়। এবারে এতে একটু একটু করে এক কাপ ফুল ফ্যাট দুধ দাও, আবার ভাল করে নাড়তে থাক - যতক্ষণ না গোলাটি সসের মতো ঘন হচ্ছে। ব্যবহার করার আগে ঠাণ্ডা করে নিয়ো। আমরা ঠাণ্ডা করে নেবার পর ১-২ টি ডিম ফেটিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ো।

এবার একটা বেকিংট্রেতে ভাল করে মাখন মাখিয়ে নাও। প্রথমে ১/২ ইঞ্চি মতো হোয়াইট সস্ দাও; এরপর, ১/২ ইঞ্চি মতো মাখা আলু সেদ্ধ দাও; এরপর আবার ১/২ ইঞ্চি মতো হোয়াইট সস্ দাও; এবারে এক পরত মাছ দাও; মাছ দেবার পর সামান্য নুন ও সাদা মরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দাও; এবার ১/২ ইঞ্চি মতো মাখা আলুসেদ্ধ দাও; সবশেষে কোরানো চিজ দিয়ে ওপরটা ভাল করে ঢেকে দাও। এবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় আভেন / কনভেকশন ১০ মিনিট প্রি হীট করে বেক করতে বসাও; বেক করবে সব থেকে কম উত্তাপে - ছোট ট্রে হলে ৩০ মিনিট, বড় ট্রে হলে ৫৫-৬৫ মিনিট লাগবে বেক্‌ড হতে। কিন্তু কখনোই উত্তাপ বাড়াবে না। হয়ে গেলে বুঝবে চিজের ওপর লালচে আস্তরণ পড়েছে। পাউরুটি, স্যুপ ও স্যালাডের সাথে এটি খেতে পারো।

ভেজিটেবল চপ :

শীতের সব্জি (বিট, গাজর, বিন্‌স) ও আলু খোসা ছাড়িয়ে কেটে কুকারে সেদ্ধ করে, জল ঝরিয়ে ভাল করে মেখে নাও। এবারে কড়াইতে একটু তেল গরম করে বেশি করে আদাবাটা দিয়ে কষে নাও, এরপর গরম মশলা গুঁড়ো একটু জল দিয়ে গুলে আবার ভাল করে কষে নাও, যতক্ষণ না কাঁচা মশলার গন্ধ চলে যাচ্ছে। এবারে সব্জি মাখাটা ওতে দাও, নুন, চিনি, কাঁচালঙ্কা কুচি, কড়াইশুঁটি, কুচোনো নারকেল, কিসমিস ও ভাজা চিনেবাদাম দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়তে থাক যাতে অতিরিক্ত জল শুকিয়ে যায়, কিন্তু পুড়ে না যায়। জল শুকিয়ে গেলে ওতে একটু কাঁচা ময়দা মেশাও, যাতে চপ বানাবার সুবিধে হয় — একটা আঁট ভাব আসবে। ময়দা দেবার পর ভাল করে নেড়ে ময়দাটা মিশিয়ে নেবে। তবে বেশি ময়দা দিয়ো না, যতটা দিলে ‘আঁট’ আসবে, ততটাই দিয়ো। এবারে পুর ঠাণ্ডা করে নাও।

একদিকে, ময়দা ও বেসন সমান পরিমাণে নিয়ে তাতে নুন, কালোজিরে ও হলুদ মিশিয়ে জল দিয়ে একটা পাতলা গোলা বানিয়ে নাও। এবারে পুর থেকে লুচির গোলার মতো একটু অংশ ছিঁড়ে নিয়ে লম্বাটে করে বা গোল করে চপের আকৃতিতে গড়ে ময়দা-বেসনের গোলায় ডুবিয়ে ব্রেড ক্রাম্ব মাখিয়ে নাও। এইভাবে ৩০ মিনিট রেখে দাও। এবারে ছাঁকা তেলে চপগুলি প্রথমে ১ মিনিট কড়া আঁচে, ও তারপর ৩-৪ মিনিট মাঝারি আঁচে দু'দিক ভেজে নাও।

চপ বানাবার সময় ময়দা-বেসনের গোলায় ডোবাবার আগে গোলাটা একবার ভাল করে নাড়িয়ে নিতে হবে, না হলে, ময়দা-বেসন-কালোজিরে গোলার নীচে থিতিয়ে যাবে।

রিচ প্লাম কেক :

চায়ের কাপের ১ কাপ ময়দা, চায়ের কাপের ১ কাপ খয়েরি চিনি (র‍্যা শুগার), ১ চা-চামচ (লেভেল্ড) বেকিং পাউডার, মাখন ১০০ গ্রাম (ঘরের স্বাভাবিক তাপমানে রাখা), ডিম ৩ টে (ঘরের স্বাভাবিক তাপমানে রাখা), টুটি-ফ্রুটি ১ চায়ের কাপ, বাদাম (আমন্ড-কাজু-আখরোট মেশানো) - ১ চায়ের কাপ, কিশমিশ (সালটানা ও সাধারণ কিশমিশ) - ১ চায়ের কাপ, কেকের মশলা (আদা ছাঁচা বা আদার রস - ২ চা-চামচ, শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করা দালচিনি - ১/২ চা-চামচ, শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করা জায়ফল - ১/২ চা-চামচ, শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করা জয়িত্রি - ১/২ চা-চামচ)।

কেক বানাবার আগে, সমস্ত উপকরণ ঘরের স্বাভাবিক তাপমানে থাকা প্রয়োজন। আভেন ২০-৩০ মিনিটের জন্য মধ্যম তাপমাত্রায় (২০০-২২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) গরম (প্রি হিট) করতে হবে। সমস্ত ড্রাই ফ্রুটস ও টুটি-ফ্রুটিতে ভাল করে ময়দা মাখিয়ে নিতে হবে।

ময়দা ও বেকিং পাউডার চালুনি বা ছাঁকনিতে ছেঁকে একটা বড় পাত্রে রাখতে হবে, এর সাথে ডিমের কুসুম, চিনি, মাখন, কেকের মশলা সব ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। ডিমের সাদা আলাদা করে ফেটিয়ে নিতে হবে যতক্ষণ না শক্ত হয়ে যায়। এবার ডিমের সাদা ও বাকি মিশ্রণ কাট অ্যান্ড ফোল্ড মেথডে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর ড্রাই ফ্রুটস ও টুটি-ফ্রুটি দিয়ে আরেকবার ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। মিশ্রণ বেশ হালকা ও ফাঁপানো থাকবে।

এবার একটা আভেন প্রুফ পাত্রে ভাল করে মাখন মাখিয়ে এই কেকের ব্যাটারটা ঢালতে হবে। পাত্রটি বেশ বড় হওয়া দরকার, ব্যাটার পাত্রের অর্ধেকের থেকে বেশি যেন না হয়। এবার ব্যাটারশুদ্ধ পাত্রটি কনভেকশন আভেনে একটু উঁচু (মধ্যম উচ্চতার) র‍্যাকে বসাও; ট্র্যাডিশনাল আভেনে মিডিয়াম র‍্যাকের মাঝখানে বসাও। এক আভেনের তাপমাত্রা, আরেক আভেনের তাপমাত্রার থেকে একটু কমবেশি হতে পারে - মোটামুটি ১৮০-২০০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টার জন্য বেক করো। বেকিংয়ের সময় বারবার আভেন খুলবে না বা কেক বাইরে বের করবে না। কেক তৈরি হয়েছে কি না বোঝার জন্য কেকের মাঝখানে একটা পাতলা সরু ছুরি বা কাঠি একেবারে কেকের উপর থেকে নীচ অবধি বিঁধিয়ে নিয়ে বের করে আনলে যদি দেখা যায় যে কাঠিটি পরিষ্কার, কিছু লাগেনি, তার মানে কেক তৈরী। বেকিং ভাল হয়েছে কি না জানার আরেকটি উপায় হল — বেকিংয়ের সময় কেকের মাঝখানটা ফুলে উঠবে, কিন্তু ফাটবে না।

কেক তৈরি হয়ে গেলে বাইরে এনে ৫-৭ মিনিট রেখে ঠাণ্ডা করে নাও। বেকিং পাত্র থেকে কেক বের করে আরও ৫ মিনিট কেকটা উলটো করে রাখো (কেকের তলার দিক ওপরে থাকবে), যাতে কেকটা ভাল ভাবে ঠাণ্ডা হয়ে

যায়। এবার একটা ক্লিং ফিল্ম মুড়ে কেকটা রেখে দাও। এই কেক পরের দিন খেতে ভাল লাগে। রিচ প্লাম কেকে ডেকরেশনের প্রয়োজন নেই।

মুর্গ মালাই কাবাব :

১-১/২ কে.জি বোনলেস চিকেনের থেকে কাবাবের মতো টুকরো কেটে নাও। এবার এতে ১ চায়ের কাপ কোরানো চিজ, ১/২ চায়ের কাপ ক্রিম, ১ টেবল চামচ জল ঝরানো টকদই, ১ টেবল চামচ সাদা মরিচের গুঁড়ো, ১ চা চামচ কাঁচালঙ্কা কুচি, ১ টেবল চামচ ছোট এলাচের গুঁড়ো, ১ চা চামচ ধনেপাতা কুচি, ১ টেবল চামচ সাদা তেল, ১ চা চামচ আদা-রসুন বাটা, স্বাদ মতো নুন ও সামান্য চিনি দিয়ে মেখে ১২-১৫ ঘন্টা ফ্রিজে ম্যারিনেট করতে হবে। ম্যারিনেট করার পর, কাবাবগুলি বের করে নিয়ে শিকে গেঁথে ১০-১২ মিনিট ধরে বার্বিকিউতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারপাশ ভাল করে ঝলসে নিতে হবে। গ্রিল করলে এক-এক দিক ৭-৮ মিনিট মতো রাখতে হবে। চিকেন ঝলসে নেবার সময় মাঝে মাঝে ঘি বা মাখন ব্রাশ করে নিতে হবে, যাতে শুকিয়ে না যায়। কাবাব তৈরি হয়ে গেলে ফয়েলে মুড়ে রেখে দাও, এতে কাবাব রসালো থাকবে।

ছবিঃ স্বাগতা ঘোষ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও কেশব কাশ্মীরি ভট্টজির তথাকথিত তর্কযুদ্ধ

রাম শঙ্কর ভট্টাচার্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও কেশব কাশ্মীরি ভট্টজির তথাকথিত তর্কযুদ্ধ নিয়ে সন্দেহ বেশ কিছুকাল ধরেই ছিল। এর আগে এই বিষয়ে মহাপ্রভুর ওপর কোন বাঙালি গবেষকের কোনও প্রচেষ্টা আমার চোখে পড়েনি।

বহুকাল আগেই প্রবন্ধটি খাপছাড়া ভাবে একটি খাতায় লেখা ছিল। এখন লেখাটি সম্পূর্ণ করার সময় আন্তর্জাল ঘেঁটে দেখি মাত্র এক জায়গায় এই বিষয়ে একটি উল্লেখ পাওয়া যায়। এক ভদ্রমহিলা ওঁর থিসিস পেপারে এই ঘটনাটির সঙ্গে শ্রী কেশব কাশ্মীরি ভট্টর নাকি কোনও সম্পর্ক নেই লিখেছেন। ওই গবেষণাপত্রটি আমি বহু খুঁজেও জোগাড় করতে পারিনি।

যুগাবতার যুগস্রষ্টা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। বাঙালিই বলব যদিও ওনার পিতামহকে আধুনিক পরিভাষায় ওড়িয়া বলা যেতে পারে কারণ ওঁর আদিবাড়ি জাজপুরে। ওই সময় বাঙালি আর ওড়িয়াদের ভাষার মধ্যে বিশেষ কোনও প্রভেদ ছিল না।

মহাপ্রভুর জীবনের বেশ কিছু অংশ আমরা মোটামুটি ঠিকঠাক পাই। তবে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীকারদের বইয়ে বহু ফাঁকফোকর, অসঙ্গতি আছে। এই কারণে নানান ধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। মহাপ্রভুর অন্তর্ধান এক বিরাট প্রহেলিকা।

এখানে আমরা মহাপ্রভুর জীবনের একটি বহুল প্রচারিত আখ্যান আলোচনা করব।

চৈতন্যদেব অনুগামী বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রচলিত আছে দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিত কেশব কাশ্মীরি ভট্ট নবদ্বীপে এসেছিলেন। তর্কযুদ্ধে তিনি নিমাই পণ্ডিতের কাছে হেরে যান। এই ঘটনাটির উল্লেখ আমরা পাই

১। বৃন্দাবন দাস রচিত “শ্রীচৈতন্যভাগবত”।

গ্রন্থটি আনুমানিক ১৫৪০-৫০ খ্রিস্টাব্দে রচিত।

২। নরহরি চক্রবর্তী রচিত “ভক্তি রত্নাকর”।

গ্রন্থটির রচনা আনুমানিক ১৭৫০-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে, অর্থাৎ ২৬৫- ২৭৫ বছর পরে।

৩। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত “শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত”।

গ্রন্থটির রচনা আনুমানিক ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে।

শ্রীমদ কেশব কাশ্মীরি ভট্ট আনুমানিক ১০৬১ খ্রিস্টাব্দে তৈলক দেশের বৈদুর্যপত্তন নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অন্য একটি সূত্রে পাই ১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দ। (১)

কেশব ভট্ট নিম্বার্কাচার্যের অধস্তন পুরুষ শ্রী গাঙ্গল ভট্টের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কেশব ভট্ট বহু কাল কাশ্মীরে ছিলেন। এই কারণে উনি শ্রী কেশব কাশ্মীরি ভট্ট নামে পরিচিত হন। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে সরস্বতীর বরপুত্র বলা হত।

নিম্বার্কাচার্যের ৫৩ তম অধস্তন পুরুষ ধনঞ্জয় দাসজি কাঠিয়া বাবাজি মহারাজ রচিত "শ্রী নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্যগণ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী" বইয়ে আছে কেশব কাশ্মীরি ভট্টকে কৃতজ্ঞতা জানাতে ব্রজবাসীরা **১১৬১** খ্রিস্টাব্দে একটি পাট্টা লিখে দিয়েছিলেন। কারণ তিনি মথুরাবাসীদের মুসলমানদের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়েছিলেন। ওই সময় কেশব কাশ্মীরি ভট্টজীর বয়স একশ' ছিল। সেই পাট্টাটি সালেমাবাদে শ্রী নিম্বার্ক পীঠে (Nimbark Peeth Salemabad) এখনও আছে।

১৫২১ খ্রিস্টাব্দে নিম্বার্কাচার্যের ৩৬ তম অধস্তন পুরুষ শ্রী চতুর চিন্তামণি দৈবাচার্য (নাগা)জির সঙ্গে বল্লভাচার্যের (১৪২১) দেখা হয়েছিল। (সূত্র - বল্লভাচার্যের নাতি গোকুলনাথ রচিত "বনযাত্রা বৈঠকন কে চরিত"।)

সুতরাং মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন শ্রী চতুর চিন্তামণি নাগাজি মহারাজ, কোনওমতেই কেশব কাশ্মীরি ভট্ট নয়। এর কারণ মহাপ্রভুর সঙ্গে কেশব কাশ্মীরি ভট্টজির দেখা হলে তাঁর বয়স আনুমানিক ৪২৫ মত হওয়া উচিত!

কোনও কোনও সূত্রে দেখা যায় কেশব কাশ্মীরি ভট্টজি মহাপ্রভুর একশ বছর আগে বর্তমান ছিলেন।

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত শ্লোক এবং শ্লোকার্থের জন্য শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ প্রকাশিত সংস্করণ ব্যবহার করেছি। আমার মতে এটি বিশুদ্ধ সংস্করণ।

প্রথম সমস্যা

ঘটনাটির আনুমানিক ৫০ বছর পর "শ্রীচৈতন্যভাগবত" গ্রন্থে বৃন্দাবন দাস কোন শ্লোকের উদ্ধৃতি দিতে পারেননি বা এই দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিতের নাম উল্লেখ করেন নি। কিন্তু জানিয়েছেন শ্লোকটির তিন স্থানে দোষ।

ব্যাখ্যা করিলেই মাত্র প্রভু সেইক্ষণে।

দূষিলেন আদি-মধ্য-অন্ত তিন স্থানে।। (১/১৩/৯৩)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদিলীলা-ষোড়শ পরিচ্ছেদ)" গ্রন্থে ঘটনাটির আনুমানিক ১৯০ বছর পর নির্দিষ্ট শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন। কী ভাবে তিনি শ্লোকটি উদ্ধার করেছিলেন সেটি অজ্ঞাত। তিনিও এই মহাপণ্ডিতের নাম উল্লেখ করেন নি।

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং

যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্বরণ কমলোৎপত্তিসুভাগা।

দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরির সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা

[পাঠান্তর-সুরনরৈরর্চদ্রচরণা-শ্রী অমিয় নিমাই চরিত]

ভবানী ভর্ত্তুর্জা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা।।

অর্থ — এই গঙ্গাদেবীর মহত্ত্ব সর্বদা দেদীপ্যমান, যেহেতু ইনি অতি সৌভাগ্যবতী। ইনি শ্রীবিষ্ণু-চরণ কমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, আর ইনি লক্ষ্মীদেবীর দ্বিতীয় স্বরূপের ন্যায় সুর-নরগণ দ্বারা অর্চিত চরণ হইয়াছেন। ইনি অদ্ভুতগুণবতী, ভবানীস্বামী মহাদেবের উপর প্রভাবপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্লোকের দোষ বিচারের বর্ণনায় লিখেছেন

পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার।

ক্রমে আমি কহি, শুন, করহ বিচার।।

বৃন্দাবন দাস বলছেন শ্লোকটিতে তিনটি দোষ ছিল, কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ পাঁচটি অলঙ্কার দোষ দেখিয়ে দিয়েছেন।

সেগুলি হল দু'জায়গায় অবিমৃষ্য/অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ এক জায়গায় বিরুদ্ধমতি এবং দু'জায়গায় ভগ্নক্রম দোষ।

গঙ্গার মহত্ত্ববর্ণনা শ্লোকটির মূল "বিধেয়" কিন্তু তার অনুবাদ 'ইদম্' শব্দ পরে দেওয়ায় অর্থ অপরিষ্কার।

দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মী-এই সমাসবদ্ধ পদেও একই দোষ। 'দ্বিতীয়' শব্দটি "বিধেয়"। সমাসের মধ্যে "শ্রী" শব্দটির জন্য অর্থ অস্পষ্ট।

এই দুটি অবিমৃষ্য/অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ।

ভবানী ভর্ত্তা – দেবাদিদেব শিবকে বলা হয় ভব। ভবের স্ত্রী ভবানী। অতএব ভবানী শিবপত্নী। তাঁর স্বামী আছে। ভর্ত্তার অর্থ স্বামী। ভবানী ভর্ত্তার অর্থ দাঁড়ায় শিবপত্নীর স্বামী। সোজা ভাষায় শিবপত্নীর আর এক স্বামী অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামী বোঝায়।

ব্রাহ্মণপত্নীভর্ত্তা লিখলে একই অর্থ দাঁড়াবে।

এখানে স্বামী শব্দটির দুবার বলার প্রয়োজন ছিল না। দুবার বলায় দ্বিবিরুক্তি দোষ ঘটায় অর্থ পালটে গেছে।

এটি বিরুদ্ধমতি দোষ।

বিভবতী ক্রিয়া হওয়ায় বাক্য এখানে শেষ হওয়া উচিত। অদ্ভুতগুণা বিশেষণ প্রয়োগ করায় ভগ্নক্রম দোষ বা পুনরাত্ত দোষ হয়েছে।

প্রথম পাদে 'ত', তৃতীয় পাদে 'র', চতুর্থ পাদে 'ভ' এর অনুপ্রাস আছে। কিন্তু দ্বিতীয় পাদে সেই রকম কিছু নেই। এটি ভগ্নক্রম দোষ।

দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীর ভাগ্যবন্ত।

ডুবিলেন যে সুখে কহিতে নাই অন্ত।।

নিমাই-র স্থানে দিগ্বিজয়ী পরাজয়।

সর্বত্র বিদিত লোক এ যশ ঘোষয়।। (ভক্তি রত্নাকর ২২৭৭/১২)

দ্বিতীয় সমস্যা ঘটনাটির কাল নির্ণয়।

শ্রীচৈতন্যভাগবত অনুসারে বল্লভাচার্যের মেয়ে লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে বিয়ের পর নিমাই পণ্ডিতের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য নবদ্বীপ অতি বিখ্যাত। সেই সময়ে মহাপণ্ডিতের আগমন।

হেনকালে তথা এক মহা-দিগ্বিজয়ী।

আইল পরম-অহঙ্কার-যুক্ত হই।। (১/১৩/১৯)

এদিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে লিখছেন

তবে বিষ্ণুপ্রিয়া-ঠাকুরানীর পরিণয়।

তবে ত' করিল প্রভু দিগ্বিজয়ী জয়।। (১/১৬)

তিনি কাল নির্ণয় করেছেন নিমাই পণ্ডিতের প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর সর্পাঘাতে মৃত্যুর পর রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রর মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বিয়ের পরবর্তী সময়কে।

নরহরি চক্রবর্তী কিন্তু বৃন্দাবন দাসকে অনুসরণ করেছেন।

তৃতীয় সমস্যা

শ্রী মুরারী গুপ্ত মহাপ্রভুর জীবনের ছোটবেলা থেকে প্রহেলিকাময় অন্তিমকাল বা অন্তর্ধান রহস্য পর্যন্ত লীলা প্রত্যক্ষ করে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্" গ্রন্থ লিখলেন। কেন তিনি এই বহুল বিজ্ঞাপিত ঘটনাটির বিন্দুবিসর্গ উল্লেখ করলেন না?

মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের ৪৫ বছর পর কবি কর্ণপুর রচিত "চৈতন্য চন্দ্রোদয়" নাটকেও ঘটনাটির উল্লেখ নেই।

ঘটনাটি সম্পর্কে নীরব চৈতন্যপার্ষদ নরহরি দাস শিষ্য জীবনীকার লোচন দাস, জয়ানন্দ প্রমুখ ভক্তগণ।

চতুর্থ সমস্যা

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত দেবী সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন। মহাপ্রভুর কাছে পরাজিত হওয়ার পর দেবী সরস্বতী স্বপ্নে তাঁকে মহাপ্রভুর প্রকৃত স্বরূপ জানিয়ে দেন। দেবী সরস্বতী তাঁকে এই বার্তা গোপন রাখতে বলেছিলেন এবং আজ্ঞা পালনে ব্যর্থ হলে ভয়ঙ্কর পরিণাম জানিয়ে দেন।

যে কিছু তোমারে কহিলেন সরস্বতী।
সে সকল কিছু না কহিবে কাঁহা – প্রতি।।
বেদগুহ্য কহিলে হয় পরমায়ু-ক্ষয়।
পরলোকে তার মন্দ জানিহ নিশ্চয়।। (শ্রীচৈতন্যভাগবত ১/১৩/১৮৪)

বৃন্দাবন দাস এই দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিতের নাম উল্লেখ করতে পারেননি কিন্তু অতি গোপন স্বপ্নের বিষয়বস্তু তিনি লিখেছেন। কী ভাবে তিনি এই ব্যাপারটি জানলেন ?

পঞ্চম সমস্যা

"ভক্তি রত্নাকর" গ্রন্থ থেকে বর্ণনা পাই দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিত রাজকীয়ভাবে নবদ্বীপ এসেছিলেন।

সরস্বতী দেবী বক্তা তাহার জিহ্বায়।
সর্বত্র করিয়া জয় আইল নদীয়ায়।।
বিদ্যাবলে দিগ্বিজয়ী কাহুকে না গণে।
হস্তী, অশ্ব দোলা বহু লোক তার সনে। (ভক্তি রত্নাকর ২২৪৩/১২)

বৃন্দাবন দাস "শ্রীচৈতন্যভাগবত" গ্রন্থে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের হেরে যাওয়ার পর নবদ্বীপ ত্যাগ করার বর্ণনা দিচ্ছেন

হস্তী, ঘোড়া, দোলা, ধন, যতেক সম্ভার।
পাত্রসাৎ করিয়া সর্বস্য আপনার।।
চলিলেন দিগ্বিজয়ী হইয়া অসঙ্গ।
হেনমত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রঙ্গ।। (শ্রীচৈতন্যভাগবত ১/১৩/১৮৯-১৯০)

নরহরি চক্রবর্তী রচিত "ভক্তি রত্নাকর" গ্রন্থে পাই

অতি শুভক্ষণে নবদ্বীপেতে আইলা।

সর্বত্যাগ করি প্রভু আজ্ঞায় চলিলা।। (ভক্তি রত্নাকর ২২৭৪/১২)

ওই সময়ের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পরাজিত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সঙ্গে থাকা ধন-সম্পত্তি মহাপ্রভুর অধিকারে আসত। মহাপ্রভুর কোনও জীবনীকারদের বইয়ে উল্লেখ নেই যে মহাপ্রভু ধনী ছিলেন বা পরাজিত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের ধন-সম্পত্তি গ্রহণ করে ধনী হয়েছিলেন।

শেষে বলা যেতে পারে

১। মহাপ্রভুর সঙ্গে কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের তর্কযুদ্ধ হয়ে থাকলে তিনি কোন মতেই কেশব কাশ্মীরি ভট্ট হতে পারেন না।

২। কৃষ্ণদাস কবিরাজ উল্লেখিত শ্লোকটি সন্দেহের ঊর্দ্ধে নয়।

(১) Blackwell Companion to Hinduism by Gerard Colas, edited by G. Flood p 253.

There is no historical proof that Nimbārka and the first 28 preceptors of this tradition settled in Braj in and around Mathura before the end of the fifteenth century. Keśava Kāśmirī Bhaṭṭa (born in 1479), the 29th ācārya, is the first whose historical association with the Braj area is certain. His direction is marked by the revival of the Nimbārka tradition and the propagation of its teachings all (p 254) over India. He composed doctrinal texts, devotional hymns, and an elaborate ritual treatise the Kramadīpikā, which influenced Caitanyaite authors. His successor, Śrī Bhaṭṭa, is the first ācārya of the Nimbārka school known to have written in Braj bhaāṣā, the vernacular of the Braj region. His Yugalaśataka describes the divine loving couple of Kṛṣṇa and Rādhā, a theme which became increasingly popular also among several other Vaisṇava traditions from the sixteenth century onwards (Clémentin-Ojha 1990: 333–8, 374).

Śrī Bhaṭṭa's disciple, Harivyāsadevācārya (probably sixteenth century), who wrote in Braj bhaāṣā as well as in Sanskrit, had a strong influence on the organization and theology of Nimbaārka's tradition. This tradition developed into 12 branches based in 12 monasteries. A number of subdivisions later arose, progressively weakening its cohesiveness. While in its early stages, the Nimbaārka tradition stressed the ascetic values, however initiating lay members into its fold. Under Harivyāsadevācārya, lay members received the right of initiating others and transmitting this right to their male descendants. These householder preceptors were later called gosvāmīs and the wealth which they accumulated significantly contributed to the developement of the tradition (Clémentin-Ojha 1990: 346–8).

প্রবন্ধ

নস্ট্রাডামুসের ভবিষ্যদ্‌বাণী

দীপক মন্ডল

সবচেয়ে সফল ও বিখ্যাত ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন নস্ট্রাডামুস বা মিকেল দে নস্ট্রাদাম (ফরাসি: Nostradamus বা Michel de Nostredame)। তিনি ছিলেন একজন ফরাসি ভবিষ্যদ্‌বক্তা, জ্যোতিষী, লেখক এবং ঔষধ প্রস্তুতকারক ও চিকিৎসা সামগ্রী বিক্রেতা। তিনি ১৫০৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর ফরাসি শহর প্রভেঞ্চে এক ইহুদি বংশে জন্ম গ্রহন করেছিলেন। ১৫১২ খ্রিষ্টাব্দে তাকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। ১৫২৫ সালে তিনি মন্ট পেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক হন। তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন, তাই কোনও বিষয় রপ্ত করতে তাঁর বেশি সময় লাগত না। পড়াশোনার বাইরেও অন্যান্য অনেক বিষয়েই তাঁর আগাথ পান্ডিত্য ছিল। শোনা যায় তিনি প্লেগ রোগের কবল থেকে অনেককে বাঁচিয়ে ছিলেন।

১৫৪৭ সাল থেকে তিনি ভবিষ্যৎ দর্শন শুরু করেন। মনে করা হয় তিনি ভবিষ্যৎ দর্শনের প্রথম প্রেরণা পেয়েছিলেন কোনও সুপ্রাচীন ইহুদি পুথি থেকে। তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করে গেছেন কীভাবে তিনি সরাসরি ভবিষ্যতের ঘটনার ভেতরে পৌছে যেতে পারতেন।

নিশীথে গোপন কক্ষে বসেছিনু একা,
পিতল ত্রিপদে মোর মন ছিল বাঁধা।
সহসা এক জ্যোতি প্রস্ফুরিল সম্মুখে,
আগামী দিনের কথা উচ্চারিল মোর মনে।

অতিন্দ্রীয় এক ক্ষমতার সাহায্যে অনুভব করতে পারতেন কোনও দূর ভবিষ্যতের স্থান, কাল ও চারপাশের নানা ঘটনার। ভবিষ্যদ্‌বাণী করার জন্য তাঁর পদ্ধতি ছিল খুব সাধারণ। গভীর রাতে তার নির্জন পড়ার ঘরে টেবিলের ওপর একটি মোমবাতি জ্বালাতেন। টেবিলের ওপর রাখতেন ছোট্ট একটি পেতলের জলভরা পাত্র তাতে ডুবে থাকত একটি ত্রিশাখা বিশিষ্ট দণ্ড। তিনি প্রতিটি ভবিষ্যতের দৃশ্যকে আহ্বান করতেন। জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যখন ভেসে উঠত ভবিষ্যতের ঘটনাগুলো তখন তিনি চার পঙ্‌ক্তির কবিতা আকারে সেগুলি প্রকাশ করতেন।

১৫৫০ সাল নাগাদ তিনি প্রথম পরবর্তী বছরের পঞ্জিকা প্রকাশ করেন এবং সেই বছরের জন্য কিছু ভবিষ্যদ্‌বাণী সেই পঞ্জিকাতে লিপিবদ্ধ করেন। পরের বছরে সেই ভবিষ্যত বাণী মিলে যাবার পর থেকে নিয়মিত ভাবে এই পঞ্জিকা তিনি প্রকাশ করা শুরু করেন। অনুমান করা হয় যে এই সময় থেকেই তিনি তার 'সেঞ্চুরিস' লেখা আরম্ভ করেন। 'সেঞ্চুরিস' মানে একশটি করে চার লাইনের কবিতা, এমন দশটি খন্ড অক্ষত পাওয়া গেছে (৭ম খণ্ডে অবশ্য ৪২টা কবিতা আছে)। চতুস্পদী কবিতাগুলিতে তিনি হেঁয়ালিকৃতভাবে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে গেছেন পরবর্তী এক হাজার বছরে পৃথিবীতে বড় কী কী ঘটনা ঘটতে চলেছে। যা অতীত থেকে বর্তমান এমনকি হিটলার, কেনেডি, সাদ্দাম হোসেন, আমেরিকার টুইন টাওয়ারের হামলা সহ আরো অনেক বিখ্যাত ঘটনার সঙ্গে মিলে যায়।

একেবারে সাদামাটা ভাষায় কিন্তু লেখেননি নস্ট্রাডামুস। ভবিষ্যতের কথা বলতেও আশ্রয় নিয়েছেন অনেক রসিকতার। শুধু তাই নয়, ব্যবহার করেছেন অনেক রূপক শব্দ আর তাই তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলি নিয়ে বিশ্লেষণ চলছে এখনও। কারও কারও বিশ্বাস পুরোপুরি অর্থোদ্ধার সম্ভব হলে সতর্কবার্তা পাওয়া যেতে পারে ভবিষ্যতের আগাম কিছু ঘটনার। এই সব কারণেই নস্ট্রাডামুস সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল এখন আকাশ সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তারই ফলস্বরূপ সত্য মিথ্যা অনেক গালগল্পও নস্ট্রাডামুস সম্পর্কে শুনতে পাওয়া।

কথিত আছে একবার তিনি ইটালি ভ্রমণকালে কোনো এক চার্চে তাঁর সঙ্গে এক পাদরি ফাদারের দেখা হয়। নস্ট্রাদামুস ফাদারকে দেখে 'হিজ্ হোলিনেস' বলে সম্বোধন করেন! তার সঙ্গী সাথিরাও এই সম্বোধনের কোনও সন্তোষজনক ব্যখ্যা খুঁজে পায়নি। কারণ এমন সম্বোধন শুধুমাত্র পোপ বা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যক্তিকেই করা হত। কিন্তু সেই ঘটনার বেশ কিছু বছর পর ১৫৮৫ সালে ঐ পাদরি পোপ পঞ্চম সিক্টার হিসাবে নির্বাচিত হন। যা ঘটেছিল নস্ট্রাডামুসের মৃত্যুর অনেক বছর পরে।

আরও একটি বিখ্যাত গল্প হল একটি কালো এবং একটি সাদা শূকরছানাকে নিয়ে। একদিন নস্ট্রাডামুস বন্ধুস্থানীয় এক জমিদারবাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। সেখানে দুটি শূকরছানা ঘোরাঘুরি করছিল। এমন সময় বাড়ির মালিক একটু রসিকতার স্বরেই নস্ট্রাডামুসকে ঐ শূকরছানা দুটির ভবিষ্যৎ বলতে অনুরোধ করলেন। নস্ট্রাডামুস তৎক্ষণাৎ জানালেন কালোটিকে আমরা খাব আর সাদাটি যাবে নেকড়ের পেটে। এমন কথা শোনার পর, নস্ট্রাডামুসকে মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্য জমিদারমশাই রাঁধুনিকে ডেকে হুকুম করলেন সাদা শুকর ছানাটিকে রোষ্ট করে দুপুরের খাবারে পরিবেশন করার জন্য। কালোটিকে আলাদা করে রাখতেও বললেন। লাঞ্চের পর খুব কৌতূহল বশত গৃহকর্তা পুনরায় নস্ট্রাডামুসকে ঐ শূকরছানা দুটির কথা জানতে চাইলেন। এবারো নস্ট্রাডামুস জানালেন যে আমরা কালোটিকে খেয়েছি আর সাদাটিকে খেয়েছে নেকড়ে। সত্য মিথ্যা জানার জন্য রাঁধুনিকে তলব করা হল। রাঁধুনি এসে অদ্ভুত কথা

শোনাল তাঁদের। যখন সে সাদা শূকরটিকে কেটে রান্না করবার প্রস্তুতি নিচ্ছে সেই সময় পোষা নেকড়ের বাচ্চা সেটিতে মুখ দিয়ে দেয়, তাই রাঁধুনি কালো শূকরছানাটিকে রোস্ট করে তাঁদের পরিবেশন করেছে।

ফরাসি দেশের রাজপরিবার সম্পর্কে তিনি তার চার বছর আগে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী লিখেছিলেন চার বছর পর তা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীটি ছিলঃ-

"তরুণ সিংহ তার বয়স্ক প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাবে
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথমবার নয় দ্বিতীয়বার
সোনার মুখচ্ছদ ভেদ করে খুলে আসবে চোখ
রক্তাক্ত ক্ষত, হায় কী ভয়ানক মৃত্যু রাজার।"

আশ্চর্যজনক ভাবে মিলে যায় ঘটনাটি। ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই ফরাসি রাজপরিবারে একটি বিয়ে হচ্ছিল। সেই বিয়ের অনুষ্ঠানেই বিয়েটি ভেঙে যায় অকস্মাৎ একটি শোকের ঘটনায়। দুই রাজ পুরুষ রাজা দ্বিতীয় হেনরি ও গ্যাব্রিয়েল বিয়ের অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে দ্বৈত তলোয়ার যুদ্ধে নেমে পড়েন খেলাচ্ছলে। এ বন্ধুত্বপূর্ণ খেলাতে সমঝোতামূলক প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। খেলা শেষ হওয়ার পর সোনার অলংকারে সজ্জিত হেনরি যখন আরেক দান লড়াই করতে চাইল তখন গ্যাব্রিয়েলের ইচ্ছা না থাকলেও হেনরির কারণে রাজি হতে হল। দ্বিতীয়বারের লড়াই শুরু হতে না হতে যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল তাতে সাথে সাথে দুটি তলোয়ার আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে গেল এবং গ্যাব্রিয়েলের তলোয়ারটা ছিটকে হেনরীর সোনার মুখবর্মভেদ করে চোখে বিধলে নিমেষের মধ্যে রক্তভেজা রাজা দ্বিতীয় হেনরি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

২ জুলাই ১৫৬৬ খ্রিষ্টাব্দে এই মহান ভবিষ্যদ্‌বক্তার মৃত্যু হয়। নিজের মৃত্যুর পুরো ঘটনা তিনি লিখে গেছেন এইভাবেঃ-

"বেঞ্চে থাকব শুয়ে শেষদিন
বিছানায় নয়
পরনে থাকবে নীল আলখাল্লা, পাদরি এসে পৌঁছবে দেরিতে
রাত্রে নামবে বৃষ্টি।"

গ্রন্থসূত্র : নস্ট্রাডামুস, উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ।

উপন্যাস

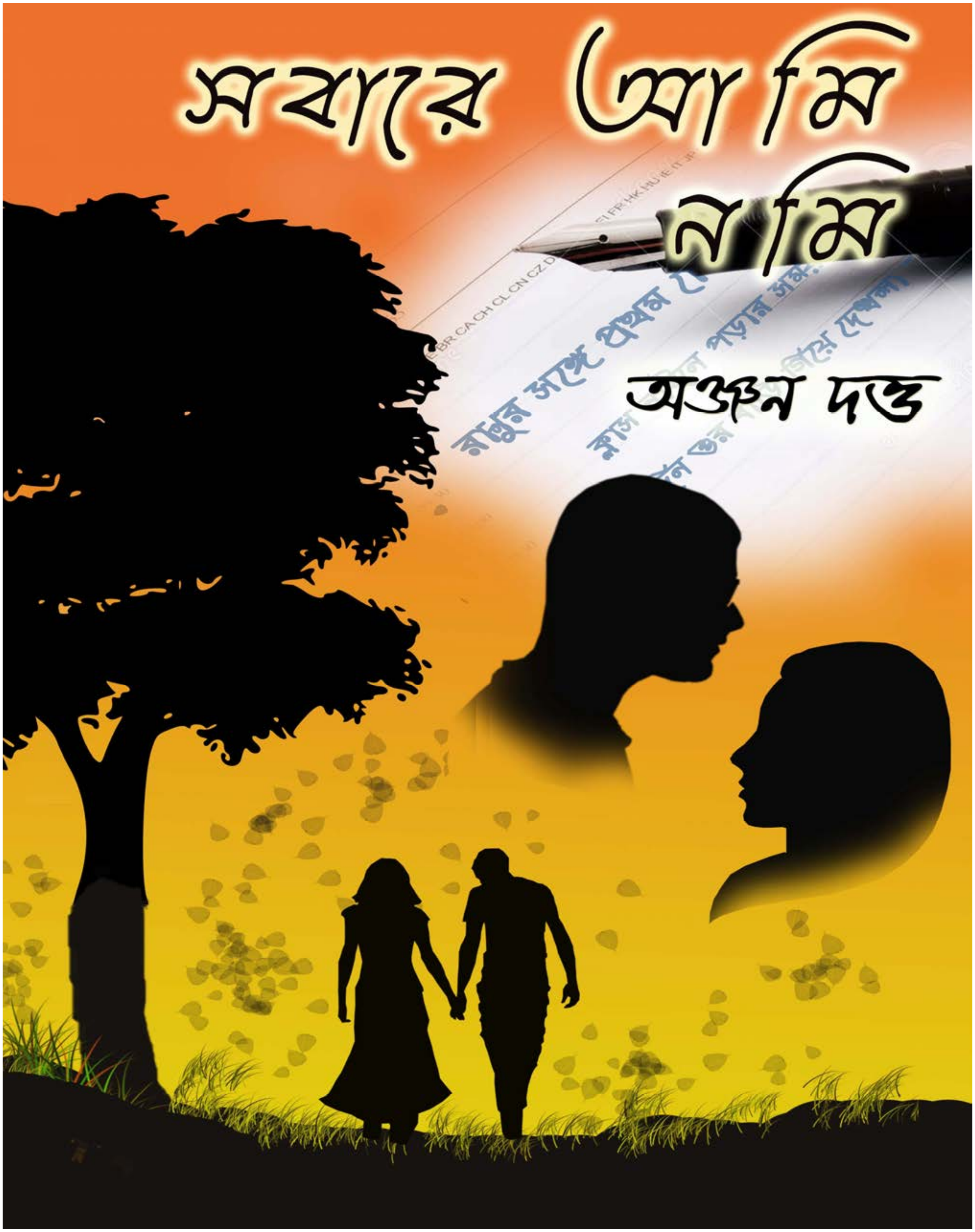

পূর্বকথা

অনুরণের কথা – রাণুর সঙ্গে প্রথম দেখা

ক্লাস

নাইনে পড়ার সময় দেবুর বাড়িতে রাণুকে প্রথম দেখি। দেবু আমার প্রিয় বন্ধু ও সহপাঠী — বিকেলে প্রায়ই দেবুর বাড়ি যেতাম।

একদিন ওর বাড়ি গিয়ে দেখলাম, গোলাপি ফ্রক পরা বেশ লম্বা একটি মেয়ে পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি খুব ফরসা, ছিপছিপে, বারো তেরো বছর বয়স – নিজের মনে বকবক করছে, হাতে একটা লাঠি – সেটা দিয়ে মাঝেমাঝে পাঁচিলে আঘাত করছে। ও যেন এ জগতেই নেই। মেয়েটিকে আগে কোনদিন দেখিনি – ভারী সুন্দর দেখতে।

জিজ্ঞেস করলাম, ‘এই, তুই কে রে?’

ও আমাকে যেন দেখতেই পেল না – নিজের মনে কথা বলে যেতে লাগল।

‘কি রে ?’ আমি আবার বললাম, ‘দেবুকে ডেকে দে তো, তুই কি দেবুর কোন আত্মীয়? তোকে আগে দেখিনি তো?’

এবারও আমাকে পাত্তাই দিল না সেই বালিকা।

আমি কী করব ভাবছি, ও হঠাৎ বলে উঠল, ‘তুমি কে?’

বললাম, ‘দেবুকে গিয়ে বল যে অনুরণ এসেছে।’

ও এতক্ষণে আমার দিকে তাকিয়ে দেখল, বিশাল নিষ্পাপ দুই চোখ — একটু হাসল — ওহ, এখনও চোখ বন্ধ করলে সেই হাসি যেন আমি দেখতে পাই। তখন বুঝিনি, এখন বুঝি, আমি সেই হাসিতেই — প্রথম দর্শনেই — যাক গে —

ও বলল, ‘তোমার কথা দেবুদার কাছে শুনেছি। আমি রাণু, ভাল নাম ঝিলিক বসু, ক্লাস সিক্সে পড়ি। এখানে নতুন এসেছি, আগে বেলেঘাটা থাকতাম।’

বেলেঘাটা কথাটা এত জোর দিয়ে বলল, যেন, বেলেঘাটা থাকাটা একটা বিরাট গুণ।

বললাম, ‘দেবু তোর কে হয়? তুই কি এই বাড়িতেই থাকিস?’

রাণু বলল, ‘দেবুদার বোন, মিঠু, আমার বন্ধু। আমরা এক ক্লাসেই পড়ি। আমি পাশের বাড়িতে থাকি।’

এই বলে ও দৌড়ে বাড়ির দিকে চলে গেল।

একটু পরে দেবু বেরিয়ে এল, বলল, ‘চল যাই।’

মিঠু আর রাণুও বেরিয়ে এল, দুজনে দৌড়ে মাঠের দিকে চলে গেল।

আমি দেবুকে বললাম, দেবু, রাণু মেয়েটা কে রে? বেশ সুন্দর দেখতে —

- রাণু? ও সোমার বোন, এখানে নতুন এসেছে।

- ওঃ, সোমার বোন — তাহলে রাণু তো তোর শালি হবে, তাই না?

- হেঁ হেঁ, - কী যে বলিস। তুই কী করে জানলি, ওর নাম রাণু?

- কেন? ও তো নিজেই আমাকে বলল।

- ও তোকে বলল? ও তো কারও সঙ্গে কথাই বলে না, আশ্চর্য —

- কেন?

- ও একটা পাগলি, নিজের মনে কথা বলে। কাউকে পাত্তা দেয় না — আমাদের সঙ্গেও ভাল করে কথা বলে না, নিজের মতো থাকে। পাকা মেয়ে, সব গল্প উপন্যাস পড়া শেষ। পড়াশুনোয় খুব ভাল — তোর মতো।

তখন কি আমি জানতাম, এই মেয়েটাই আরও ৮/৯ বছর পর আমার বউ হবে — আমার জীবনসঙ্গিনী হবে?

এখানে বলে রাখি, দেবু এখন আমার ভায়রা-ভাই — রাণুর দিদি সোমাকেই দেবু বিয়ে করেছে। আমরা সবাই এক পাড়ার ছেলেমেয়ে।

বছর দুয়েক এগিয়ে যাই — প্রথম প্রেমের অনুভুতি

তখন আমার বছর ষোলো বয়স, রাণুও প্রায় আমার বয়সি — আমার চেয়ে দু ক্লাস নীচে পড়ত। ক্লাস ইলেভেনে পড়তাম (পুরোনো কোর্স)। ফুটবল, ব্যাডমিন্টন ভালই খেলতাম। মিশন স্কুলে পড়তাম, পড়াশুনো খুব বেশি কিছু করতাম না, খালি খেলেই বেড়াতাম আর প্রচুর গল্পের বই পড়তাম। তবুও, কী করে যেন পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে যেতাম, হেঁ হেঁ।

দুর্গাপুজোর সপ্তমীর রাতে পাড়ার পুজো প্যান্ডেলে রাণু বসে ছিল — সন্ধ্যারতি দেখছিল। আমি হঠাৎ ওকে দেখলাম — যেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম ওকে। বাঃ, রাণু তো দারুন দেখতে হয়েছে। আজ লাল পাড় সাদা সিল্কের শাড়িতে ওকে কী সুন্দরই যে লাগছে — লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে দেখতে থাকলাম, দেখতেই থাকলাম — ও একবারও আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখল না। কিন্তু, কীভাবে জানি না, ও বুঝে গেল যে আমি ওকে দেখছি।

তারপর থেকেই আমরা আর পরস্পরের কাছে সহজ হতে পারতাম না। পাড়ায় দুজনেই দুজনকে এড়িয়ে চলতাম। দেবুর বাড়িতে আমাদের প্রায়ই দেখা হত, সেখানেও আমরা সহজ হতে পারতাম না। তবে, কেউ একজন কথা শুরু করলে আর একজন কথা বলত।

একদিন ও আমাকে বলল, 'জানো, তোমার বন্ধু সুনীল আমাকে প্রেমপত্র দিয়েছে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'ওঃ, তো আমাকে বলছিস কেন?'

বুঝতেই পারিনি, ও কেন আমাকে বলছে।

আমি আবার জিগ্যেস করলাম, 'আমাকে কী করতে বলছিস ? আমি কি তোর জবাবের চিঠি ওকে পৌঁছে দেব?'

ও খুব রেগে গেল, বলল, 'মূর্খ কোথাকার, এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ফার্স্ট হও?'

এই বলে ও চলে যাচ্ছিল — হঠাৎ আমার সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল।

আমি হো হো করে হেসে ফেললাম, বলে উঠলাম, 'ওঃ, রাণু শোন — তুই চলে যাস না। রাগ করিস না প্লিজ। রাণু, তোকে আমার খুব ভাল লাগে।'

রাণু যেন চমকে গেল, লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে বলল, 'আমাকে কী করতে হবে ?'

আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম, ও একটু হেসে চলে গেল।

--xx--

অনুরণ রায় আমার বাল্যবন্ধু। ওর লেখা একটা পুরোনো ডায়রি আমার হাতে এসেছিল — ওর অনুমতি নিয়ে সেটাই একটু সাজিয়ে গুছিয়ে এই লেখাটা লিখলাম। বছর ষোলো বয়সের একটি ছেলের লেখা ডায়রি — ভাষা হয়তো সাহিত্যের উপযুক্ত নয়, তবুও, ডায়রির ভাষা একই রাখার চেষ্টা করেছি — খুব একটা পরিবর্তন করিনি।

এটা কোনও কিশোর প্রেমকাহিনি নয়, কোনও বানানো গল্প নয়। এটা একটা অসাধারণ মেধাবী ছেলে, অনুরণের গল্প, যে অন্যায়, পক্ষপাতিত্ব আর হিংসার শিকার হয়েছিল। এটা কিছু শিক্ষকের নিষ্ঠুরতা, আদর্শহীনতা আর স্কুলের কড়া নিয়মকানুনের ফাঁদে বন্দি অনুরণের কাহিনি।

এক

অনুরণের কথা — ছেলেবেলা

বোধহয় শংকরের লেখায় পড়েছিলাম, বেকার বাঙালির দুই 'ম্যান' ভরসা – স্যামুয়েল হ্যানিম্যান আর আইজ্যাক পিটম্যান।

আমার বাবা আর মা, দুজনেই স্বাধীনতা সংগ্রামী — দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই দুই 'ম্যান' ওদের ভরসা জুগিয়েছিলেন। বাবা হোমিয়োপ্যাথি পড়ে ডাক্তার হলেন। মা বেসরকারি অফিসে স্টেনো/টাইপিস্ট-এর কাজ করতেন আর পাশাপাশি পাড়ার একটা স্কুলে পড়াতেন। পরে স্কুলটা বড় হল, মা বি.এ. পাশ করলেন, ইংরাজিতে স্পেশাল অনার্স করলেন, বি.টি. করলেন, স্কুলের সহকারি প্রধান শিক্ষিকা হলেন।

আমরা তিন ভাইবোন — সাধারণভাবেই আমরা বড় হয়েছি।

মা খুব ভাল গান করতেন — শৈলজারঞ্জন মজুমদার-এর ছাত্রী ছিলেন। সংসারের চাপে গান ছেড়ে দিতে হয়েছিল, কিন্তু দুই মেয়েকে মা পড়াশুনোর পাশাপাশি ভালভাবে গান শেখালেন।

আমরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠলাম।

আমার এক-দু মাস বয়স থেকেই মা আমাকে কোলে রেখে তেল মালিশ করতে করতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন। তখন থেকেই আমার রবীন্দ্রসঙ্গীতের 'কান' তৈরি শুরু, রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি প্রেমের শুরু। সেই প্রেম আজও সমান ভাবে প্রোজ্বল — দিনে দিনে যেন বাড়ছে।

আট বছর বয়সেও আমি স্কুলে ভরতি হইনি — সারাদিন শুধু খেলে বেড়াতাম। মা আমার 'হাতেখড়ি', অক্ষর পরিচয় করালেন, ইংরাজি ও বাংলা লিখতে শেখালেন। মায়ের খুব সুন্দর হাতেরলেখা ছিল, একটা স্লেটে কয়েক লাইন লিখে দিতেন, আমি সারাদিন সেই লেখার উপর চক বুলোতাম।

বাড়িতে মাস্টাররা এসে দিদিদের পড়াচ্ছেন, গান শেখাচ্ছেন — আমার কানে সব ঢুকছে। আমি সারা বাড়ি, উঠোন জুড়ে দৌড়োদৌড়ি করছি, পেয়ারা গাছে, আম গাছে উঠছি, গাছের ডালে শুয়ে থাকছি – আর মা খাতা পেন্সিল হাতে নিয়ে আমার পিছনে ঘুরছেন আর বলছেন, 'অনু, নেমে আয়, এক পাতা লেখ, আয় সোনা, নাহলে শাস্তি দেব কিন্তু —'

এখনও চোখ বন্ধ করলে এই দৃশ্য যেন স্পষ্ট দেখতে পাই।

মা আমাকে কী শাস্তি দিতেন? আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিতেন। আমি সহ্য করতে পারতাম না, কাঁদতে থাকতাম – 'ও মা কথা বলো, ও মা কথা বলো' — মা গম্ভীর হয়ে কাজ করে যেতেন।

আমি বাধ্য হয়ে কাঁদতে কাঁদতে খাতা পেন্সিল নিয়ে বসতাম। মা কাজ করতে করতে গেয়ে উঠতেন, অমলধবল পালে লেগেছে — আমি লিখে যেতাম। কিংবা গাইতেন, যুক্তাক্ষরে ভরা — প্রাঙ্গনে মোর শিরীষ শাখায়। সব রকম গানই গাইতেন — রবীন্দ্রসঙ্গীতই বেশি আর আমি খাতায় লিখে যেতাম — মুক্তোর মত হাতেরলেখায়। তারপর মা হাসতেন, বানান ঠিক করে দিতেন। আবার আমার সঙ্গে কথা বলতেন, আমায় আদর করতেন — আমি ধন্য হয়ে যেতাম।

ছোটবেলায় বাবা, মা আমায় কোনওদিন মারেন নি।

এগুলো আমার আট বছর বয়সের কথা। ছোড়দি আমার চেয়ে চার বছরের বড়, ক্লাস ফোরে পড়ত, বড়দি সাত বছরের বড়, ক্লাস এইটে পড়ত। আমি ওদের সব বইগুলো দেখতাম, পড়ার চেষ্টা করতাম।

মাস্টাররা বাড়িতে এসে ওদের পড়াতেন, শুনতে শুনতে আমারও সব পড়া হয়ে যেত। গানের মাস্টার আসত, তবলচি আসত – আমার সেগুলোও শেখা হয়ে যেত, হেঁ হেঁ।

মায়ের স্কুলের নাম, নেতাজি বিদ্যায়তন। তিনটি বিভাগ — সকালে মেয়েদের স্কুল আর প্রাইমারি স্কুল। আর দুপুরে ছেলেদের স্কুল। প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার ননিবাবু আমাদের বাড়িতে এসে দুই দিদিকে পড়াতেন। সমস্ত সাবজেক্ট পড়াতেন — ভাল টিচার হিসেবে তাঁর বেশ সুনাম ছিল।

একদিন আমি খেলছি আর উনি ছোড়দিকে অঙ্ক শেখাচ্ছেন। একটা অঙ্ক করতে দিয়েছেন, দিদি পারছে না। উনি রেগে গেলেন, দিদিকে খুব বকাবকি করতে লাগলেন — আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, 'আমি পারব অঙ্কটা।'

ননিবাবু আমাকে ডাকলেন, দেখা গেল দিদির সব অঙ্কই আমি পারছি। উনি আমাকে অন্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করতে থাকলেন, লিখে উত্তর দিতে বললেন — আর একদম অবাক হয়ে গেলেন। আমার সব উত্তর নির্ভুল হল।

ননিবাবু মাকে ডাকলেন, 'ও দিদি, এ তো হীরের টুকরো ছেলে, কী সুন্দর হাতের লেখা। ও এত সব কবে শিখল? তুই শুনে শুনেই শিখলি এসব, অনু?'

আমি তো আর ওখানে নেই — পাশের ঘরে দৌড়ে চলে গেছি। শুনছি, মা বলছেন —

- হ্যাঁ, ও সব শোনে, দিদিদের বই নাড়াচাড়া করে আর আমাকে কত যে প্রশ্ন করে – উফ, আমার কান ঝালাপালা হয়ে যায়।

- দিদি, ওকে এবার স্কুলে দিয়ে দিন। আমি ওকে পরীক্ষা করে যা বুঝলাম ও ক্লাস ফোরের সবই পারবে। ওর বয়স কত?

- এই তো, আট চলছে – আগস্টে আট পূর্ণ হবে।

- তাহলে তো থ্রি তে ভরতি করতে হবে, বা পরের বছর ক্লাস ফোরে —

আমি দৌড়ে এসে তীব্র প্রতিবাদ জানালাম, 'না — আমি ছোড়দির ক্লাসে পড়ব, ক্লাস ফোরে — আমি সব পারি।'

খুব চেঁচামেচি, কান্নাকাটি শুরু করে দিলাম – মা আর ননিবাবু আস্তে আস্তে মেনে নিলেন।

আমি ২ মে, প্রাইমারি স্কুলে ভরতি হলাম — ক্লাস ফোরে। বাবা স্কুলের জামা, প্যান্ট, জুতো কিনে আনলেন। সকাল বেলা মা ও দিদিদের সাথে স্কুলে গেলাম — কী মজা, কতো নতুন নতুন বন্ধু পাব।

ক্লাস শুরু হল — আমি দেখলাম যা পড়ানো হচ্ছে, আমি সবই জানি, সবই পারব।

ক্লাসঘরের একদিকে ছেলেরা আর একদিকে মেয়েরা বসে আছে — দিদিও মেয়েদের মধ্যে বসে আছে। একটু পরে পরেই মা এসে আমাকে দেখে যাচ্ছেন, আমি কী করছি। সব টিচাররা ক্লাসে এসেই আমার সঙ্গে আলাপ করছেন — সবাই জানেন, দিদিমণির ছেলে আজ স্কুলে ভরতি হয়েছে।

কিন্তু নতুন বন্ধুরা কেউ আমার সঙ্গে খুব একটা কথা বলল না। আমার এত খাতির দেখে ওরা আমাকে এড়িয়ে যেতে লাগল। যেন আমি ওদের মধ্যে বছরের মাঝখানে উড়ে এসে জুড়ে বসছি। আমার কোনও বন্ধু হল না। পরেও, আমি প্রাণ খুলে মিশতে যেতাম, কেউ সেরকম কাছের বন্ধু হত না। স্কুলে খেলার পিরিয়ড ছিল, সেখানেও আমার কোনও বন্ধু হল না। সেই আট বছর বয়সেই একাকিত্বের দুঃখ অনুভব করতে শিখে গেলাম।

যাই হোক, মাত্র ১০/১৫ দিন ক্লাস হয়েই গ্রীষ্মের ছুটি হয়ে গেল। ২২ জুন স্কুল খুলবে — আর ২৯ জুন হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা শুরু হবে।

এই ছুটিতে মা আমাকে নিয়ে পড়লেন, সারা দিন, রাত - যে কোনও সময়, যখনই সময় পেতেন আমাকে নিয়ে পড়াতে বসতেন। ছোড়দিও মাঝে মাঝে সঙ্গে বসত। দিদির বই, খাতা নিয়ে মা আমাকে পড়াতেই থাকতেন, আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠতাম — মা ছাড়তেন না।

কিছুদিন পর থেকে মার মুখে হাসি ফুটল — আমি সব পারছি। মা আমাকে খুব আদর করলেন — আমি খুব খুশি। তবে, ছোড়দি আমাকে হিংসে করতে শুরু করল, ও আমাকে দুম করে মেরে দিত, কান মুলে দিত, চিমটি কাটত, হেঁ হেঁ।

হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার মোট নম্বর ছিল ৫৫০ — আমি ৫৪০ পেয়েছিলাম। তপতী নামের একটি মেয়ে আমার চেয়ে প্রায় ২০০ নম্বর কম পেয়ে সেকেন্ড হয়েছিল।

ননিবাবু খুব খুশি — যেন তাঁর জন্যই আমি প্রথম হয়েছি।

পরদিন ননিবাবু সকালে একমুখ হাসি নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে বাবা, মার সঙ্গে দেখা করলেন।

- দাদা, আপনার ছেলে একটি রত্ন — আমি এত ছেলে পড়াই, অনুর মত ব্রেন আমি আর দেখিনি।

- সত্যি ?

- হ্যাঁ, দাদা, একদম সত্যি বলছি। ও দিদি — মিষ্টি খাওয়ান। অনুর এত সুন্দর হাতের লেখা কী করে হল ? ও এত লিখল কবে ? একটা ক্লাস ফোরের বাচ্চার এত ভাল হাতেরলেখা — ভাবা যায় না।

মা, বাবা মৃদু হাসলেন। ননিবাবু আবার বললেন —

- দিদি, আমিই অনুকে পড়াব তো ? তিন ভাইবোনকে একসঙ্গে এসে পড়িয়ে যাব। পয়লা আগস্ট থেকেই শুরু করি, কী বলেন?

মা বললেন, 'ননিবাবু, ভাবছি, অনুকে আমিই পড়াব। আপনাকে আর কত কষ্ট দেব —'

ননিবাবু খুব রেগে গেলেন — ফরসা মুখ লাল হয়ে গেল। তাঁর দোষ নেই — মাস গেলে আরও কিছু টাকা পাবেন আশা করেছিলেন তিনি।

অ্যানুয়াল পরীক্ষায় আমি পঞ্চম স্থান পেলাম — ছোড়দি ফোর্থ। ছোড়দি খুব খুশি — আমাকে একটু আদরও করে দিল। যারা ননিবাবুর কাছে আলাদা করে বাড়িতে পড়ত, তারাই ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড হয়েছে।

রেজাল্ট নিয়ে দিদিদের সঙ্গে বাড়ি চলে এলাম। মা একটু গম্ভীর, আমাকে মিষ্টি খেতে দিলেন, আদর করলেন। রেজাল্ট নিয়ে আমার সঙ্গে একটা কথাও বললেন না। দিদি আর বড়দিকেও বাবা মা খুব আদর করলেন — বললেন, 'আমরা খুব খুশি হয়েছি — আরও ভাল রেজাল্ট করতে হবে, আরও বেশি করে পড়তে হবে —'

আমি খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বিকেলে ঘুম ভেঙে গেল। মা অঝোরে কাঁদছেন আর বাবা মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন —

- কেঁদোনা, এই রেজাল্ট কিছুই নয়, অনু ছেলেমানুষ — ও কিছুই জানে না, বোঝেনি —

- আমি ওর সব খাতা দেখেছি গো — প্রত্যেকটা খাতায় নম্বরে কত কাটাকুটি। আমার ছেলেটাকে ওরা সবাই মিলে ইচ্ছে করে কম কম নম্বর দিল। ও এবারও ৫৪০ পেত। সব উত্তর ঠিক — কী সুন্দর এক একটা খাতা গো -

- ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারছি। তুমি একটু শান্ত হও।

- আমার খুব কষ্ট হচ্ছে গো। কী অন্যায় - কারও কোন আদর্শ নেই? অনু যদি জানতে পারে, এই বয়সেই ওর কী ধারণা জন্মাবে? ও ঘৃণা, হিংসা এসব কিছুই জানে না। আমরাই ওকে সব শিখিয়ে দিলাম — ভগবান —

মা কেঁদেই চলেছেন — বাবা মা কে বুঝিয়েই চলেছেন —

মার কান্না দেখে আমার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠতে লাগল — আমি প্রথম হইনি বলে মার এত কষ্ট? মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞার মতই করে ফেললাম — আমি আর কোনদিন সেকেন্ড হব না। চিরকাল আমি সব পরীক্ষায় প্রথম হব।

হ্যাঁ, একটা সম্পূর্ণ নতুন অনুভুতি হতে লাগল — রাগ, ক্রোধ। ননিবাবুর উপর, সব মাস্টারদের উপর — খুব রাগ হতে থাকল। আমার মা কে যারা কাঁদাল, তাঁদের আমি জীবনেও ক্ষমা করতে পারব না।

ক্ষমা করতে পারিওনি — সেইজন্য অনেক বছর পরে, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট আমার আশানুরূপ হয় নি। সে আরেক গল্প।

ক্লাস ফাইভে উঠে নেতাজি বিদ্যায়তনের ছেলেদের স্কুলে ভর্তি হলাম। দুপুরের স্কুল — মা আর আমার ক্লাসে আসতে পারবে না — বাঁচা গেল।

দেশের আর পাঁচটা স্কুলের মতই বিদ্যায়তন খুবই সাধারণ স্কুল। ক্লাসে আমিই বোধহয় সর্বকনিষ্ঠ — আগের বছরের অনেক ফেল করা বয়স্ক ছাত্রের দল — প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্র — সবাই একসঙ্গে কথা বলছে, হই হই করছে, আমিও খুব হাসছি, চিৎকার করছি, এ যেন এক অন্য জগৎ। কিন্তু এখানে আমাকে কেউ দূরে ঠেলে দিল না। সবাই আপন করে নিল — আমার অনেক বন্ধু হল, তাদের অনেকেই এখনও আমার বন্ধু আছে।

এখানে এসে আমার খুব বড় একটা প্রাপ্তি হল — এখানে লাইব্রেরি রুম আছে। যদিও মাত্র চার আলমারি বই, সেগুলোই আমার কাছে মহামুল্যবান। খেলার পিরিয়ডে এখানে চলে এসে বই পড়তাম। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় আমার এখানেই শুরু। আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব আমার এই প্রথম স্কুলের ছোট্ট লাইব্রেরির কাছে।

এই স্কুলেও আমার একই রকম রেজাল্ট — হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় যে সেকেন্ড হয়েছিল, সে আমার চেয়ে প্রায় ২০০ নম্বর কম পেয়েছিল। সব বিষয়েই আমি প্রায় পুরো নম্বর পেয়েছিলাম।

আমি প্রধান শিক্ষক কালীবাবুর চোখে পড়ে গেলাম — উনি এক রবিবার সকালে আমাদের বাড়ি এলেন। বাবা, মা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

কালীবাবু বললেন, ‘ডাক্তারবাবু, অনুরণ এত ভাল ছেলে, ওকে এবার মিশনে দিলেন না কেন? আমার নিজের স্কুল হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, এখানে ও খারাপ হয়ে যাবে। কত বাজে বয়স্ক ছেলে ওর সহপাঠী। ওর মত মেধাবী ছেলের মিশনেই পড়া উচিত।’

বাবা বললেন, ‘কী জানি — শুনেছি মিশন বড়লোকের স্কুল। ওখানে পড়াতে অনেক খরচ — আমরা কী পারব ?’

কালীবাবু — ঠিক পারবেন, কী এমন খরচ ? ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটু ভাবুন। মিশন থেকে প্রতি বছর HS-এ ১ থেকে ২০ র মধ্যে ৫/৬ জন থাকেই, প্রায় সব ছাত্রই ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে — আর আমাদের স্কুলে একটাও ফার্স্ট ডিভিশন যায় না।

মা — ঠিক আছে, আপনি আমাকে বলবেন তো, মিশনে পড়াতে কীরকম খরচ হবে আর এখন ওখানে ভরতি করানো যাবে কি না —

কালীবাবু — ইস, আপনারা কোনও খবরই রাখেন না। ক্লাস ফাইভের জন্য ভরতির পরীক্ষা হয়ে গেছে। ক্লাসও শুরু হয়ে গেছে — এ বছর আর হবে না। পরের বছর ক্লাস সিক্সের জন্য ভরতির পরীক্ষা দিতে হবে। একটু কঠিন হয়ে যাবে — ক্লাস সিক্সে চারটে সেকশনে মাত্র ২০ জন নতুন ছেলে নেওয়া হয় আর পরীক্ষা দেয় ৩৫০০/৪০০০ ছেলে। তবে, অনু যা মেধাবী, ও ঠিক চান্স পেয়ে যাবে।

কালীবাবু চলে গেলেন।

পরের বছর কালীবাবু নিজেই ঠিক সময়ে অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য ফর্ম নিয়ে এলেন, নিজেই ফর্ম ফিল-আপ করে বাবাকে দিয়ে সই করিয়ে নিজেই ফর্ম জমা দিয়ে এলেন।

এই মানুষটির কাছে আমি অনেক কিছু শিখেছি। কোনও কিছুর প্রত্যাশা ছাড়াই আমাদের কী যে উপকার উনি করেছিলেন — এঁকে দেখে আমার শিক্ষকদের প্রতি হারানো শ্রদ্ধা আবার ফিরে এসেছিল। ওনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

দুই

অনুরণের কথা — মিশন স্কুল

অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে মিশনে ক্লাস সিক্সে ভরতি হলাম। এখানে বলি, ভর্তির পরীক্ষাতেও যথারীতি আমিই প্রথম হয়েছিলাম।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিঃ দত্ত ছিলেন পুরোপুরি ‘সাহেব’ — রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত হেডমাস্টার।

উনি ছিলেন সাঙ্ঘাতিক কড়া — উঁচু ক্লাসে ইংরাজি পড়াতেন।

ওঁর লেখা ইংলিশ সেকেন্ড পেপার বই [ক্লাস ৯-১১] আমাদের স্কুলে পাঠ্য ছিল, আমিও পরে সে বই পড়েছি — খুবই উৎকৃষ্ট মানের বই।

প্রথম দিন, ফার্স্ট পিরিয়ড চলাকালীন, হেডমাস্টারের ঘরে আমার ডাক পড়ল। আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম, ক্লাসশুদ্ধ সবাই অবাক হয়ে গেল — এমনকী ক্লাসটিচারও অবাক হয়ে গেলেন।

আমি ওনার ঘরে গেলাম। উনি আমাকে দেখে হাসলেন, আমাকে বসতে বললেন। তারপর আমার সঙ্গে খুব নীচুস্বরে আলাপ করতে শুরু করলেন — নাম কী, কোথায় থাকো, বাবা-মায়ের নাম কী, বাবা কী করেন, পরিবারে আর কে আছেন — এই সব। মিনিট পাঁচেকের মত আমরা কথা বললাম — শেষে উনি বললেন, 'ঠিক আছে, ক্লাসে যাও, মন দিয়ে, ভাল করে পড়াশুনো করবে। ফাঁকি দিলেই কিন্তু আমি চাবকে পিঠের ছাল তুলে ফেলব।' বলেই উনি হেসে ফেললেন।

উনি আমার সঙ্গে এত ভাল ব্যবহার করছিলেন — আমার কেন জানি না, কান্না পেয়ে যাচ্ছিল।

উনি শেষে বললেন, 'তোমাকে কেন ডেকেছিলাম জানো ?'

আমি বললাম, 'না স্যর।'

উনি বললেন, 'তুমি অ্যাডমিশন টেস্টে ৩৮০০ ছেলের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছ। শুধু ফার্স্ট নয়, তোমার খুব একটা নম্বর আমরা কাটতে পারিনি — প্রায় পুরো নম্বরই তুমি পেয়েছ। তাই তোমাকে দেখার ইচ্ছে হয়েছিল। এখন ক্লাসে যাও।'

এই স্কুলে এসে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। হ্যাঁ — এই হচ্ছে স্কুল।

কী বড় বড় ঘর, মোজাইক করা মেঝে, ঘরে তিনটি জানলা, দুটো দরজা, চারটে সিলিং ফ্যান, একাধিক টিউব লাইট — একটা বড় প্ল্যাটফর্মের উপর শিক্ষকের চেয়ার ও বিরাট একটা টেবিল — একটা বিশাল ব্ল্যাকবোর্ড।

ঘরে বড় একটা বুককেস, সেখানে আমাদের বুকলিস্টের বাইরের বিভিন্ন লেখকের লেখা আমাদের সব বিষয়ের পাঠ্য বইগুলো রাখা আছে। বইগুলো তিন দিনের জন্য বাড়িতে নেওয়া যেত — ক্লাসটিচার বইগুলো ইস্যু করতেন।

এ ছাড়াও আলাদা করে তিনতলায় একটা বিশাল লাইব্রের ছিল — আমি যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেলাম।

ক্লাসে সবার সঙ্গে পরিচয় করতে গিয়েই ধাক্কা খেলাম। ফার্স্ট বয়, সে ক্লাস ওয়ান থেকে ফার্স্ট হয়ে আসছে, ঝকঝকে চেহারা, চোখেমুখে কী আত্মবিশ্বাস। তার একটা বন্ধুগোষ্ঠী ছিল — সব ভাল ছেলেরা সেই দলে, আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলল না ওরা।

যদিও স্কুলে সব ছাত্রদের একই ড্রেস — সাদা জামা, খাকি প্যান্ট — তবুও কিছু ছেলের পোশাক খুব সুন্দর, দামি, ইস্ত্রি করা — তাদের কথাবার্তা, চালচলন, মাথার চুলের ছাঁট — সব মিলিয়ে এক নজরেই বোঝা যায় ওরা বড়লোকের ছেলে। ওদের একটা আলাদা গ্রুপ — আমাকে ওরা যেন দেখতেই পেল না।

ক্লাসে ৭/৮ জন আশ্রমের অনাথ ছেলে ছিল, প্রত্যেকেই বেশ বয়স্ক। লম্বা বলে সবাই লাস্ট বেঞ্চে বসে — ওদের একটা গ্রুপ। এ ছাড়া হস্টেলে থাকত - এ রকম কিছু ছেলেরও আলাদা একটা গ্রুপ।

আমরা পাঁচজন নতুন ভরতি হয়েছি — সবাই কেমন সুন্দর সবার সঙ্গে মিশে গিয়ে বিভিন্ন বেঞ্চে বসে পড়ল। আমিই একা দাঁড়িয়ে রইলাম। এত গ্রুপের মাঝে আমি দিশাহারা হয়ে গেলাম — আমি কোথায় বসব? কে হবে আমার বন্ধু? কোথায় পাব তারে?

ছোটবেলা থেকেই — কেউ যখন আমার সঙ্গে খেলত না, আমার বন্ধু হত না — আমার খুব কষ্ট হত। আজও সেই কষ্ট অনুভব করতে পারি। তাই, আমি নিজের চারিদিকে একটা বর্ম বানিয়ে রেখেছিলাম, যেন কেউ আমাকে আঘাত করে কষ্ট দিতে না পারে, কেউ দূরে ঠেলে দিলেও আমার যেন কষ্ট না হয়। আমার বাড়ির লোকজন ছাড়া আর কেউ সে বর্ম ভেদ করতে পারবে না।

কিন্তু আগের স্কুলের প্রধান শিক্ষক কালীবাবু আর আজ সকালে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিঃ দত্ত, কী সহজেই বর্মটা ভেদ করে ফেললেন — আমাকে আরও শক্ত করে বর্মটা বানাতে হবে।

দীপক বলে একটি আশ্রমের ছেলে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। আমি ওদের সঙ্গেই লাস্ট বেঞ্চে বসলাম। দীপক সারা স্কুলজীবন আমার ভাল বন্ধু হয়ে পাশে ছিল, ও যেন আমাকে রক্ষা করত। বন্ধুদের সঙ্গে আমার সব ঝগড়া, মারামারিতেও সবসময় আমাকে অন্ধের মতো সমর্থন করত।

খুব ছোটবেলা থেকেই মা আমাকে কবিতা, গান, অনেক কিছু মুখে বলে যেতেন আর আমি লিখে যেতাম। তার কারণ ছিল। মা একটানা কাজ করে যেতেন — রান্নার কাজ, ঘরের কাজ, নিজের পড়াশুনো, পরীক্ষার খাতা দেখার কাজ — মায়ের দুই হাত সমানে চলত। আর তাই, আমাকে মুখে মুখে লিখতে বলতেন কখনও কবিতা, কখনো গান। এতে আমার খুব লাভ হয়েছিল। কবিতা ও গানগুলো তো মুখস্থ হয়েই গেছিল, এ ছাড়াও, যে কোন বিষয়েই আমার লেখায় সাজ্ঘাতিক স্পিড এসেছিল। আর, এত এত লেখার জন্য আমার হাতের লেখাও বেশ ভাল হয়েছিল, নির্ভুল বানান — সবই মা আমাকে হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন।

বড়দির স্কুলের বইগুলো পড়তে আমার খুব ইচ্ছে হত আর সেগুলো পড়ে আমি উঁচু ক্লাসের অনেক কিছুই শিখে গিয়েছিলাম, বিশেষ করে অঙ্ক — আমি ক্লাস এইটের অঙ্কও করতে পারতাম।

তাই, মিশনে ক্লাস সিক্সে আমার কোন অসুবিধেই হল না।

মিশনে, ইংরেজি আর অঙ্কের উপর বেশ জোর দেওয়া হত। খুব ভাল ভাল শিক্ষকেরা আমাদের পড়াতেন। শিক্ষকেরা খুবই ভালো পড়াতেন, সময় নিয়ে বোঝাতেন, শেখাতেন। প্রায় সব ছাত্রদেরই আলাদা করে যত্ন নিতেন।

ক্লাসে আমাকে কেউ চিনত না, নামও জানত না। আমিও প্রায় কারও সঙ্গেই কথা বলতাম না। আমাকে কিছু জিগ্যেস করলে তবেই আমি কথা বলতাম। মাঝে মাঝে শিক্ষকেরা, বিশেষ করে অঙ্কের শিক্ষক, জিজ্ঞেস করতেন, ‘এই অঙ্কটা কেউ পারবে?’

একমাত্র তখনই আমি বলতাম, ‘হ্যাঁ স্যার, আমি পারবো’

ক্লাস সিক্সের হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় আমিই প্রথম হলাম — সেই একই রকম ফার্স্ট — মানে, যাকে বলে লেন্থে ফার্স্ট। এত দিনের ফার্স্ট বয়, অরুণ চক্রবর্তী, আমার চেয়ে ১৫০ নম্বর কম পেয়ে সেকেন্ড হল।

মিশনে একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম — পরীক্ষায় সব বিষয়েই খুব কম নম্বর দেওয়া হয়। ৫০/৫২র বেশি নম্বর দেওয়া হয় না। ৪০/৪২ খুবই ভাল নম্বর বলে ধরা হয়। এর কারণ জানতে চেয়ে জানলাম যে, এই ৪০/৪২ নাকি বোর্ডের পরীক্ষায় ৬০%+ আর ৫০/৫২ নাকি ৭৫/৮০ র সমান। কেন যে এ রকম করা হত, বুঝতে পারিনি।

পরীক্ষার খাতাগুলো আমাদের দেওয়া হল — গার্জিয়ানদের সই করিয়ে আনতে হবে। দেখলাম, আমার সব খাতায় কাটাকুটি করে, নম্বর কমিয়ে, অতি কষ্টে ৭০-এর ঘরে নম্বর দেওয়া হয়েছে, তবে অঙ্কের ১০০ নম্বরটা কমাতে পারেনি হেঁ হেঁ। আমি যেন শিক্ষকদের এতদিনের ‘রুলস’ ভেঙ্গে দিচ্ছিলাম।

রাতারাতি শিক্ষকেরা ও ছাত্ররা, সবাই আমাকে চিনে গেল। অরুণ আমাকে প্রথম বেঞ্চে এসে বসতে বলল, ক্লাস টিচারও সামনের দিকের বেঞ্চিতে এসে বসতে বললেন — আমি আমার হাইটের কথা বলে লাস্ট বেঞ্চেই থেকে গেলাম — তখনই আমি বেশ লম্বা, ক্লাস ফাইভ থেকেই আমার হাইট বেড়ে যাচ্ছিল।

মিশনের পূর্বদিকে এক বিশাল লাইব্রেরি ছিল — জেলা গ্রন্থাগার। এই লাইব্রেরি আমার এক বিরাট বন্ধু হয়ে দাঁড়াল — আমি আজ যা কিছু শিখেছি সব কিছুর জন্য আমি এই লাইব্রেরির কাছে কৃতজ্ঞ। এখানে পাঠ্য বইয়ের যা কালেকশন ছিল, কলকাতার অনেক ভাল লাইব্রেরিতেও তা ছিল কি না আমার সন্দেহ আছে।

পরবর্তীকালে অঙ্কে অনার্স পড়ার সময় এখান থেকে অনেক সাহায্য আমি পেয়েছি।

যখন দেখলাম এই স্কুলেও আমি প্রথম হচ্ছি, আমার পড়াশুনোয় ফাঁকি শুরু হল। জেলা গ্রন্থাগারের মেম্বার হলাম, গল্পের বই পড়া শুরু করলাম, প্রচুর বই — বাংলা সাহিত্যের সব লেখকদের সঙ্গেই পরিচয় হতে লাগল।

আমি সব বিষয়ের সব চ্যাপ্টারের উপর সম্ভাব্য প্রশ্ন বানাতাম আর সেগুলোর একটু বিশদভাবে উত্তর তৈরি করতাম — Umbrella Answer — যাতে পরীক্ষায় যে কোন প্রশ্নই আসুক, উত্তর করা যাবে। প্রত্যেক বিষয়ের উপর কুড়িটা করে প্রশ্ন বানাতাম, উত্তর তৈরি করতাম — মা সেগুলো যতটা পারেন, দেখে দিতেন। আর পাঠ্যবইগুলো আমার মুখস্থ হয়ে যেত, মাথাটা আমার ভালই ছিল, হেঁ হেঁ।

এভাবেই আমি নিজেকে তৈরি করতাম — অনেক লিখতে হত, এতে প্রচুর সময় লাগত। এরপর নিজেই নিজের পরীক্ষা নিতাম। ঘড়ি ধরে লিখতাম, ১০ নম্বরের প্রশ্ন ১৫-১৮ মিনিটের মধ্যে লিখে শেষ করতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি লিখতে পারতাম, তাই অসুবিধে হত না।

কিন্তু, এখন গল্পের বই বেশি পড়ার জন্য এত লিখে উত্তর তৈরি করার সময় কমে গেল — অন্য ছাত্রদের মতো আমিও শুধু পড়ার উপর নির্ভর করতে লাগলাম।

এর ফলও হাতে হাতে পেলাম — ক্লাস সিক্সের ফাইনাল পরীক্ষায় যদিও ফার্স্ট হলাম — কিন্তু আমার নম্বর অনেক কমে গেল। সেকেন্ড বয় অরুণের চেয়ে মাত্র ১২ নম্বর বেশি পেলাম। সবারই গায়ে গায়ে নম্বর, ২/৩ নম্বরের তফাত — ক্লাসে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

অরুণ খুব উৎসাহ পেল — আরে? অনুরণকে তো হারানো যেতে পারে ...

ক্লাস সেভেনের প্রথম দিনেই অরুণ আমায় প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ জানাল —

অরুণ - শালা লম্বু, তোর দিন শেষ। তুই আর ফার্স্ট হতে পারবি না।

আমি – করে দেখাস – ১৫০ নম্বর কম পেয়েছিলি, মনে আছে তো? আর শালা বলছিস কেন?

অরুণ – ও সব ভুলে যা — তখন তো তোকে শালা চিনতাম না —

আমি – এখন চিনেছিস ?

অরুণ – তুই এখন আমাকে চিনবি — আমরা তোকে প্রথম পাঁচজনের মধ্যেই থাকতে দেব না — মিলিয়ে নিস।

আমি – কী করে ? মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক — এসব করবি না কি? হেঁ হেঁ --

অরুণ – সে তুই দেখতেই পাবি —

ক্লাসের সব ছেলে চুপচাপ, দাঁত বার করে আমাদের বাকযুদ্ধ উপভোগ করছিল —
অরুণ সত্যি সত্যি সেটা করে দেখাতে খুব চেষ্টা করেছিল — যদিও সেটা ও করতে পারেনি।

তিন

অরুণ চক্রবর্তীর কথা – মিশন স্কুল

আমি সেই ক্লাস ওয়ান থেকে ফার্স্ট হয়ে আসছি আর এখন এই অনুরণ, একটা নতুন ছেলে — ও কিনা আমাকে হারিয়ে দেবে? কাল ক্লাসে ওকে চ্যালেঞ্জ জানালাম, ওকে রাগানোর চেষ্টা করলাম, ও গায়েই মাখল না। হাসিমুখে আমাকে যেন অবজ্ঞাই করল। আমি ওর দেমাক ভাঙবই।

ওর এত দেমাক কীসের? ক্লাসের কোনও ছেলের সঙ্গে ও বিশেষ মেশে না, কথা বলে না, এমনকী, টিচারদেরও ও বিশেষ পাত্তা দেয় না। আমরা সবাই টিচারদের নজরে পড়ার চেষ্টা করি, নানারকম প্রশ্ন করি, টিচার কিছু জিগ্যেস করলে হাত তোলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় — কে আগে উত্তর দেবে — কিন্তু অনুরণ চুপচাপ বসে থাকে। টিচারদের ও কিছুটা অবজ্ঞাই করে। সন্দীপ স্যারের ইংরাজি ক্লাসে আমাদের অসুবিধে হত। অনুরণকে জিগ্যেস করলাম, 'সন্দীপ স্যারের পড়ানো তুই বুঝতে পারিস?' ও যেন কিছুটা ঘৃণার সঙ্গে বলল, 'নিজের প্রাইভেট কোচিংয়ে তো শুনেছি খুব ভাল বোঝান – টাকার গন্ধ আছে যে —'

এই হচ্ছে অনুরণ — একটা অহংকারী, অসামাজিক ছেলে। তবে, কেউ ওর সঙ্গে কথা বলতে গেলে ও ভালভাবেই কথা বলে। আর যখন টিচারদের কোনও কোনও প্রশ্নের আমরা কেউ উত্তর দিতে পারছি না — টিচার বলছেন, 'কেউ জানো, উত্তরটা?' একমাত্র সেই সব ক্ষেত্রেই দাম্ভিক অনুরণ উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেয় — যেন, সব সময় ও প্রমাণ করার চেষ্টায় আছে, ও আমাদের চেয়ে কত ভালো ছাত্র। ওর এই দেমাক আমি ভাঙবই ভাঙব।

কিন্তু, কী করে? অনুরণ আমাদের চেয়ে সব সাবজেক্টেই অনেক বেশি জ্ঞান রাখে — ওর ভুল হয়ই না। কী সুন্দর হাতের লেখা — আমাদের চেয়ে ও অনেক ভাল। আমরা সুদীপবাবুর কাছে প্রাইভেটে পড়ি — স্যার আমাদের ওর পরীক্ষার খাতা দেখিয়েছেন। বলেছেন, 'দ্যাখো, কী ভাবে লিখতে হয় — আশ্চর্য হতে হয়, এইটুকু ছেলের মধ্যে এত পরিণতি কী করে আসে! ওর কোনও নম্বরই যে কাটা যায় না।'

একটা প্ল্যান মাথায় আসছে। ও গল্পের বই পড়তে খুব ভালোবাসে — ওকে আমরা — আমি, কল্যাণ, তাপস, চয়ন — সবাই মিলে নতুন নতুন গল্পের বইয়ের লোভ দেখাব। ক্লাসে গল্পের বই পড়তে দেখলে টিচাররা ওর উপর খুব রেগে যাবেন। আর পরীক্ষায় টিচাররা ওকে কম নম্বর দেবেন। এমনিতেই, বেশ বুঝতে পারি, কিছু কিছু টিচার অনুরণকে ওর নির্লিপ্ততার জন্য খুব একটা ভালো চোখে দেখেন না।

দাদা একটা বই কিনেছে — শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের লেখা, তুঙ্গভদ্রার তীরে। নতুন বই — কাল ওটা স্কুলে নিয়ে আসব। অনুরণ লোভে পড়ে বইটা পড়বেই — আর টিচাররা দেখতে পেলেই ওকে মারবে, হেঁহেঁ।

*****

আজ বইটা এনেছি। এর পর সুদীপবাবুর অঙ্কের ক্লাস — ওই ক্লাসেই ব্যাপারটা ঘটাব। সুদীপবাবু স্কুলের সেরা টিচার, অঙ্ক আর বিজ্ঞান (ফিজিক্স) পড়ান — খুব গম্ভীর আর সিরিয়াস টিচার।

স্যর ক্লাসে আসার আগে, আমি চকচকে নতুন বইটা হাতে নিয়ে অনুরণের পাশের ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। অনুরণ বইটা দেখল আর খুব আগ্রহ নিয়ে বইটার নামটা দেখার চেষ্টা করতে লাগল। আমি আমার সিটে ফিরে এলাম — কাজ হয়ে গেছে !

একটু পরেই অনুরণ গুটি গুটি আমার কাছে এল — বলল —

- অরুণ, তোর ঐ নতুন বইটা আমাকে একটু দেখতে দিবি?

- না না না — দাদার বই, দাদা কাউকে দিতে না করেছে। ছিঁড়ে গেলে দাদা মারবে।

- দে না প্লিজ, আমি এখানে বসেই সারাদিন ধরে পড়ে বইটা শেষ করে ফেলব।

- উফ, কী করি? দাদা বারবার বলে দিয়েছে কাউকে যেন বইটা না দেই — যদি ছিঁড়ে যায়?

- না রে — ছিঁড়বে না — যত্ন করে পড়ব।

- ঠিক আছে। এই নে, মলাটের কাগজ, মলাট দিয়ে নিস। আর টিচাররা কেউ যেন দেখতে না পায়। দেখলে কিন্তু HM-এর কাছে রিপোর্ট করে দেবে।

- কেউ দেখবে না রে — আমি লুকিয়ে পড়ে নেব। থ্যাঙ্কস, অরুণ —

একমুখ হাসি নিয়ে অনুরণ নিজের সিটে চলে গেল — মাছ টোপ গিলেছে। দেখা যাক, কী হয়। কল্যাণ, তাপস আর চয়ন – সবাই ব্যাপারটা দেখল। আমরা সবাই হাসতে থাকলাম।

অনুরণ লাস্ট বেঞ্চের লাস্ট সিটে বসে। ও একটা বড় খাতার তলায় বইটা রেখে মাঝে মাঝে পড়ে যাচ্ছে আর সুদীপবাবু অঙ্কের ক্লাস নিচ্ছেন — আমাদের জিগ্যেস করছেন কে কোন অঙ্ক পারছে না — তারপর সেগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছেন, বোর্ডে করে দিচ্ছেন — অনুরণ বইটা পড়েই যাচ্ছে।

এরপর স্যার একটা কবিতায় লেখা অঙ্ক, বোর্ডে লিখে আমাদের অঙ্কটা করতে বললেন। অঙ্কটা খুবই কঠিন, ঠিকভাবে বুঝতেই পারছি না — করব কী করে ? আমরা কেউ পারছি না, স্যার এবার নিশ্চয়ই অনুরণকে জিজ্ঞেস করবেন — আমরা দেখছি, অনুরণ একমনে গল্পের বই পড়ে যাচ্ছে। বইটা নিশ্চয় খুব ইন্টারেস্টিং — পড়, পড়, পড়ে যা —

হঠাৎ স্যার চার লাইনের অঙ্ক-কবিতাটা মুছে দিলেন আর সোজা অনুরণের পাশে এসে দাঁড়ালেন। উনি বললেন, ‘এই যে অনুরণ, আমি কোন অঙ্কটা দেখালাম, তুমি দেখেছ? তখন থেকে দেখছি তুমি মাথা নীচু করে বসে আছ? ঘুমোচ্ছ না কি ?’

অনুরণ মাথা নীচু করে বসে রইল।

স্যার — কী হল? বলো? এ কৌ? তুমি কী করছ? দেখি? উঠে দাঁড়াও — এখনও বসে আছ? পাশে স্যাররা এলে উঠে দাঁড়াতে হয়, জান না? শেখনি?

অনুরণ উঠে দাঁড়াল। স্যার খুবই রেগে গেলেন — অনুরণকে খুব বকতে লাগলেন।

স্যর — বাঃ, গল্পের বই পড়ছ? কী বই, দেখি? খুব ভাল — বাবা কষ্ট করে মিশনে পড়তে পাঠিয়েছেন আর ছেলে অঙ্কের ক্লাসে তুঙ্গভদ্রার তীরে বেড়াতে যাচ্ছে।

সারা ক্লাস হাসিতে ফেটে পড়ল। স্যার পেছন ফিরে ধমকে উঠলেন, 'চুপ, একদম চুপ।'

স্যার চেঁচিয়ে উঠে অনুরণকে আবার বকতে লাগলেন, 'তোমার গল্পের বই পড়ার সাহস হয় কী করে? টিচারদের কথা শোনার আর দরকার মনে করো না, তাই না? এত জেনে গেছ? একবার ফার্স্ট হয়েই নিজেকে খুব বড় ভাবতে শুরু করেছ? বেয়াদব ছেলে — তা সেই তুঙ্গভদ্রার তীরেই যাও, এই স্কুল তোমার পক্ষে খুব ছোট জায়গা।'

স্যার ওকে মারছেন না, শুধু বকেই যাচ্ছেন আর সারা ক্লাসের ছেলেরা হা হা করে হাসছে। আর কিছু ছেলে, দীপক তাদের মধ্যে একজন, বেদনাভরা চোখ নিয়ে ওকে দেখে যাচ্ছিল। আমারও কিন্তু, কেন জানি না, ওর জন্য হঠাৎ কষ্ট হতে লাগল। আমি কি ওকে ভালোবেসে ফেলছি? যাক গে —

কিন্তু এবার আমরা একটু ভয় পেতে শুরু করলাম। স্যার যেভাবে ওকে একটানা বকে যাচ্ছেন — অনুরণকে কেউ বেশি অ্যাটাক করলে ও খোঁচা খাওয়া বাঘ হয়ে ওঠে। ও আজ কোনও হঠকারিতা না করে ফেলে।

স্যর বললেন, 'তা, মিঃ ফার্স্ট বয় — তুমি পারবে অঙ্কটা? যেটা বোর্ডে লিখেছিলাম? দেখেছিলে?'

অনুরণ হঠাৎ মুখ তুলল। সেই কোমল নিষ্পাপ চোখ আর নেই — তীব্র দৃষ্টি — আমরা প্রমাদ গুনলাম। পাশে বসা দীপক ওর পিঠে হাত রেখে চুপ থাকতে বলল। কিন্তু ও একটা অদ্ভুত ছেলে, কারও কথাই ও শুনবে না।

অনুরণ বলল, 'হ্যাঁ স্যার, অঙ্কটা পারব। বলতে কী, স্যার, আপনি যে কোনও অঙ্কই দিন, আমি পারব।'

স্যার — তাই না কি ? সাহসের বলিহারি — সাহস থাকা ভাল, কিন্তু দুঃসাহস? বেশ বেশ, গো টু দ্য ব্ল্যাকবোর্ড — করে দেখাও অঙ্কটা। যদি না পার, তবে তোমার কপালে আজ দুঃখ আছে। দাঁড়াও, অঙ্কটা আমি আবার লিখে দিচ্ছি।

অনুরণ — লিখতে হবে না স্যার, আমি জানি — এটা লীলাবতীর অঙ্ক।

অনুরণ উঠে বোর্ডে গেল, মুক্তোর মত হাতেরলেখায় অঙ্কটা লিখল — সারা ক্লাসের ছেলেরা মন্ত্রমুগ্ধের মতন দেখতে থাকল —

বাণিজ্য করিতে সাধু লয়ে গেল টাকা

চারিদিকে দুনো হয়, করে দাও লেখা

চারিদিকে চারি লক্ষ করে এল ব্যয়

শূন্যহাতে ফিরিলেন সাধু মহাশয়

সাধু বাড়ি থেকে কত টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলেন?

কী তাড়াতাড়ি যে অঙ্কটা করল অনুরণ — ভাবা যায় না। তারপর ও বলল, 'স্যার, অঙ্কটা x ধরে বীজগণিতে আর একভাবে করা যায়।'

'তুমি বীজগণিত জানো?' স্যার বললেন, 'এখনও তো তোমাদের বীজগণিত শুরুই হয়নি।'

অনুরণ বীজগণিত দিয়ে অঙ্কটা তিন লাইনে করে দিল — আমরা ওই পদ্ধতি জানিই না। তখনও আমাদের বীজগণিত ভাল করে শুরুই হয়নি। বুঝতে পারলাম, ও আমাদের চেয়ে কতটা এগিয়ে।

সারা ক্লাস একদম চুপ — স্যারের রাগ গলে জল। স্যার অনুরণকে জড়িয়ে ধরলেন, মাথায় হাত রেখে বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবা, দেশের মুখ উজ্জ্বল করো। তবে, ক্লাসে আর গল্পের বই পোড়ো না। আমি যেন কখনও আর না শুনি — আবার গল্পের বই পড়লে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।'

আমাদের প্ল্যানটাই ভেস্তে গেল, উলটে স্যারের চোখে অনুরণ আরও ভাল হয়ে গেল। এ ছেলেকে নিয়ে আমরা কী করি? ঠিক আছে, আবার পরের কোনও ক্লাসে চেষ্টা করা যাবে। কিন্তু মন থেকে তো সায় পাচ্ছি না — এ কী হচ্ছে আমার ?

শত্রুর জন্য কি আমার প্রেম জাগছে ? ধুসসস — গুলি মারো —

চার

রাণুর (ঝিলিক বসু) কথা —

সাদা ঘোড়া, জোর ছুটেছে বিশ্ব ভুবন পিছে ফেলে —
আকাশপথে উড়ছে যেন বিশাল দুটো পাখনা মেলে।
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছে কোথায় কে বা জানে -
রাত পোহাল, ভোরের আলো — সুয্যি মামা পুব গগনে।
ঘোড়ার পিঠে রাজার কুমার শঙ্খশুভ্র পোষাক পরে।
হঠাৎ এসে থামল ঘোড়া, আমার খোলা ঘরের দোরে,
রাজার কুমার এল নেমে, বলল আমার হাতটি ধরে —
স্বপ্নে দেখা কনে তুমি, এলাম আমি তোমার তরে।

দিদি আমার চুলের মুঠি ধরে নেড়ে দিয়ে বলল, 'ওরে রাণু, ওঠ, উঠে পড়, সাতটা বেজে গেছে।'

এত রাগ হল — কী ভাল একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। রবিবারের সকাল, একটু বেলায় ঘুম থেকে উঠলে কী হয় ? রোজই তো সকালে উঠি, স্কুলে যাই — আজ ছুটির দিনেও তাড়াতাড়ি উঠতে হবে ? ধুসস — ভাল্লাগে না।

দিদি আবার বলতে থাকল, 'কী রে? উঠে পড়? মাকে ডাকব?'

আমি — দিদি, ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়?

দিদি — বাব্বা, কী এমন স্বপ্ন দেখছিলি? কোনও রাজকুমার এসেছে? হিহিহি — সিন্ডারেলা?

আমি — তুই এত সকালে ড্রেসিং টেবিলের সামনে কী করছিস? ওঃ, তাই তো — হিহি - আজ তো রবিবার — তোর দেবুদা আসবে।

দিদি আবার আমার চুলের মুঠি ধরতে এগিয়ে এল — আমি পালালাম, বাথরুমে ঢুকে পড়লাম।

আমি রাণু, ভাল নাম ঝিলিক বসু, ক্লাস সেভেনে পড়ি। দিদি খুব সুন্দর দেখতে, আমার চেয়ে দু বছরের বড়, ক্লাস এইটে পড়ে। দেবুদা প্রতি রবিবার সকাল সাড়ে ন'টায় আমাকে অঙ্ক, বিজ্ঞান পড়াতে আসে। দিদিকেও মাঝে মাঝে অঙ্ক দেখিয়ে দেয়।

দেবুদা মিশনের খুব ভাল ছাত্র, ক্লাস নাইনে পড়ে — আমাদের পাশের বাড়িতেই থাকে। দেবুদার মা আর আমার মা ভাল বন্ধু, সময় পেলেই খুব আড্ডা মারেন। আমাদের বাবারাও খুব বন্ধু, সহকর্মী — একসঙ্গে রেল-এ চাকরি করেন। দুই বন্ধু পাশাপাশি থাকবেন বলে কলকাতা ছেড়ে এই পচা মফস্‌সলে এসে বাড়ি করেছেন। আগে আমরা বেলেঘাটা থাকতাম — কী ভাল, জমজমাট জায়গা — আর এই জায়গাটা একদম বাজে। কী আর করা — এখানেই থাকতে হবে।

দেবুদা ঘন্টা দুয়েক পড়ায়, খুবই ভাল পড়ায়। মাঝখানে দিদি প্লেটে করে আমাদের জন্য জলখাবার নিয়ে আসে। আমি খাই, দেবুদা খেতেই ভুলে যায়। ও দিদির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে — দুজনেই চোখে চোখে কথা বলতে থাকে, আমাকে পাত্তাই দেয় না। একদম বাচ্চা মনে করে আমাকে, হিহিহি —

ফেব্রুয়ারি মাস, বাথরুমের জল বেশ ঠান্ডা। বাথরুম থেকে বেরোতেই মা চেঁচিয়ে উঠল, 'রাণু, সোয়েটার পর — বেশ ঠান্ডা আছে। তাড়াতাড়ি পড়তে বোস, আমি খাবার দিচ্ছি। ক্লাস সেভেনে উঠেছিস, পড়ার সময় বাড়াতে হবে। নতুন স্কুলে ফার্স্ট হয়ে দেখিয়ে দে তো মা।'

আমি পড়াশুনোয় মোটামুটি ভালই, গত বছর বেলেঘাটার স্কুলে থার্ড হয়েছিলাম। এখানে এসে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হয়েছি। কিন্তু আমার পড়তে একদম ভাল লাগে না — গল্পের বই পড়তে খুব ভাল লাগে। বাড়ি ভরতি বাবার কত বই — সব উলটেপালটে দেখি।

পড়তে বসলাম — পাশে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ বইটা খুলে —

একদম কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টায় দেবুদা এল। এসেই বলল, 'রাণু, আজ থেকে তোকে বীজগণিত শেখানো শুরু করব। তোদের স্কুলেও দেখবি কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হবে।'

আমি বললাম, 'আগে বিজ্ঞানের এই চ্যাপ্টারটা আর একবার বোঝাও আর এই দুটো পাটিগণিতের অঙ্ক দেখিয়ে দাও, পারছি না — খুব কঠিন।'

দেবুদা খুব ভাল করে চ্যাপ্টারটা বোঝাল আর অঙ্ক দুটো খুব সহজেই করে দিল।

বললাম, 'দেবুদা, তুমি অঙ্কে কী ভাল, আমাকেও তোমার মতো অঙ্কে ভাল করে দাও না —'

দেবুদা — হেঁ হেঁ — কী যে বলিস — অঙ্কে ভাল আর কী দেখলি তুই —

আমি — কেন? তুমি তো অঙ্কে খুবই ভাল, ৮৭ পেয়েছ গত পরীক্ষায় —

দেবুদা — ওরে, অনুরণ অঙ্কে ১০০ পেয়েছে। ওই হচ্ছে আসল 'অঙ্কে ভাল'। আমরা কিছুই না ওর কাছে।

আমি — অনুরণ কে? ওর কথা তো আগে বলোনি কোনওদিন?

দেবুদা — অনুরণ আমাদের ফার্স্ট বয়। কী ভালো ছেলে রে — ও এই জগতেই থাকে না। সবসময় অন্যমনস্ক, সব সময় কিছু একটা যেন ভাবতে থাকে।

আমি — কী ভাবতে থাকে?

দেবুদা — কে জানে? ও অনেক কিছু স্টাডি করে — হয়তো সেগুলোই ভাবে।

আমি — তাই? কিন্তু, আমি তো তোমার সব বন্ধুদেরই চিনি — এ রকম কাউকে তো দেখিনি ?

দেবুদা — তুই নতুন এসেছিস, সবাইকে তো দেখিসনি। অনুরণ বিকেলে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসে — দেখবি কোনদিন —

দিদি খাবার নিয়ে এল। বলল, 'কার কথা হচ্ছে, অনুরণ? মিশনের ফার্স্ট বয়? আমাদের AHM দিদিমণির ছেলে, দেখিসনি রাণু? ওদের বাড়ির সামনে দিয়েই তো আমরা স্কুলে যাই। বেশ লম্বা, কিন্তু একটু বোকা বোকা দেখতে —'

দেবুদা — বোকা বোকা? সোমা, মাথায় তোর কিস্যু নেই — বোকা মেয়ে। আরে, বোকা হলে মিশনে ফার্স্ট হয় ?

দিদি — বোকা তো বলিনি — বোকার মতো দেখতে।

দেবুদা — আর তুই খুব চালাক চালাক দেখতে, তাই না ?

পড়া শেষ হল — আমি রাজসিংহ নিয়ে বসলাম।

বিকেলে বন্ধুরা খেলব, মিঠুকে ডাকতে দেবুদার বাড়ি গেলাম। মিঠু দেবুদার বোন, আমরা একই ক্লাসে পড়ি। ও ড্রেস করছিল — আমাকে দাঁড়াতে বললো।

আমি ওদের পাঁচিলের ধারে এসে দাঁড়ালাম — হাতে একটা লাঠি। আমি রাজসিংহর নির্মলকুমারী হয়ে গেলাম। মানিকলালের সঙ্গে কথা বলতে থাকলাম — লাঠিটা আমার তরোয়াল।

নির্মল — তবে শপথ করো —

মানিক — কি শপথ করিব?

নির্মল — তরবারি ছুঁইয়া শপথ করো যে আমাকে বিবাহ করিবে।

মানিক — যদি আজিকার যুদ্ধে বাঁচি —

পাঁচিলের ওপাশে রাস্তা দিয়ে অনেক লোক আসছে, যাচ্ছে, মাঠে গরু চরছে, বাচ্চারা খেলছে। একটা লম্বা লোক আসছে, সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরা — লোকটা মাঠে নেমে পড়ল — শর্টকাট করছে। সোজা যেন আমার দিকেই আসছে, কোনওদিন দেখিনি লোকটাকে।

লোক নয়, একটা ছেলে। ছেলেটা কোনওদিকে তাকাচ্ছে না — গরুগুলো চরছে, ও তাদের ভিতর দিয়েই চলে এল, দু একটা গরুকে একটু হাত দিয়ে আদরও করল। ওর মধ্যে দুটো গরু খুব রাগি, আমি জানি — কিন্তু, গরুগুলো ওকে কিছু বলল না। ও এখন একদম আমার সামনে এসে গেছে। ভাবুক চোখের একটা লম্বা ছেলে, মাথার চুল এলোমেলো। ও আমাকে দেখতেই পেল না — আমিও যেন ওই গরুগুলোর মতোই একটা প্রাণী। আমি যে একটা সুন্দরী মেয়ে — সব লোক — ছেলে, বুড়ো, বাবা কাকার বয়সি — সবাই আমাকে দ্যাখে, কথা বলতে চায় — কেন চায়, ভালই বুঝি — হিহিহি — কিন্তু এই ছেলেটা আমাকে দেখতেই পেল না?

ও বাবা, ও তো এই বাড়িতেই ঢুকে পড়ল। হঠাৎ আমার মনে হল, এ সেই অনুরণ নয় তো? সব মিলে যাচ্ছে — এই সেই ফার্স্ট বয়? আমার একটা অদ্ভুত ভয় — না না, ভয় নয়, একটা ভাললাগার ভাব হতে লাগল। হ্যাঁ, এই হচ্ছে হিরো, রাজকুমার — আজই সকালে স্বপ্নে রাজকুমারকে দেখেছি, সাদা পোষাক পরা — ওরও তো সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি —

ও হঠাৎ আমাকে দেখল — আর বলে উঠল, 'এই, তুই কে রে?'

কী গম্ভীর গলা — আমি কথা বলব কী, আমার গলা শুকিয়ে কাঠ – কিছু বলতে পারলাম না।

ও আবার বলল, ‘কী রে? দেবুকে ডেকে দে তো, তুই কি দেবুর কোনও আত্মীয়? তোকে আগে দেখিনি তো?’

আমার পা কাঁপছিল, এক বিচিত্র অনুভুতি হতে শুরু করল। ওর দিকে ঘুরে তাকাতে পারলাম না। এ রকম হচ্ছে কেন? এত স্মার্ট মেয়ে আমি, বেলেঘাটা থেকে এই গ্রামে এসেছি — ভয় কী? হঠাৎ মনে হল ও তো অনুরণ নাও হতে পারে।

আমি বলে ফেললাম, ‘তুমি কে ?’

ও বলল, ‘দেবুকে গিয়ে বল যে অনুরণ এসেছে।’

ওঃ, যা ভেবেছিলাম, তাই হল?

আমি মৃদু হেসে ওর দিকে ফিরলাম। ও সোজা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কী মায়াময় দৃষ্টি, কী গভীর সেই চোখ। কিন্তু একটু যেন বিষন্ন সেই দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি যেন সম্মোহিত করে দিচ্ছে আমাকে — বিপদ, খুব বিপদ। তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিলাম, কথা বলতে শুরু করলাম।

- তোমার কথা দেবুদার কাছে শুনেছি। আমি রাণু, ভাল নাম ঝিলিক বসু, ক্লাস সিক্সে পড়ি। এখানে নতুন এসেছি, আগে বেলেঘাটা থাকতাম।

কী যে সব উলটোপালটা বলছিলাম — ক্লাস সেভেনে উঠে গেছি, সেটাই মনে নেই।

অনুরণ বলল, ‘দেবু তোর কে হয়? তুই কি এই বাড়িতেই থাকিস?’

আমি কথা বলতে পারছিলাম না — কোনওরকমে বললাম, ‘দেবুদার বোন, মিঠু, আমার বন্ধু। আমরা এক ক্লাসেই পড়ি। আমি পাশের বাড়িতে থাকি।’

এই বলে এক দৌড়ে বাড়ির ভেতর চলে গেলাম। যেন পালিয়ে বাঁচলাম। আমার এরকম কেন হচ্ছে? দেবুদাকে গিয়ে বললাম, ‘দেবুদা, তোমার ফার্স্ট বয় এসে গেছে, তোমাকে ডাকছে।’

দেবুদা বেরিয়ে এল, আমি আর মিঠুও বেরিয়ে এলাম — দৌড়ে মাঠে চলে গেলাম। অনুরণ একবারও আমার দিকে ফিরে তাকাল না। একটু রাগই হচ্ছিল, হেঁ হেঁ —

নির্মলকুমারী হলে এখন কী করত ?

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে পড়তে বসলাম। কিন্তু, অনুরণের মুখটা মনে আসছে কেন? ও আমাকে ফিরে দেখলই না — কেন? ছেলেটা একটু অদ্ভুত — অন্য রকম। এত গম্ভীর, দুঃখি দুঃখি ভাব কেন? এই বয়সে ওর কী এমন দুঃখ? জানতে হবে। কাল স্কুলে যাওয়ার সময় ওদের বাড়িটা দেখব ভাল করে।

পরদিন স্কুলে যাওয়ার সময় দেখলাম ও ওদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে এগিয়ে এল — দিদিও ছিল আমার সঙ্গে।

ও বলে উঠল, ‘কী রে রাণু, তুই এই স্কুলে পড়িস?’

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, এই বছর ভরতি হয়েছি।’

দিদি একটু হাসল, ভদ্রতার হাসি, বললো, ‘তুমি AHM দিদিমনির ছেলে না ?’

অনুরণও হাসল, বলল, ‘হ্যাঁ, তুমি সোমা তো? দেবু তোমার কথা বলে।’

অনুরণ আমার দিকে হাসিমুখে তাকাল, বলল, ‘রাণু, তোর কোন সেকশন ?’

আমি বললাম, 'ক্লাস সেভেন, বি সেকশন।'

ও খুব অবাক হয়ে গিয়ে বলল, 'সে কী রে? তুই যে কাল বললি সিক্সে পড়িস? আর আজ সেভেন হয়ে গেল? হা হা হা—'

আমি একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম, বললাম, 'হ্যাঁ, সেভেনে উঠেছি। কাল ভুলে সিক্স বলে ফেলেছিলাম।'

ও আবার হাসল, প্রাণখোলা হাসি — আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

ও হাসতে হাসতেই বললো, 'তোর নাম রাণু তো? না সেটাও ভুল বলেছিলি? হা হা —'

দিদি আমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এল, 'হেঁ হেঁ, অনুরণ, ও একদম বাচ্চা, কী বলতে কী বলেছে।'

সেই সময় AHM দিদিমণি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন, বললেন, 'অনু, স্কুলে যাওয়ার সময় ইলেকট্রিক বিলটা নিয়ে যাস— টাকা রেডি করা আছে।'

উনি আমাদের দেখলেন, কে কোন ক্লাসে পড়ে জিগ্যেস করলেন, আমাদের সঙ্গে গল্প করতে থাকলেন, আমরা একসঙ্গে স্কুলে চলে গেলাম।

অনুরণ — অনু — অনুদা —

তখন কি ছাই বুঝতে পেরেছিলাম, আর ৮/৯ বছর বাদে এই অনুদা আমার চিরসখা, আমার প্রাণেশ্বর, আমার স্বামী হবে?

পাঁচ

অনুরণের কথা

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে বইপত্র রাখছি, মা এসে বললেন, 'অনু, আজ সন্ধেবেলা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিস, তোর সঙ্গে কথা আছে। হাত মুখ ধুয়ে নে, খাবার দিচ্ছি।'

মা চলে গেলেন, আমি একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম — কে জানে, মা কী বলবেন, কোনওদিন তো এমনভাবে বলেন না? তবে কি সকালে রাস্তায় রাণুদের সঙ্গে কথা বলেছি বলে মা রাগ করেছেন ?

সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরলাম — মা আমার ঘরে এলেন।

'অনু, তোকে একটা কথা বলি।' মা বলতে থাকলেন, 'আজ পর্যন্ত তোকে পড়া নিয়ে কোনওদিন কিছু বলিনি। এখন ক্লাস নাইন হল, এখন তোর আসল পড়াশুনো শুরু হবে। HS এর প্রিপারেশন ক্লাস নাইন থেকেই নিতে হবে। পড়ার সময় বাড়াতে হবে, গল্পের বই পড়া বন্ধ কর। আমাকে একজন বলল, তুই নাকি ক্লাসে গল্পের বই পড়িস? ব্যাপারটা কী? তুই কি আমাকে দুঃখ দিতে চাস?'

আমি – না না মা, তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। ঠিক আছে, এখন থেকে বাইরের বই পড়া কমিয়ে দেব।

মা — ঝিলিক মেয়েটা বেশ ভাল। পড়াশুনোয় মাথা আছে। তুই কি ওকে আগে থেকেই চিনিস ?

আমি — (খুব তাড়াতাড়ি) না না, কালই দেবুর বাড়িতে ওকে প্রথম দেখলাম। ও আগে বেলেঘাটা থাকত, এ বছর এখানে এসে তোমার স্কুলে ভরতি হয়েছে। এখন থেকে এখানেই থাকবে।

একটু হেসে মা বললেন, 'বাব্বা, এর মধ্যেই এত খবর জেনে গেছিস? মেয়েটা ইংলিশ ভালই লেখে, কিন্তু অনেক বানান ভুল করে, একটু দেখতে হবে। আজ ক্লাসের রুটিন ফাইনাল করা হল — আমিই ওদের ক্লাস টিচার হলাম। মেয়েটাকে দেখব—'

মা তো নিজেই রুটিন বানায় — রাণুদের ক্লাসটিচার কেন হল?

মা আরও বললেন, 'দ্যাখ, তোকে বলতে চাইছিলাম না। তুই এখন বড় হয়েছিস — বলে দেওয়া ভালো। রাস্তায় কোনও মেয়ের সঙ্গে কথা বলবি না — ভাল দেখায় না। ঝিলিক বা সোমার সঙ্গে গল্প করার ইচ্ছে হলে বাড়িতে ডেকে নিয়ে কথা বলিস।'

মা পাশের ঘরে চলে গেলেন — মার দিকে তাকাতে পারছিলাম না। আমার কান গরম হয়ে গেল, খুবই লজ্জা পেয়ে গেলাম।

কেন এমন হচ্ছে? রাণু একটা বাচ্চা মেয়ে — ওকে নিয়ে মা'র কেন এত চিন্তা? যাক গে —

কিন্তু, মেয়েটা সত্যি দারুণ সুন্দরী আর কী সুন্দর হাসি। ও যখন হাসে, আমার তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছে করে। বেশ ভালই লেগেছে ওকে আমার — কিন্তু, ওর সঙ্গে তো আমার কথা বলার কোনও দরকার নেই —

দিন যায় — দেখতে দেখতে আমি ক্লাস ইলেভেনে উঠে গেলাম। গতানুগতিক ভাবে সময় কাটছে, সেই স্কুল, লাইব্রেরি, বাড়ি, আড্ডা — আর সারাদিন ধরে পড়াশুন — গভীর রাত পর্যন্ত। তবে, গল্পের বইটাই বেশি পড়ি।

ক্লাসে এখনও ফার্স্ট হই, হেঁ হেঁ — অরুণ, কল্যাণ, চয়নরা এখনও আমাকে হারাতে পারেনি।

ক্লাসের সব ছাত্ররাই একাধিক টিচারের কাছে প্রাইভেট কোচিং নেয় — আমি কারও কাছে প্রাইভেট পড়ি না। আমি নিজেই নিজেকে পড়াই। স্কুলে টিচারদের পড়ানো খুব মন দিয়ে শুনি, লাইব্রেরি থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক, অনেক বই আনি, সব বই ঘেঁটে সব বিষয়ের উপর বানানো প্রশ্নের উত্তর বানাই — ঘড়ি ধরে টেস্ট পেপারের প্রশ্নের উত্তর লিখি — ব্যাস্ — আর কোন সাহায্য আমার লাগে না। আর মা তো আছেনই — মা আমার প্রশ্ন, উত্তরগুলো দেখে দেন।

অনেক টিচারই আমাকে পরোক্ষভাবে তাঁদের কাছে প্রাইভেটে পড়তে বলেছেন, আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছি। এতে অনেকেই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, আমাকে অহংকারী ভেবেছেন — আমার কিছু করার নেই।

প্রাইভেট কোচিং কথাটা শুনলেই আমার ছোটবেলার সেই ননিবাবুর কথা মনে পড়ে — মনে পড়ে টিচারদের সেই আদর্শহীনতার কথা। আর মনে পড়ে মা'র সেই আকুল হয়ে কান্নার কথা আর সমগ্র শিক্ষককুলের উপর খুব রাগ হয়। সেই জন্য শিক্ষকদের আমি একটু এড়িয়েই চলি, শিক্ষকরাও মনে হয় সেটা বুঝতে পারেন — অনেকেই আমাকে মনে মনে পছন্দ করেন না।

যাই হোক, কোনও শিক্ষকই এখনও পর্যন্ত আমার সঙ্গে কোনওরকম প্রতিশোধমূলক আচরণ করেননি। বরং সবাই আমাকে আন্তরিকভাবেই সব রকম সাহায্য করেছেন।

প্রিটেস্ট থেকে বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী খাতা দেখা হয় — মিশনের নিয়ম অনুযায়ী নয়। তাই, নম্বর বেশি পেলাম। পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুল — দেখা গেল, আমি রেকর্ড মার্কস পেয়ে প্রথম হয়েছি। আজ পর্যন্ত স্কুলের রেকর্ডে এত নম্বর নাকি কেউ পায়নি। টিচাররা সবাই খুব আশীর্বাদ করলেন, ভালোবাসা জানালেন, বললেন, 'অনুরণ, এভাবে লিখতে পারলে HS-এ তুমি ফার্স্ট হবেই — কেউ আটকাতে পারবে না।'

অথচ এই শিক্ষকেরাই মাস তিনেক পর আমাকে কী দুঃখই না দেবেন —

রাণুর সঙ্গে রোজই দেখা হয়। দেবুর বাড়িতে গেলেই ও কী করে যেন টের পায় — চলে আসে। পাশাপাশি বাড়ি, হয়তো জানালা দিয়ে আমাকে আসতে দেখে। কিন্তু, আমাদের মধ্যে সে রকম কোনও কথা হয় না।

এই মেয়েটিকে দেখলে আমার এক অদ্ভুত অনুভুতি হয়। মনে হয়, ওকে কোথাও যেন আগে দেখেছি, ও যেন আমার অনেক দিনের চেনা — ওর হাসিমুখ, কথার আন্তরিকতা আমার বর্মটাকে খান খান করে ভেঙ্গে দেয় এক মুহূর্তে। রাণুর সঙ্গে খুব কথা বলতে ইচ্ছে হয় — ওর সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালও লাগে।

ও এখন শাড়ি পরে, ক্লাস নাইন হল ওর — বেশ লম্বাও হয়েছে, সাড়ে পাঁচ ফুট তো হবেই — আমি তো প্রায় ছ'ফুট হয়ে গেছি। রাণু পড়াশোনাতেও ভাল হয়েছে, ক্লাসে ফার্স্ট/সেকেন্ড হয়। সিরিয়াস, পড়ুয়া মেয়ে — আবার গানও করে।

রাণু নিজের থেকে আমার সঙ্গে কথা বলে না — আমি কথা বললে ও উত্তর দেয়, ভালভাবেই কথা বলে। কিন্তু, দেবুর বাড়ি একদিন না গেলেই ও পরদিন নিজে থেকে জিগ্যেস করে, 'অনুদা, কাল এলে না কেন ?'

এর মানে কি? আমি ও বাড়িতে গেলে কি রাণু খুশি হয়? দেখে তো বোঝা যায় না —

একবার আমার খুব জ্বর হল, চারদিন স্কুলে যাইনি, দেবুর বাড়িও যাইনি — রাণুর সঙ্গে দেখাও হয়নি। পঞ্চম দিনে, রবিবার ছিল, সকাল দশটার সময় আমার দোতলার ঘরে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছি — হঠাৎ বড়দি এসে আমাকে বলল, 'অনু, দ্যাখ কে এসেছে —'

আমি অবাক হয়ে দেখলাম, রাণু দাঁড়িয়ে আছে — লজ্জায় রাঙা মুখ নিয়ে —

ছয়

রাণুর (ঝিলিক বসু) কথা —

দিন চলে যায় আমি আনমনে — তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী –

এ আমার কী হল? আমি যে সর্বক্ষণ অণুর সেই নিষ্পাপ মুখ, উদাস চোখদুটোই সব জায়গায় দেখছি, সব সময় ওর কথা ভাবছি? এটাই কি প্রেম? কিন্তু অনু তো আমার দিকে তাকিয়েও দ্যাখে না। দেবুদার বাড়িতে অনুর সঙ্গে দেখা হয়, মাঝে মাঝে ও আমার সঙ্গে কথা বলে, গল্প করে — আমার কী ভালই না লাগে।

আচ্ছা, দিদিমণি কেন আমাকে নিয়ে পড়েছেন? সেই ক্লাস সেভেন থেকে দেখছি সব ক্লাসেই উনি আমাদের ক্লাস টিচার হন — কেন? আমার প্রতি দিদিমণির যেন একটা বিশেষ নজর, আলাদা যত্ন — কেন? উনি কি আমার মনটা পড়ে ফেললেন?

অনুদা প্রত্যেকদিন দেবুদার বাড়ি আসে। আমি, 'তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে' — হেঁ হেঁ। রবীন্দ্রনাথ যেন আমার মনের কথাই লিখে গেছেন। যেই জানালা দিয়ে দেখি অনুদা আসছে, আমি এক দৌড়ে ওদের বাড়ি চলে যাই। ওর সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু কাছে গিয়ে একটা কথাও বলতে পারি না — ও কথা বললে আমি বলি। দেবুদা, মিঠু, অনুদা আর আমি — আমরা চারজন প্রায়ই ক্যারাম খেলি, কোনও কোনওদিন অনুদা আমার পার্টনার হয়। ইসস — সত্যি যদি —

কিন্তু, অনুদাকে আর দেখছি না কেন? কোথায় গেল? মাত্র দু'তিনদিন হল — মনে হচ্ছে কতদিন অনুদাকে দেখছি না।

স্কুলে যাওয়ার সময় অনুর বাড়ির দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে দেখছিলাম, যদি ওকে দেখতে পাই। গত তিনদিন ধরে ওর কোন খবর নেই — স্কুলেও যাচ্ছে না, আজ হয়তো যাবে। হয়তো আজ বিকেলে দেবুদার বাড়ি আসবে — উফ, আমি যে কী করি?

মিঠু আমার সঙ্গে ছিল। আমার রকমসকম দেখে ও হেসে উঠল, বলল, 'তুই মরেছিস।'

আমি — জানিস, অনু আজ তিনদিন স্কুলে যায়নি — কী যে হল ওর।

মিঠু — তুই কী করে জানলি ?

আমি — তোর দাদাকে জিগ্যেস করেছিলাম — লজ্জার মাথা খেয়ে। দেবুদা তো একচোট হেসে নিল, বললো, 'হা হা — বিরহ? ভাল, ভাল। শোন, অনু অনেকদিন স্কুলে আসছে না। দেখি, আমি আজ খোঁজ নেব।'

মিঠু — রাণু, তুই কী করছিস? অনুদা কত ভাল ছেলে, জিনিয়াস, ব্রিলিয়ান্ট — কোথায় চলে যাবে — ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবে, বিদেশেও চলে যেতে পারে। আর তুই, একটা গ্রামের স্কুলের গেঁয়ো মেয়ে — অনুদার কথা মন থেকে মুছে ফেল বন্ধু— পরে কাঁদতে হবে।

আমি — ধুস, আমি কি সেভাবে ভাবি নাকি? ছেলেটার কী হল সেটাই ভাবছি। কাল ওদের বাড়ি যাব? খোঁজ নিতে?

মিঠু — নাঃ, তুই একেবারে গেছিস। যা খুশি কর, কী দুঃসাহস — আমি নেই বাবা।

বিকেলে দেবুদার বাড়িতে অনু আসেনি, শুনলাম স্কুলেও যায়নি। আজ চার দিন হল ওর কোনও খবর নেই। নাঃ, আগামীকাল রবিবার – ঠিক করলাম ওদের বাড়ি যাব।

রবিবার সকালে সাহস করে অনুর বাড়ি গেলাম। কলিং বেল টিপলাম, অনুর ছোড়দি, সোনালিদি বেরিয়ে এল। আমাকে দেখে খুব অবাক হয়ে গেল, বলল —

- কীরে, রাণু, আয় আয় — অনুর তো আজ কয়েকদিন হল খুব জ্বর, স্কুলে যাচ্ছে না। তুই কি অনুর খোঁজ নিতে এসেছিস?

- না সোনালিদি, আমি রূপাদির (অনুর বড়দি) কাছে এসেছি — গান শেখার কথা বলতে।

- তাই নাকি? হিহিহি — চল, ঘরে চল —

সোনালিদি আমাকে ওদের বড় ঘরে নিয়ে এল। রূপাদি, ওদের বাবা, দিদিমণি — সবাই আছেন। আমার তো গলা শুকিয়ে গেল, হাত পা ভয়ে ঠান্ডা হয়ে গেল। ওঁরা সবাই জলখাবার খাচ্ছিলেন — দই মুড়িমাখা আর দুটো বড় প্লেটে টুকরো করে রাখা অনেক আম।

দিদিমণি বললেন, 'এসো, ঝিলিক, প্রথমে কিছু খেয়ে নাও – সকালে খেয়েছ ?'

আমি — না না — আমি খেয়ে এসেছি।

রূপাদি — তাহলে আম খা — কী মিষ্টি খেয়ে দ্যাখ।

আমি — না গো, আম আমার ভাল লাগে না।

অনুর বাবা বললেন, আম ভাল লাগে না? তবে তোমার কোন ফল খেতে ভাল লাগে ?

আমি — আমি লিচু খেতে খুব ভালবাসি।

হঠাৎ মনে পড়ল, অনুর বাবার সঙ্গে এই প্রথম কথা বলছি। আমি উঠে ওঁকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম, দিদিমণিকে আর দুই দিদিকেও প্রণাম করলাম। ওঁরা সবাই 'থাক থাক' বলে আমার মাথায় হাত রেখে আদর করলেন, আমার সব ভয় চলে গেল। কী ভাল লোক ওঁরা — আমাকে ওঁরা আপন করে নিলেন।

সোনালিদি বললো, 'দিদি, চল আমরা তোর ঘরে যাই।'

আমরা রূপাদির ঘরে গেলাম, বেশ বড় ঘর, ঘরে একটা পড়ার টেবিল, চেয়ার আর একটা বড় খাট। আর তবলা, হারমোনিয়াম, তানপুরা — সব পরিপাটি করে সাজানো। আমরা খাটে বসলাম।

সোনালিদি বলল, 'দিদি, রাণু তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে — অনুর খোঁজ নিতে আসেনি।'

রূপাদি — তাই নাকি? তা বল রাণু, কী বলবি? অনুর সঙ্গে তোর রোজ দেখা হয়?

আমি — না না। অনুদা বিকেলে দেবুদার বাড়ি যায়, আমাদের পাশের বাড়ি — দেখতে পাই।

লজ্জায় আমার গলা বুজে আসছিল, কিন্তু দুই বোন খুব গম্ভীরভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছিল। ওরা আমাকে নিয়ে মজা করছে না তো?

রূপাদি — এবার বল কী বলবি ?

আমি — রূপাদি, তুমি আমাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাবে ?

রূপাদি — আমি তো কাউকে গান শেখাই না রে। তুই গাইতে পারিস? গলায় সুর আছে? একটা গান চার লাইন কর তো শুনি —

আমি — এখন?

রূপাদি — হ্যাঁ, ভয় পাচ্ছিস ? তুই তো খুব সাহসী মেয়ে। চার দিন দেখা হয়নি, একেবারে অনুদার বাড়ি চলে এলি খোঁজ নিতে — হিহিহি। কর, একটা গান কর, লজ্জা পাস না, বোন —

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম, তারপর আস্তে আস্তে খালি গলায় গান ধরলাম, 'তাই তোমার আনন্দ আমার পর'—

দুই বোন খুব মন দিয়ে গানটা শুনে গেল।

রূপাদি বলল, 'শোন, তুই তো বাংলায় ভালই — তুই পারবি। রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালোভাবে মানে বুঝে গাইতে হয়। তোকে অনেক গলা সাধতে হবে, গলার কোয়ালিটি খুব ভাল, সুরও ভালই আছে — তোকে আমি শেখাব।'

আমার মুখ খুশিতে ভরে গেল — আমি হাসলাম।

সোনালিদি বলে উঠল, 'বাঃ, তোর হাসিটা কী সুন্দর রে, যেন মুক্তো ঝরে পরছে। এই হাসি দেখেই কি আমার ভাইটা—? হিহি—'

দুই বোন একসঙ্গে জোরে হেসে উঠল — বুঝলাম, ওরা প্রথম থেকেই আমাকে নিয়ে মজা করছিল।

রূপাদি বলল, 'রাণু, তোকে আমি যা জানি সব শেখাব। আমার কথামতো রোজ রেওয়াজ করবি, ভালই গাইতে পারবি। তুই আমার ভাইয়ের বন্ধু, সেজন্যই তোকে আমি শেখাব। জানিস, আমার ভাইটা দেবশিশুর মতো সরল, ওর কত বন্ধু— কিন্তু কেউ ওর কাছের বন্ধু নয়। এই যে চারদিন ও বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে না, একটা বন্ধুও ওর খোঁজ নিতে আসেনি। তোর দেবুদাও আসেনি। অথচ, সবাইকে অনু কী ভালই না বাসে। তুই এসেছিস দেখে ও খুব খুশি হবে।'

সোনালিদি বলল, 'রাণু, তোর সাহস দেখে আমরা অবাক হয়ে গেছি। দিদিমণির বাড়ি, বাড়ি ভরতি লোক — তাও তুই বন্ধুর খোঁজ নিতে এখানে আসতে ভয় পেলি না। তুই সত্যি অনুর ভাল বন্ধু।'

রূপাদি বলল, 'রাণু চল, আমরা দোতলায় অনুর ঘরে যাই।'

আমরা অনুর ঘরে গেলাম। রূপাদি অনুকে ডেকে বলল, 'অনু, অনু, দ্যাখ কে এসেছে—'

অনু একটা খাটে শুয়ে বই পড়ছিল — আমাদের দেখে একদম হাঁ হয়ে গেল। আমার দিক থেকে ওর চোখ আর সরছিলই না। বুঝলাম, ও খুবই খুশি হয়েছে। একরাশ লজ্জা আমার কোথা থেকে যে এল — কোনওরকমে বললাম, 'আমি রূপাদির কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখব, তাই কথা বলতে এসেছি।'

রূপাদি বলল, 'তোরা কথা বল, আমি একটু আসছি — রান্নাঘর থেকে—' রূপাদি চলে গেল।

আমি বলে উঠলাম, 'অনুদা, তোমার জ্বর হয়েছে? কী করে বাধালে? এখনও জ্বর আছে?'

অনু — সামান্য, ৯৯ হবে। তুই বড়দির কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখ ভাল করে। ও খুব ভাল গায়, অশোকতরুর কাছে শেখে। আমিই তো নিয়ে যাই — সেই বিডন স্ট্রিটে, হেদোর কাছে। আমি বারান্দায় বসে থাকি, ঘরে মেয়েরা গান শেখে — শুনে শুনে আমারও গানগুলো শেখা হয়ে যায়।

আমি — তুমি গানগুলো জানো? সবগুলো গান?

অনু - ওই আর কী — গীতবিতান দেখে গাইতে পারব মনে হয় -

আমি — বাঃ, একদিন তোমার গান শুনব। তোমাদের বাড়ির সবাই গান জানো — কী সুন্দর।

অনু — তিন চার দিন দেখা হচ্ছে না — এইজন্য কি তুই আমার খোঁজ নিতে এসেছিস? না কি সত্যি বড়দির কাছে এসেছিস?

আমি — (জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে) অনুদা, তোমাদের ওই আমগাছটায় আম হয় না?

অনু — হ্যাঁ হয়। তুই বললি না তো? বল না — আমার খোঁজ নিতে এসেছিস?

আমি — আমি যাই, অনুদা — ভাল থেকো।

অনুদার দিকে তাকিয়ে একমুখ হাসলাম, চলে এলাম — অনুদা হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

ভাগ্যিস সাহস করে এসেছিলাম — এখন থেকে এ বাড়িতে আমার অবাধ প্রবেশ — হিহিহি। কিন্তু অনুদা তো কিছুই বলল না। দিদি কোথায় গান শিখতে যায়, এসব কথাই বলে গেল। আচ্ছা ও কি কোনওদিন বলবে, 'রাণু, আমি তোমায়

ভালোবাসি ?’ কী ভাবে বলবে? আমার হাত ধরে বলবে? কবে বলবে? ধুস, ও তো ভাল করে আমার দিকে তাকিয়েই দ্যাখে না —

যেন আকাশে উড়তে উড়তে বাড়ি ফিরে এলাম। অনু আমাকে দেখে খুশি হয়েছে, আমাকে ওর ভাল লাগে, এটা বুঝেছি। কিন্তু, মিঠু যে বলল অনুকে ভুলে যেতে? পারব কি? পরে নাকি দুঃখ পেতে হবে? তাহলে কি করব এখন আমি?

পুজোর ছুটি পড়ে গেল, কি মজা। তবে, পুজোর পরেই ফাইনাল পরীক্ষার চাপ আসবে – ধুর, ভাল লাগে না।

রূপাদির কাছে গান শিখছি, রবিবার বিকেলে যাই — অনুর সঙ্গে কোনওদিন দেখা হয়, কোনওদিন হয় না। ও এবার পুজো নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত — পুজোর মিটিং, চাঁদা তোলা, কুমোরটুলিতে ঠাকুরের অর্ডার দেওয়া, স্যুভেনিরের বিজ্ঞাপন তোলা — কত কাজ — সবেতেই ও আছে। ওকে সবাই চেনে, ভাল ছেলে বলে ওকে সবাই ভালবাসে, ও গিয়ে দাঁড়ালে সবাই এক কথায় চাঁদা দিয়ে দেয়। তাই, পাড়ার বড়রা ওকে এবার পুজোর সব কাজে জড়িয়ে নিয়েছে।

সপ্তমী পুজো — পুজোর প্যান্ডেলের সামনে অনেক চেয়ার রাখা — সন্ধেবেলা অনেক মেয়ে, বউ ওখানে বসে আছে, সন্ধ্যারতি দেখছে। মিঠু আর আমিও ওখানে বসে আছি। চারিদিকে ভিড় করে ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে — ঠাকুর দেখছে, আরতি দেখছে — আবার মেয়েও দেখছে, হেঁ হেঁ —

অনুকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ মিঠু আমাকে খোঁচা মারল —

আমি বললাম, ‘কী রে ?’

মিঠু — তোকে কীভাবে দেখছে রে —

আমি — কে দেখছে?

মিঠু — তোর প্রাণেশ্বর — তোর ডানদিকে তাকিয়ে দ্যাখ — হি হি —

আমি — যাঃ, হতেই পারে না —

আমি হাতের পার্সটা নীচে ফেলে দিলাম। তারপর ওটাকে তুলে নেওয়ার সময় আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, অনু এক দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে, মুগ্ধ দৃষ্টি, কোনওদিকে যেন ওর খেয়াল নেই। ওকে এরকম করতে আগে তো কোনওদিন দেখিনি। আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল — একটা অদ্ভুত ভাললাগার ঢেউ যেন শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে।

মিঠু হাসতে হাসতে বলল, ‘যাক, অনুদা এতদিনে তোকে দেখল। বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করলি, মেনকা। ওঃ, আজ তোকে কিন্তু সাংঘাতিক সুন্দরী লাগছে রে, যেন শাপগ্রস্ত স্বর্গভ্রষ্ট অপ্সরা, হিহিহি—।’

আমরা আরও কিছুক্ষণ বসে থাকলাম — অনু ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। একবার বন্ধুরা এসে ডাকল, ও হাত নেড়ে ওদের চলে যেতে বলল — আমাকে দেখেই গেল।

এরপর থেকে আমি আর অনুদার দিকে তাকাতেই পারতাম না। কী যে এক লজ্জা এসে আমায় দখল করল — অনুদাও আমার দিকে আগের মতো স্বাভাবিকভাবে তাকাতে পারত না। দেবুদার বাড়ি আমাদের রোজই দেখা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনও কথা নেই। দুজনেই যেন অপেক্ষা করছি — কীসের অপেক্ষা ?

পাড়ার অনেক ছেলে আমাকে খুব পছন্দ করত। আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করত। কিন্তু সবাইকেই আমার অনুর তুলনায় একদম তুচ্ছ মনে হত। তাই কারও দিকেই আমি তাকাতাম না। কথা বলার তো প্রশ্নই নেই। অতি উৎসাহী বেশ

কিছু ছেলে ক্লাসের বন্ধুদের মাধ্যমে আমাকে 'চিঠি' পাঠাত — প্রেমপত্র। মিথ্যে বলব না, চিঠিগুলো পড়তে বেশ ভালই লাগত। সব ক'টা চিঠিই পড়তাম — পড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিতাম।

কিন্তু, সুনীল বলে একটা ছেলে, অনুরই বন্ধু — সে ছিনে জোঁকের মত আমার পেছনে লাগত। আমার পিছু নিত, স্কুল থেকে বাড়ি পর্যন্ত ফলো করত, আমার বন্ধুদের মাধ্যমে আমাকে প্রেমের কথা জানাত। ব্যাপারটা আস্তে আস্তে আমার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। এটা কাউকে বলতে হবে — কাকে বলব? বাবাকে? মাকে? নাঃ, ওদের বলা যাবে না —

একদিন সুনীল আমাকে একটা চিঠি পাঠাল — ওর প্রথম প্রেমপত্র। বাজে ভাষা, গুরুচণ্ডালী দোষ, বানান ভুলে ভরা — আমার খুব রাগ হল।

দেবুদার বাড়ি এলাম, মিঠু আসবে — আমি বসে বসে কী করব তাই ভাবছি। সুনীলের চিঠির ব্যাপারটা দেবুদাকেই বলি।

অনু এল — অনেকদিন পর নিজে থেকেই কথা বলল —

- কী রে রাণু ? কী হয়েছে, মুখ ভার করে বসে আছিস? কী ভাবছিস ?

আমি দুম করে অনুকেই সুনীলের চিঠির কথাটা বলে বসলাম —

- জানো, তোমার বন্ধু সুনীল আমাকে চিঠি দিয়েছে — প্রেমপত্র।

ও খুব অবাক হয়ে গেল, বলল, 'ওঃ, তো আমাকে বলছিস কেন?'

আমার খুব রাগ হল। তোমাকে বলব না তো কাকে বলব? কী অবুঝ ছেলে রে বাবা। আমি চুপ করে বসে রইলাম। ও আবার বলতে লাগল —

- আমাকে কী করতে বলছিস? আমি কি তোর জবাবের চিঠি ওকে পৌঁছে দেব?

আমার এতো রাগ হল, আমার চোখে জল এসে গেল। রাগে ফেটে পড়লাম। কিছু করতে পারছি না, এই অক্ষমতার জন্যই রাগ হচ্ছে — আর রাগটা অনুর উপর গিয়ে পড়ল। বলে উঠলাম, 'মূর্খ কোথাকার, এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ফার্স্ট হও?' বলেই আমি উঠে পড়লাম, বাড়ি যাব।

ও থতমত খেয়ে গেল, একদম বাচ্চা ছেলে একটা, হিহি — রাগের মধ্যেও আমার হাসি পেয়ে গেল।

হঠাৎ ও হা হা করে হেসে উঠল, বলল, 'ওঃ, এই ব্যাপার? আমি সত্যি খুব বোকা রে, একদম বুঝতে পারিনি। তুই চলে যাস না। রাগ করিস না প্লিজ। রাণু, তোকে আমার খুব ভাল লাগে।'

আমার দু'কান যেন সার্থক হয়ে গেল। নিজের অজান্তেই বলে ফেললাম, 'তা আমাকে কী করতে হবে?'

অনু বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল, মুখে কোন কথা নেই। আমি আর থাকতে পারলাম না। একমুখ হাসি নিয়ে প্রায় দৌড়েই বাড়ি চলে এলাম।

অনুর কথাগুলো যেন আমার কানে মধু ঢেলে দিল — রাণু, তোকে আমার খুব ভাল লাগে — রাণু, তোকে আমার খুব ভালো লাগে — রাণু, তোকে আমার খুব ভাল লাগে — সারাক্ষণ কথাগুলো যেন কানে বাজতেই থাকল।

আমাদের পাড়ার একদম শেষে, পুব দিকে ছিল এক বিরাট মাঠ, ধানক্ষেত, বিল, খাল। সেই মাঠকে আমরা বলতাম বড়মাঠ, বৃন্দাবন হিহিহি —। বিকেলে আশেপাশের পাড়ার যত প্রেমিক ছেলেমেয়েরা ওখানে জোড়ায় জোড়ায় বসে গল্প করত। একটু সাহসীরা সন্ধের পরেও সেখানে থেকে যেত।

পরদিন দেবুদার বাড়িতে অনু আমাকে ডেকে বলল, 'সুনীল আর তোকে বিরক্ত করবে না — আমি বলে দিয়েছি।'

- কী বলে দিয়েছ?

- বলেছি, রাণু এনগেজড — ওকে বিরক্ত করবি না।

- আমি আবার কার সঙ্গে এনগেজড হ'লাম?

- হেঁ হেঁ — সেটাও সুনীলকে বলে দিয়েছি — ও শুনে খুব দমে গেল হা হা হা —

আমি খুব লজ্জা পেয়ে গেলাম, বুঝতে পারছি, কান লাল হয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রেমের পথের যাত্রা কি শুরু হল? এভাবেই শুরু হয় ?

অনু বলল, 'রাণু, তোর সঙ্গে আমার খুউব গল্প করতে ইচ্ছে হয়।'

বললাম, 'আমরা তো গল্প করিই — এখানে বা তোমার বাড়িতে।'

– না না, এখানে নয়। একটা কথা বলি? রাগ করবি না তো?

– না, রাগ করব না — বলো?

– চল না একদিন আমরা বিকেলে বড়মাঠে যাই — ওখানে বসে গল্প করি?

– বৃন্দাবনে?

বলেই আমি হেসে ফেললাম — ও হাঁ করে আমাকে দেখতে থাকল। আমি হাসলেই ও এমন করে আমাকে দেখতে থাকে – আগে লজ্জা লাগত, এখন দেখছি বেশ ভালই লাগে ওর এই দৃষ্টির আরতি।

আমি বললাম, 'কিন্তু, ওখানে চেনা কেউ যদি দেখে ফেলে? আমার বাবাকে বলে দেবে —'

– কেউ দেখবে না। আমরা একদম দক্ষিণ দিকটায় যাব। ওদিকে কেউ যায় না।

– তুমি কী করে জানলে? আগে অন্য কোনও মেয়েকে নিয়ে গেছ ওখানে?

– কী যে বলিস — তুই ছাড়া অন্য কোনও মেয়ের দিকে আমি দেখিই না — কথা বলা তো অনেক দূরের ব্যাপার।

এক বিকেলে, অস্তগামী সূর্যকে সাক্ষী রেখে আমরা বড়োমাঠে গিয়ে বসলাম। সামনে একটা চওড়া খাল, সেটা দিয়ে দূরের বিলটা গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত — খাল দিয়ে জেলেদের নৌকো চলে।

আমরা নানা বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম, পড়ার বিষয়, আমার গান, অনুর সামনের টেস্ট পরীক্ষা — অনেক বিষয় — কিন্তু, প্রেমের কোনও কথা আর হয়ই না, হেঁ হেঁ।

একটা অদ্ভুত ভাললাগায় আমি যেন বিভোর ছিলাম। এই প্রথম প্রিয় মানুষটির এত কাছে এসেছি আমি — নিষিদ্ধের প্রতি আকর্ষণ, বাবা মা-র ভয়, লোকলজ্জার ভয় আবার অনুর প্রতি তীব্র টান – সব মিলিয়ে আমি যেন তখন স্বপ্নরাজ্যে।

অনু উশখুশ করছিল — কিছু একটা বলতে চাইছে, যেন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। হঠাৎ ও কথা বলতে শুরু করল — মৃদুস্বরে, কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে ও বলে চলল — আমি তন্ময় হয়ে শুনতে থাকলাম।

-"রাণু জানিস, আমার ছোটবেলার কথা — আমাদের বাড়িটা আশেপাশের বাড়ির চেয়ে অনেক উঁচু ছিল — বন্যার সময় আমাদের বাড়িতে জল উঠত না। তাই, সব সরকারি বন্যাত্রাণের জিনিস আমাদের একটা ঘরে রাখা থাকত।

"তখনও আমি স্কুলে ভর্তি হইনি, বন্যা চলছে, একদিন সকালে দেখি বাবা চা খাচ্ছেন আর মাকে গজগজ করে রাগ দেখাচ্ছেন, 'দুধ নেই তো জানি, চিনিও নেই? আমাকে বলতে পারোনি? যেখান থেকে হোক জোগাড় করতাম। এভাবে চা খাওয়া যায়?'

“মা কিছু বলছেন না, চুপ করে চা খেয়ে যাচ্ছেন। আমি বাবাকে বললাম, ‘বাবা, ঐ ঘরেই তো কত চিনির বস্তা আর দুধের টিন আছে — বন্যাত্রাণের—?’

“বাবা বললেন, ‘ও তো পরের জিনিস, অনু। কোনওদিন পরের জিনিস না বলে নিবি না। আর কোনওদিন কারো কাছে কিছু চাইবি না —’ বাবা মা আরও ১৫-২০ দিন চিনি দুধ ছাড়া সেই চা খেয়ে গেলেন, পাশের ঘরে বস্তাভরতি টিন ভরতি দুধ, চিনি থাকা সত্ত্বেও।

“এই ব্যাপারটা দ্যাখ, আমার এখনও মনে আছে, সারাজীবন মনে থাকবে। বাবার ওই কথাগুলোও মনে থাকবে, সেগুলো মেনে চলার চেষ্টা করি। আমিও কোনওদিন কারও কাছে কিছু চাইনি রে, কিন্তু আজ তোর কাছে আমি কিছু চাইব, তুই আমাকে দিবি?”

আমি জানি, অনু আমার কাছে কী চাইবে, আমার অন্তরাত্মা জানে ও কী চাইবে। ওর প্রার্থনা শোনার জন্য আমি আকুল হয়ে উঠলাম — এভাবে চাইলে কি না দিয়ে থাকা যায়?

আমি বলে উঠলাম, ‘কী চাও গো তুমি? তোমায় কী দেব গো অনু ?’

অনু বলল, ‘আমি তোমায় ভালোবাসি, রাণু — তোমার সঙ্গে আমার বাকি জীবনটা কাটাতে চাই। সুখে, দুঃখে একসাথে আমরা এই জীবনসমুদ্রে পাড়ি দিতে চাই। তুমি কি আমার সঙ্গী হ’বে?’

আমি কোনও কথা বলতে পারলাম না। মাথা নীচু করে বসে রইলাম। সারা পৃথিবী যেন থেমে গেছে। এই পবিত্র মানুষটি আমাকে কামনা করছে — আমি ধন্য হয়ে গেলাম। অনু আমার হাতদুটো নিজের হাতে নিয়ে নিল, আস্তে আস্তে আমার হাতদুটো মুখের কাছে নিয়ে চুমু খেলো, বলল —

- বলো, রাণু — তুমি এখনও কিছু বলোনি —

- কী বলব? তুমি কি বোঝোনা, অনু ? চলো, বাড়ি যাই — সন্ধে হয়ে আসছে —

- না বুঝি না, আমি তো মূর্খ, তুমিই বলেছিলে, হাহা —। প্লিজ, বলো রাণু, আমার শুনতে ভাল লাগত।

- অনু, প্লিজ, বাড়ি চলো — আমার ভয় করছে। তোমাকে আমার কাছে আর কোনওদিন কিছু চাইতে হবে না। তুমি আজ সব চাওয়া চেয়ে নিলে। আমি তোমার আগামী সব চাওয়া তোমার মুখ দেখেই বুঝে নেব, তুমি চাওয়ার আগেই তা তোমাকে এনে দেব — সারা জীবন।

কখন যে ওকে নাম ধরে ডাকতে শুরু করেছি, বুঝতেই পারিনি। অনু খুব খুশি হল — আমার হাত ধরেই থাকল। ও খুব আবেগপ্রবণ — আমার ভয় করছিল, ও আবেগের বশে কিছু করে না বসে — আবার মনে মনে চাইছিলামও ও যেন কিছু করে — হিহিহি —

আমরা বাড়ি চলে এলাম। আমরা এটা কী করে ফেললাম ?

রাতে বিছানায় শুয়ে ভেবেই যাচ্ছি — আজ থেকে আমি আর স্বাধীন নই — আজ থেকে আমি অনুর। কী ভাল লাগছে ভাবতে — কী ভাল একটা মানুষ আমার জীবনসঙ্গী হবে। অনু আমাকে ভাল করে পড়াশোনা করতে, গান শিখতে বলেছে। আমি শিখব, ওর উপযুক্ত হয়ে উঠব।

আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

সাত

অনুরণের কথা

খুব ভাল লাগছে, দিনগুলো যেন স্বপ্নের মতো কেটে যাচ্ছে। 'আমার প্রিয়ার ছায়া, আকাশে ওই ভাসে— '

আমি ভালবেসেছি। এত গল্প উপন্যাসে প্রেমের এতো কথা পড়েছি, সেটা তাহলে এই রকম? আমি যে সবসময় রাণুর কথাই ভাবছি। ওর হাসি দেখলেই আমি যেন সম্মোহিত হয়ে যাই — ইচ্ছে করে ওকে বুকে টেনে নিই — ওর সেই হাসিমুখটাই আমার চোখে সব সময় ভাসছে।

রাণুও আমাকে ভালোবাসে — ওর চোখ দেখলেই আমি বুঝতে পারি। সেদিন ও কী সুন্দর করেই না বলল যে ও সারা জীবন আমার পাশে থাকবে — আমিও এত ভাল করে বলতে পারতাম না। সেদিন বড়মাঠ থেকে আসতেই ইচ্ছে করছিল না। আবার একদিন যেতে হবে। আচ্ছা, আমরা তো আমার বাড়ির ছাদে বসেও কথা বলতে পারি — মা তো সেই কবেই বলে দিয়েছেন যে, রাণুকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসতে পারি।

নাঃ পড়াশোনায় মন বসাতে পারছি না — রাণুর কথা আর ভাবব না। আচ্ছা, আমি যে এত ওর কথা ভাবছি, রাণুও কি আমার কথা ভাবে? 'আমি যারে স্বপন দেখি সে কি দেখে আমারে?'

আজকাল আর দেবুর বাড়ি যাই না। এর পরের সপ্তাহেই টেস্ট পরীক্ষা। রাণুরও ফাইনাল পরীক্ষা সামনে। আমাদের এখন আর দেখা না হওয়াই ভাল।

টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেল। আমার তো মনে হয় প্রি-টেস্টের চেয়েও ভাল দিলাম। কে জানে, আবার হয়তো মার্কসের রেকর্ড হবে, হেঁ হেঁ। আসলে আমি আমার ফুল কোর্সটাকে যেন ছবির মত চোখের সামনে দেখতে পাই — যে কোনও বিষয়ের যে কোনও প্রশ্ন, যে কোনও অঙ্ক আমি পারব — এই বিশ্বাসটা এসে গেছে।

আমাদের প্রধান শিক্ষক মিঃ দত্ত রিটায়ার করে গেলেন — পুজোর পর একজন নতুন প্রধান শিক্ষক এসেছেন, মিঃ শশাঙ্ক ব্যানার্জি। উনি নতুন, এখন ছুটিতে আছেন, তাই প্রাকটিক্যালি AHM অবনীবাবুই এখন অলিখিত প্রধান শিক্ষক।

অবনীবাবু আমাদের ইংরেজি পড়াতেন, আমাকে খুব ভালবাসতেন। টেস্ট পরীক্ষার আগে আমাকে বলেছিলেন, 'অনুরণ, তুমি কোনও টিচারের কাছে প্রাইভেট পড় না কেন? বেশ কিছু নিয়মের কথা আমরা তোমাকে বলতে পারতাম। আমরা বহু বছর ধরে বোর্ডের একজামিনার — ছাত্ররা কোথায় উত্তর লিখতে ভুল করে, কোথায় ওদের নম্বর কাটা যায়, বোর্ডের খাতা দেখার ইনস্ট্রাকশন — এগুলো সবই আমরা জানি। তোমারও এগুলো জানা দরকার। টেস্ট পরীক্ষার পর থেকে তুমি আমার কোচিংয়ে এসো — সপ্তাহে একদিন এলেই হবে — কোনও টাকা লাগবে না, তোমার বাবার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, কিছু মনে কোরো না।'

আমি অবাক হয়ে গিয়ে বলেছিলাম, 'থ্যাঙ্কস, স্যার – আমি আসব।'

টেস্ট পরীক্ষার শেষদিন, ফোর্থ সাবজেক্ট (আমাদের সময় নম্বর যোগ হত না) পরীক্ষা দিয়ে বেরোচ্ছি, অবনীবাবু আমাকে ডাকলেন। উনি খুব গম্ভীর, আমার দিকে তাকাচ্ছেন না — বললেন, 'অনুরণ, বাংলা পরীক্ষায় কী রচনা লিখেছ?'

আমি বললাম, 'স্যার, 'বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক' — এই রচনাটা লিখেছি। কেন স্যর?'

একটু ইতস্তত করে উনি কী একটা বলতে গেলেন, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি বাড়ি যাও। দেখ, তুমি আমার ছেলের মতো, আমরা জানি, তুমি HS-এ স্ট্যান্ড করবেই। শোন, যাই ঘটুক, ভেবো না — আমরা আছি। তুমি শুধু মন দিয়ে পড়াশোনা করে যাও।'

আমি খুবই অবাক হয়ে গিয়ে বললাম, 'স্যার, কী ঘটবে? আপনি কী বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না।'

স্যার কিছুই বললেন না, অন্যদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন — তারপর আমার দিকে ফিরে আমার মাথায় হাত রাখলেন, আমি স্যারকে প্রণাম করলাম, স্যার চলে গেলেন।

ব্যাপারটা নিয়ে একটু অস্বস্তি হতে লাগল, কী ঘটবে? স্যর কী বলতে চেয়েছিলেন?

রচনাটা লিখে বেশ আনন্দ পেয়েছি। প্রথমেই পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছি — প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও বর্তমান যুগ - ছাত্রদের অবস্থা কেমন ছিল। প্রায় সবাই গুরুগৃহে থেকে দীর্ঘদিন ধরে দাসত্ব করত। অর্ধভুক্ত থাকত — কেউ কেউ গাছের পাতা খেয়ে, গরুর বাঁটের দুধ খেয়ে থাকত। নিজে শুয়ে পড়ে নিজের দেহ দিয়ে ভেঙ যাওয়া জমির আলের বাঁধ রক্ষা করত। গুরুর খাটের পায়া ভেঙে গেছে, নিজের কাঁধ দিয়ে সারা রাত খাট ধরে রাখত — এই সব।

প্রাচীন ও মধ্য যুগের প্রচুর উদাহরণ, উপমন্যু, উদ্দালক, আরুণি, ব্যোপদেব — নালন্দার গল্প, বৌদ্ধবিহারের গল্প — মোট কথা, আমার বক্তব্যের সমর্থনে অনেক নজির দেখিয়েছিলাম।

এরপর আধুনিক যুগে টিচারদের কোচিং সেন্টার, ১৫-২০ জন করে ছাত্র এক একটা ব্যাচে — বেশ ফলাও করে লিখেছিলাম, হেঁ হেঁ —।

আমার রচনার সারমর্ম এই ছিল যে, কোনওদিনই 'বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক' ভাল ছিল না। ছাত্ররা এক্সপ্লয়েটেড হত। কিছু সদগুরু হয়তো ছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ গুরুরাই কিঞ্চিৎ শিক্ষাদানের বিনিময়ে চিরকাল ছাত্রদের কাছ থেকে অতিরিক্ত 'গুরু দক্ষিণা' চেয়ে নিতেন।

কাল টেস্টের রেজাল্ট বেরোবে। আমরা সবাই স্কুলের সামনের মাঠে গল্প করছি। স্কুল চলছে, আমাদের কোনও ক্লাস নেই — সবাই একসঙ্গে কথা বলছে —

একজন বলল, 'কাল রেজাল্ট নেওয়ার পর চল, আমরা একটা হিন্দি সিনেমা দেখি, ম্যাটিনি শো।'

কল্যাণ — গুড আইডিয়া — 'শ্রীমা'তে শাম্মী কাপুরের 'জানোয়ার' ধরেছে, চল যাই।

আমি — এই, আমিও যাব। আমি একটাও হিন্দি সিনেমা দেখিনি -

অরুণ — গুডি গুডি বয়, তুই এখনও একটাও হিন্দি বই দেখিসনি ?

আমি — না রে — হেহেহে —

কল্যাণ — অনুরণ, তোর রেজাল্টও কি কাল বেরোবে?

অরুণ — কল্যাণ চুপ কর — কী যা তা বলছিস ?

আমি — কেন? আমার রেজাল্ট কি আলাদা বেরোবে? কী বলতে চাইছিস, কল্যাণ ?

কল্যাণ — আরে, কোথায় তুই, আর কোথায় আমরা, হেঁ হেঁ — তাই ভাবছিলাম তোর আলাদা করে রেজাল্ট বেরোবে। হয়তো তোর আবার আর একটা রেকর্ড মার্কসের রেজাল্ট হবে, হাহাহা।

সব ছেলেরা হেসে উঠল। আমার খুব অস্বস্তি হতে লাগল। ওরা কিছু একটা জানে, আমাকে বলছে না।

যাক গে — ওরা হয়তো আমার পেছনে লাগছে।

আট

দীপক সিনহার কথা

আমরা অনাথ, অরফ্যান বয়, মিশনের 'আশ্রমের ছেলে', এটাই আমাদের পরিচয়। স্কুলে, সেই ক্লাস ওয়ান থেকেই দেখছি, বাইরের ছেলেরা আমাদের এই 'আশ্রমের ছেলে' নামেই ডাকে। ওরা কখনোই আমাদের বন্ধু হয় না — আমাদের একটু দুরেই রেখে দেয়।

তা রাখুক, আমাদের কিছু যায় আসে না। তবে, পরীক্ষার সময় টিফিন টাইমে যখন দেখি ওদের বাবা মা কী আদর করে ওদের খাইয়ে দিচ্ছেন, ছেলেগুলো খেতে খেতে পরের হাফের পরীক্ষার পড়া দেখছে — তখন বুকের ভেতর কোথায় যেন একটু চিনচিন করে।

কিন্তু একটি ছেলে ছিল, আছে — যে আমাকে ভালবাসত, আমাদের সঙ্গে একদম মিশে যেত। আমরাও ওকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম।

তার নাম অনুরণ রায়, আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়। ফার্স্ট বয় বললে কম বলা হয় — ও ছিলো সুপারফার্স্ট — সুপারফাস্ট। সেকেন্ড বয়ের সঙ্গে ওর প্রায় ১০০ নম্বরের তফাত থাকতই। কী দ্রুত লিখতে পারত আর কী সুন্দর হাতেরলেখা, ভাবা যায় না।

আমি খুব ভাগ্যবান, অনু আমার পাশেই বসত, সেই ক্লাস সিক্স থেকে — ক্লাসের প্রথম দিন আমিই ওকে হাত ধরে এনে পাশে বসিয়েছিলাম। সারাদিন ধরে ওকে ফলো করতাম, ও কী নোট নিচ্ছে, কীভাবে পড়া তৈরি করছে — সব দেখতাম। ও আমার নিজের ভাইয়ের মতো ছিল।

আমাদের স্কুলে খুব কৃপণ হস্তে নম্বর দেওয়া হত। ভাল ছেলেরা ৪৫ থেকে ৫০-৫২র মধ্যে পেত। কিন্তু অনু — সারা স্কুল অনুরণকে অনু, অনুদা বলেই ডাকত — অনু ৬৫-৭০-এর ঘরে নম্বর পেত আর অঙ্কে ১০০ ওর বাঁধা ছিল — ৯৮, ৯৯, ১০০ — এই ছিল ওর অঙ্কের নম্বর। টিচাররা অনেক চেষ্টা করতেন ওর নম্বর কাটার, পারতেন না। হয়তো সেজন্য টিচারদের ওর উপর একটু রাগও ছিল।

আমি বেশ বুঝতে পারতাম, কিছু টিচার অনুর প্রতি একটু বিরূপ ছিলেন, কারণ, অনু টিচারদের এড়িয়ে চলত। টিচারদের অযথা ভক্তি দেখানো, তেল দেওয়া, তোষামোদ করা — এসব থেকে অনু অনেক দুরেই থাকত। তাই, যে সব টিচার ছাত্রদের এরকম তেল দেওয়া পছন্দ করতেন, তাঁরা অনুরণকে ভাল চোখে দেখতেন না।

ছুটির দিন বিকেলে ও প্রায়ই আশ্রমে আমার কাছে চলে আসত, আমার ঘরে বসে আড্ডা মারত — আর আশ্রমের অনেক ছোট ছোট ছেলেরা অঙ্কের খাতা নিয়ে আসত — অনুদা, এই অঙ্কটা করে দাও, অনুদা, এটা বুঝিয়ে দাও — ওর সুনাম সারা মিশন জুড়েই ছড়িয়ে পড়েছিল। অনু হাসিমুখে সবাইকে অঙ্ক বুঝিয়ে দিত। বাচ্চাগুলো সারা সপ্তাহ ধরে অঙ্ক জমিয়ে রাখত, রবিবার অনুদাকে দেবে বলে। অনেক উঁচু ক্লাসের ছেলেরাও — এমনকী আমিও অনুর কাছ থেকে অনেক সাহায্য নিতাম, অনুও আনন্দের সঙ্গে আমাদের হেল্প করত।

প্রায় প্রত্যেক রবিবারেই আড্ডা, পড়া, অঙ্ক — এসব করতে করতে রাত হয়ে যেত। আমিই জোর করে অনুরণকে বাড়ি পাঠাতাম।

আসলে পাড়ায় ওর তেমন বন্ধু ছিল না। ও খুব একা ছিল — সবার সঙ্গে মিশতে যেত, কেউ বিশেষ কাছে আসত না। আসলে সবাই ওকে সমীহ করত, ও পড়াশোনায় এত ভাল, তাই সবাই হীনমন্যতায় ভুগত, বন্ধু হতে পারত না। তাই ও আমার কাছে চলে আসত — আমি যে ওকে বড্ড ভালোবাসতাম।

ক্লাসে অরুণ, কল্যাণ, চয়ন — এরা কতরকম ফন্দী আঁটতো ওকে জব্দ করার — রোজ নতুন নতুন গল্পের বই এনে ওকে দিত — ও ক্লাসে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ত। আমি কতবার ওকে সাবধান করেছি, ‘অনু, এগুলো ওদের চাল, তুই বুঝিস না কেন ?’ ও হাসিমুখে বলত, ‘করতে দে না — আমি ধরা পড়ব না, বইগুলো তো আমার পড়া হয়ে যাবে।’

ও ধরা পড়ত না — টিচার ধরতে এলেই আমরা হাতে হাতে সে বই অনেক দূরে পাঠিয়ে দিতাম, টিচার এসে কিছুই পেত না, হেঁ হেঁ।

কিন্তু, আজ, ওর চরম বিপদের সময়, আমি ওর জন্য কিছুই করতে পারছি না — এ দুঃখ আমার জীবনেও যাবে না। আমার কিছুই করার নেই। অনুরণ একটা রচনা লিখেছে, সেখানে ও সমগ্র শিক্ষকশ্রেণীকে অপমান করেছে — তাই ওকে টেস্টে পাশ করানো হবে না। এটা ক্লাসের সব ছেলেরাই জানে, শুধু অনুরণ জানে না। কোচিং ক্লাসগুলিতে টিচাররাই সবাইকে বলেছেন যে আজ অনুকে টেস্টে আটকে দেওয়া হবে।

অনুরণ আমার পাশে বসে আছে — খুব চিন্তিত লাগছে ওকে। কিছু একটা ঘটতে চলেছে, ও সেটা বুঝতে পারছে।

ক্লাস শুরু হল, অবনী স্যার আর সুদীপ স্যারের কমবাইনড ক্লাস, ইংরেজি আর অঙ্কের। অবনী স্যার রোল কল করলেন, ব্ল্যাকবোর্ডে ইংরেজির কিছু সম্ভাব্য প্রশ্ন লিখে দিলেন, আমরা সবাই সেগুলো লিখে নিচ্ছি — অনুরণ লিখছে না। ও চুপ করে বসে আছে।

সুদীপ স্যার ক্লাসে এলেন, হাতে অনেক খাতা, কাগজপত্র — ক্লাসে একদম পিন ড্রপ সাইলেন্স।

সুদীপ স্যার রোল নং ডেকে ডেকে সবাইকে রেজাল্ট শিট দিয়ে দিলেন। সবাই পাশ করেছে — কিন্তু অনুরণের নাম ডাকা হল না। সুদীপ স্যার এরপর অবনীস্যারকে একটা কাগজ দিলেন — পরীক্ষার মেরিট লিস্ট, নামের পাশে টোটাল মার্কস — অবনী স্যার ব্ল্যাকবোর্ডে সেটা লিখতে লাগলেন।

দশজন ছেলের নাম — অরুণ, কল্যাণ, চয়ন, এরা সব প্রথম দিকে, আমার নামও আছে, সাত নম্বরে, কিন্তু অনুরণের নাম লিস্টে নেই।

অনুরণ কিছুই বলছে না, আমি ওর কাঁধে হাত রাখলাম — আমি কীই বা করতে পারি? সব ছেলেদের সামনে ওকে এভাবে অপমানিত হতে হচ্ছে। আমার ওর জন্য ব্যথায় বুক যেন ভেঙে যাচ্ছিল।

হঠাৎ সুদীপ স্যার আমাকে ডাকলেন, 'দীপক, তোমার পাশের বন্ধুকে জিগ্যেস করো, ওর কি কিছু জানার আছে?'

স্যার নিজে ওকে সম্বোধনটুকুও করলেন না। অনুর দিকে তাকালাম, ও আশ্চর্যরকম স্থির, ভাবলেশহীন মুখ নিয়ে বসে আছে। একটু পর ও উঠে দাঁড়াল —

অনুরণ বলল, 'স্যার, আমি আমার রেজাল্ট শিটটা দেখতে চাই। আমি প্রিটেস্টের চেয়েও এই পরীক্ষাটা ভাল দিয়েছিলাম। তাই, দেখার ইচ্ছে ছিল, মার্কসের নতুন কোনও রেকর্ড হল কি না।'

এই বলে অনুরণ একটু হাসল।

সুদীপ স্যার বললেন, 'তোমার রেজাল্ট উইথহেলড হয়ে আছে। তোমার বাংলা সেকেন্ড পেপারের খাতা সব টিচাররা এখনও দেখেননি। সবার দেখা হলে সবাই যা ডিসিসন নেবেন তাই হবে। তুমি বোধহয় এ বছর মিশন থেকে HS-এ বসতে পারছ না, সরি। দ্যাখো, অন্য কোন স্কুল থেকে পরীক্ষা দিতে পার কি না।'

আমি কেঁদে ফেললাম, অবাক হয়ে দেখলাম, ক্লাসের প্রায় সব ছেলেই কাঁদছে, চোখ মুছছে — এক দৃষ্টিতে সবাই অনুরণের দিকে তাকিয়ে আছে।

অনুরণ বললো, 'স্যার, আজ বাড়ি গিয়ে বাবা, মাকে কী বলব? আমি টেস্টে পাশ করতে পারিনি?'

সুদীপ স্যার খুব রেগে গেলেন, বললেন, 'তুমি খুবই দুর্বিনীত, অহংকারী ছেলে — আজ, এই অবস্থাতেও তুমি ভাবছ তুমি রেকর্ড করেছ। নিজেকে তুমি বিদ্যাসাগর ভেবে ফেলেছ — কারও সঙ্গেই তুমি কথা বল না, এত তোমার অহংকার। সহপাঠীদের সঙ্গেও তোমার মিত্রতা নেই। যেন কেউ তোমার বন্ধু হবার যোগ্য নয়।

কিন্তু, মিশনে পড়ে শিক্ষকদের উপর তোমার এরকম ধারণা কী করে হল? গুরুরা শিষ্যদের গরু মনে করে গরুর মতো খাটাতো? তুমি তো তাই লিখেছ — তোমার শাস্তি হওয়া উচিত। হয়তো তোমাকে TC দেওয়া হতে পারে। যদিও, তোমার একটা বছর নষ্ট হোক এটা কাম্য নয়। তাই তাড়াতাড়ি অন্য স্কুল থেকে পরীক্ষা দেওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সেক্ষেত্রে কালই যেন তোমার বাবা স্কুলে আসেন — বাড়ি গিয়ে বাবাকে বলবে কাল যেন AHM অবনীবাবুর সঙ্গে এসে অবশ্যই দেখা করেন।'

অনু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি ওকে খুব ভালভাবে চিনি — ও ভিতরে ভিতরে চিৎকার করে কাঁদছিল — অথচ নিজেকে যেন একটা মুখোশ, বর্মের ভিতর ঢুকিয়ে রেখেছে। কিছুই ওকে স্পর্শ করছে না।

সুদীপ স্যার এবার বললেন, 'অনুরণ, আর কিছু বলার না থাকলে তুমি বসতে পারো। ছেলেরা — রেজাল্ট নিয়ে তোমাদের কিছু বলার থাকলে বলো। কোনও অঙ্ক বোঝার থাকলে, বলো। এই ক্লাসের পর আজ তোমাদের ছুটি।'

ক্লাস শেষ হল। আমরা সবাই ক্লাসের বাইরে এলাম। বাইরে নোটিসবোর্ডে একটা মেরিট লিষ্ট টাঙানো হয়েছে। অনুরণের নাম এক নম্বরে আছে — কিন্তু নামটা কালি দিয়ে কেটে দেওয়া — পাশে লেখা আছে, DETAINED ON ACCOUNT OF BAD CONDUCT. এ যেন সারা স্কুলকে নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল যে অনুরণকে টেস্টে আটকে দেওয়া হয়েছে।

আশ্রমের বাচ্চা ছেলেগুলো সব ভিড় করে নোটিসবোর্ড দেখছিল, অনেক ছেলে। আমাকে দেখে সবাই ছুটে এল, অনেকের চোখেই জল — 'দীপকদা, কী হবে? অনুদাকে HS-এ বসতে দেওয়া হবে না?'

কী উত্তর দেব? কী হবে? আমিই তো জানি না — উফ, ভগবান — চোখের সামনে শুধু দেখছি একটা প্রতিভাবান ছেলের সব স্বপ্ন হয়ত ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে —

নয়

রাণুর (ঝিলিক বসু) কথা —

আজ অনুর রেজাল্ট বেরোবে, তারপর ওরা দল বেঁধে হিন্দি সিনেমা দেখতে যাবে। আমিও একদিন হিন্দি বই দেখতে যাব — অনুর সঙ্গে। কী মজা হবে, ভাবতেই শিহরণ হচ্ছে — আমি আর অনু অন্ধকার সিনেমা হলে পাশাপাশি বসে আছি — ঘন হয়ে বসে আছি — উফ। তবে কাছাকাছি কোনও হলে যাওয়া চলবে না — অনেক দূরের কোনও হলে আমরা যাব।

বাড়ি গিয়ে স্কুল ড্রেস ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লাম। মিঠুর বাড়ি গেলাম, অনেক গল্প করলাম। একমাত্র মিঠুই জানে, আমার আর অনুর কথা — আমাদের বড়মাঠে যাওয়ার কথা, হিহিহি। মিঠুর মা আমাদের চিঁড়েভাজা খাওয়ালেন।

বাড়ি ফিরছি, রাস্তায় দেবুদার সঙ্গে দেখা। দেবুদা স্কুল থেকে ফিরছে, গম্ভীর মুখ — তখন প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে —

আমি বললাম, 'কী জিজু, রেজাল্ট কেমন হল? কোনও প্লেস আছে? সিনেমায় যাবে না?'

দেবুদা খুব গম্ভীর — বলল, 'না যাব না।'

আমি বললাম, 'কেন যাবে না? অনুদা যাবে?'

দেবুদা খুব রেগে গেল — কোনওদিন তো এরকম রাগে না — বলল — 'দ্যাখ রাণু, তুই কিন্তু আজকাল বাড়াবাড়ি করছিস। আমার বন্ধুরা কে কোথায় কী করল — তোর এত খোঁজের কী দরকার? তুই নিজের কাজ নিয়েই থাক না—' এসব বলেই দেবুদা কী রকম করুণ মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সরি রে, আমার মাথার ঠিক নেই—'

বললাম, 'আমি কিছু মনে করিনি। জিজুরা শালিদের বকতেই পারে, হেঁ হেঁ। কিন্তু তোমার কী হয়েছে? মাথার ঠিক নেই কেন? পাশ করেছ তো?'

দেবুদা বলল, 'হ্যাঁ — ফিফথ হয়েছি।'

আমি — আর অনু? ও কি এবারও রেকর্ড করল?

মনে হল দেবুদা কান্না লুকোনোর চেষ্টা করছে। ও বাড়ির দিকে রওনা হল। আমি দৌড়ে গিয়ে ওর পথ আটকে দাঁড়ালাম— আমার মন কু গাইছিল। অনুর কিছু হয়নি তো? দেবুদা এরকম করছে কেন? অস্বাভাবিক আচরণ—

বললাম, 'প্লিজ, দেবুদা, কী হয়েছে আমাকে একবার বলো? আমি তো পরে জানতেই পারব — তুমি এখনই বলে দাও। তোমার মন হালকা হবে। তোমার মন খারাপ কেন গো?'

দেবুদা যেন আর্তনাদ করে উঠল 'রাণু রে, অনুকে টেস্টে আটকে দিয়েছে। ও এবার HS-এ বসতে পারবে না।'

দেবুদা এক নিঃশ্বাসে সব বলতে আরম্ভ করল, বলতে বলতে ও কেঁদে ফেললো, বলল —

- আমার খুব কষ্ট হচ্ছে রে, আমি বাড়ি যাই। অনুর মুখটা যদি দেখতিস, কেউ যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দিয়েছে।

দেবুদা চলে গেল। আমিও বাড়ি চলে এলাম। স্নান করলাম, খেলাম। নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম।

আমার কোনও মন খারাপ হল না। মন যেন একদম ফাঁকা — ফুরফুর করছে। অনুর কথা ভাবব না। আমি জানি, সব ঠিক হয়ে যাবে। যে ছেলে HS-এ ফার্স্ট হবে, তাকে কেউ টেস্টে আটকায়? নাঃ, ওর কথা একদম ভাবব না।

আচ্ছা, অনু এখন কী করছে? ওর নিশ্চয় খুব মন খারাপ হয়েছে। ও কি কাঁদছে? কেউ সঙ্গে নেই? ইস, একা একা ও কাঁদছে? ও এখন কোথায়? বাড়ি ফেরেনি? কোন মুখে ফিরবে? বাড়ি ফিরে দিদিমণিকে ও কী বলবে? বাবাকে বা দিদিদেরই বা ও কী বলবে? ও এখনও বাড়ি না ফিরলে এখন কোথায় আছে? কার সঙ্গে আছে? ও কি একা আছে? ও যদি কোথাও চলে যায়? না না — আমার অনু আমাকে ফেলে রেখে কোথাও যেতেই পারে না।

হঠাৎ দিদি ঘরে ঢুকল। দিদি চেঁচিয়ে উঠল, ' একী? মা দেখ, রাণু শুয়ে শুয়ে কেঁদে কেঁদে বালিশ ভিজিয়ে ফেলেছে। কী হয়েছে তোর ?'

দিদি আমাকে আদর করতে করতে চোখের জল মুছিয়ে দিল, বলতে থাকল, 'কী হয়েছে, বল, সোনা বোন আমার — কাঁদছিস কেন?'

মা দৌড়ে এলেন, আমার গায়ে হাত রেখে জ্বর হয়েছে কি না দেখলেন, বললেন, 'কি হয়েছে রাণু, আমাকে বল? কেউ কিছু বলেছে তোকে?'

আমি উঠে পড়লাম, চোখ মুছলাম। এই আমার একটা রোগ — বুঝতেই পারি না কখন কাঁদছি। বললাম, 'না মা — ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বাজে একটা স্বপ্ন দেখেছি। ঠিক আছি আমি, কিছু হয়নি।'

মা আর দিদি আমাকে প্রশ্ন করে যেতে থাকল, আমি চোখ বুজে শুয়ে রইলাম — কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম।

দশ

অনুরণের কথা

বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

আমাকে শান্ত থাকতে হবে, ভয় পেলে চলবে না। এই বিপদে আমার সহায় হবে একমাত্র মা আর বাবা। আমাকে তাঁদের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে হবে।

একা ক্লাসে বসে আছি, সবাই চলে গেছে — কেউ আমাকে সহানুভূতি জানাতে আসেনি। উঠে পড়লাম, ক্লাসের বাইরে এলাম। নোটিসবোর্ডে একটা মেরিট লিস্ট টাঙানো হয়েছে। দেখলাম, আমার নাম কালি দিয়ে কেটে দেওয়া — পাশে লেখা আছে, DETAINED ON ACCOUNT OF BAD CONDUCT.

নোটিসবোর্ডের সামনে অনেক ছোট ছোট ছেলে ভিড় করে দাঁড়িয়ে — অনেকের চোখে জল। ওরা কাঁদছে কেন, কে জানে। আমাকে অনুদা, অনুদা বলে ওরা ডাকছিল, কত কিছু বলছিল — আবার কিছু ছেলে আমায় নাম ধরেও ডাকছিল — আমি যেন দূর থেকে এসব শুনছিলাম।

একটা ছেলে খুব কাঁদছে, কেন কাঁদছে? ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম ও আমার প্রাণের বন্ধু, দীপক।

আমি হাসলাম, বললাম, 'কী রে দীপক, কাঁদছিস কেন ?'

ও কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'অনু, আমি তোর সঙ্গে তোর বাড়ি যাই? তুই এখন বাড়ি যাবি তো?'

বললাম, 'হ্যাঁ, চল, বাড়ি যাই।'

আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। সারা রাস্তা দীপক আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে রাখল। আমরা একটা কথাও বলিনি। বাড়ির গেট খুলে দীপক আমাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি গেলাম রে, তুই ঘরে যা, স্নান খাওয়া দাওয়া কর, চিন্তা করিস না — সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি খোঁজ নিয়েছি। কাল স্যাররা তোকে খুব ভয় দেখাবেন। তুই ভয় পেয়ে ক্ষমা চাইবি, তোকে পাশ করিয়ে দেওয়া হবে। আমরা একসঙ্গেই পরীক্ষা দেব, একসঙ্গে ফর্ম ফিল-আপ করব।'

দীপক চলে গেল।

বাবা আমাদের গলা পেয়ে দরজা খুললেন। বাবা এতো তাড়াতাড়ি ডিসপেনসারি থেকে চলে এসেছেন? ওহ্, তাহলে খবর পেয়ে গেছেন। ঘরে এলাম। মা, দিদিরা — আমাকে কেউ কিছু বলল না। মা শুধু বললেন, 'স্নান করে নে — আমরা একসঙ্গে খাব।'

খাওয়া মিটল, আমি আমার ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম — আর কিছু ভাবব না। বাবা, মা আছেন, আমার চিন্তা কী? ওরাই সব ঠিক করে দেবেন।

বাবা আর মা আমার ঘরে এলেন, আমি আস্তে আস্তে ওদের সব বললাম — আমার লেখা রচনার কথা, আমার লিস্টে নাম না থাকার কথা, রেজাল্ট শিট না পাওয়ার কথা — সব। দীপক কী সব ক্ষমা চাওয়ার কথা বলেছে — সবই বললাম। মা মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে সব জেনে নিলেন।

মা বললেন, 'অনু, মন খারাপ করিস না। জীবনে অনেক ঝড় আসবে, সেগুলো সামাল দিতে হবে নিজেকেই। চোখ মুছে ফ্যাল, অতো কাঁদিস না, আমরা আছি তো।'

আমি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম, মা আমার মাথায় হাত রেখে আদর করতে থাকলেন। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলাম। বাবা আর মা আমার গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন — আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন AHM অবনীবাবু আমার বাবা, মাকে খুব খাতির করে বসিয়ে আমার রেজাল্টশিট আর বাংলা পরীক্ষার খাতা দেখালেন।

অবনীবাবু বললেন, দেখুন, যা হয়েছে, খুবই দুঃখজনক, অনুরণ আমাদের স্কুলের সেরা ছাত্র, আমাদের গর্ব, আমাদের অনেক আশা ওর উপর — ও এসে একবার ক্ষমা চাইলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মা বললেন, 'আমি ওর রচনাটা পড়লাম, এটা তো একটা সাধারণ ব্যাপার। রচনাতে যে কেউ তার মতামত লিখতে পারে, এতে কী অন্যায়? আমিও একটা HS স্কুলের AHM। আমি তো ভাবতেই পারছি না, এই লেখার জন্য কাউকে টেস্টে এলাউ করা হবে না।'

অবনীবাবু — না না, ওকে টেস্টে এলাউ না করার প্রশ্নই নেই — ও টেস্টে ফার্স্ট হয়েছে। আমরা মনে করছি ও একটা অন্যায় করেছে, ওকে ক্ষমা চাইতেই হবে।

বাবা — ও যদি ক্ষমা না চায় তাহলে কী হবে?

অবনীবাবু — তাহলে ও এবার HS-এ বসতে পারবে না। কিন্তু আপনারা ভাববেন না, কাল সকালে ওকে স্কুলে পাঠিয়ে দেবেন, কালই সব মিটে যাবে, ওর হাতে রেজাল্ট শিট দিয়ে দেওয়া হবে।

মা আমার সব বিষয়ের নম্বর টুকে নিলেন — ওঁরা বাড়ি চলে এলেন।

বাড়ি ফিরে বাবা, মা অনেকক্ষণ আমার ক্ষমা চাওয়া নিয়ে আলোচনা করলেন। ওঁরা দুজনেই স্বাধীনতা সংগ্রামী, বাবা বৃটিশ আমলে জেলও খেটেছেন। তাই, অন্যায়ভাবে ক্ষমা চাওয়াকে ওরা কিছুতেই মেনে নেবেন না, এটা আমি জানি। আমিও ক্ষমা চাইতে পারব না। কখনই নয়।

বাবা বলে উঠলেন, 'এ যে লঘু পাপে গুরু দন্ড হল।'

মা — অনু কোনও অন্যায় করেনি, ওকে ক্ষমা চাইতে হবে কেন? পরীক্ষার হলে বসে একটা রচনা লিখেছে — সেজন্য ওকে এমন আঘাত সইতে হবে? ছেলেটা আমার কী কষ্ট পেলো, বলো?

বাবা — তুমি তোমার স্কুলের ছেলেদের সেকসনে খোঁজ নাও তো — হেডমাস্টার কালীবাবু, অনুকে খুব ভালোবাসেন। উনি কী বলেন, দ্যাখো — আজই যাও।

মা — ঠিক বলেছ। ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারটা আমি মেনে নিতে পারছি না গো — বিনা দোষে আমার ছেলেটাকে ওরা —

মা কেঁদে ফেললেন, বাবা মাকে সান্ত্বনা দিতে থাকলেন। আমি যেন একটা পুরোনো দৃশ্যের পুনরাভিনয় দেখছি — আমার সেই ক্লাস ফোরের গল্প — সেই ননীবাবুর কথা। কত ননীবাবুই যে ছড়িয়ে আছেন। আমি কখনও ক্ষমা চাইব না — যা হবার হোক। আমার মাকে যারা এখন কাঁদাল, তাদের কাছে ক্ষমা চাইব আমি ?

মা, কালীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে স্কুলে চলে গেলেন।

বিকেলে নেতাজি বিদ্যায়তনের হেডমাস্টার কালীবাবু আমাদের বাড়ি এলেন। উনি সব শুনলেন, আমার টেস্টের মার্কসগুলো দেখলেন — মা টুকে এনেছিলেন। মা ঘর থেকে আমার প্রিটেস্টের রেজাল্ট শিটও নিয়ে এলেন, কালীবাবু সব দেখতে থাকলেন।

অনেকক্ষণ পর কালীবাবু কথা বললেন — 'ডাক্তারবাবু, দিদি — আপনারা ধন্য। আপনারা অনুরণের বাবা, মা। মিশনের মত স্কুলে এই সব মার্কস, এ যে স্বপ্নেও ভাবা যায় না। প্রিটেস্টে ৮৩৯? গত বছর HS-এ ৮১১ পেয়ে প্রথম হয়েছিল — তার আগের বছর ৮১৯-এ প্রথম হয়েছিল। এ ছেলে তো এবার HS-এ ফার্স্ট হবেই। অনু, সব মিটিয়ে নাও বাবা, ক্ষমা চাও, নাহলে বছর নষ্ট হয়ে যাবে।'

বাবা বললেন, 'ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারটা এখন থাক। আপনি কীভাবে হেলপ করতে পারেন, বলুন। ও আপনার স্কুল থেকে HS পরীক্ষা দিতে পারবে না?'

কালীবাবু — সে পারবে। তবে, আমাদের ল্যাবরেটরি খুবই সাধারণ — খুব কম ছেলেই সায়েন্স নেয়। এ বছর সাতজন নিয়েছে। ওরা সোদপুরের একটা স্কুল থেকে এক্সটারনাল হিসেবে পরীক্ষা দেবে। তবে, আমার স্কুল থেকে আর্টস বা কমার্স

নিয়ে পরীক্ষা দেওয়া যাবে। কিন্তু এসবের তো প্রশ্নই নেই — এসব একদম ভাববেন না। ছেলেটার ভবিষ্যতটা ভাবুন — ওকে বলুন, ক্ষমা চাইতে।

আমি বললাম, 'স্যার, আপনি কি মনে করেন, আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত?'

কালীবাবু চুপ করে থাকলেন।

মা — অনু, আর্টস নিয়ে HS দিবি? ইংরাজি, বাংলা তো একই আছে, অঙ্ক নিবি, আর দুটো মাত্র ইলেকটিভ সাবজেক্ট নিতে হবে।

আমি — হ্যাঁ, পারব। আমার আর মিশনে যেতেই ইচ্ছে করছে না।

কালীবাবু — কী সব পাগলের মতো কথা বলছেন, আপনারা — ছেলেকে ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন, আপনি নিজেই একদিন বলেছিলেন, দিদি। সব ভুলে গেলেন? অনু — এসব চিন্তা একদম কোরো না, HS-এর রেজাল্ট খারাপ হয়ে যাবে। সারা জীবন অনুশোচনা করবে। কালই স্কুলে গিয়ে সব মিটিয়ে নাও। আর দিদি, আমি আপনাদের জন্য আছি — যা বলবেন করব। কিন্তু, প্লিজ, জেদ ছাড়ুন, মাথা ঠাণ্ডা করুন। আমি তাহলে আজ আসি —

কালীবাবু চলে গেলেন।

এগারো

রাণুর (ঝিলিক বসু) কথা —

স্কুলে ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আজ ইংরাজি ছিল, কিন্তু দিদিমণিকে স্কুলে দেখলাম না। আজ ওঁদের অনুর স্কুলে যাওয়ার কথা — আজই হয়ত অনুর রেজাল্ট বেরিয়ে যাবে।

আমার কি অনুর বাড়ি যাওয়া উচিত? ওদের বাড়ির আবহাওয়া এখন গম্ভীর — আমি তো সবার কাছেই বাইরের লোক। আমি গেলে সবাই অস্বস্তিতে পড়বে — আর, আমি কোন অধিকারে যাব? সেটা তো জানি শুধু আমি আর অনু —

কিন্তু, অনু চেয়েছিল, সুখে, দুঃখে আমি যেন ওর সঙ্গী থাকি — তবে? ওর এই বিপদের দিনে — উফফ, আমি কী করবো?

সন্ধেবেলায় অনুর বাড়ি গেলাম। দিদিমণি আমাকে ঘরে নিয়ে বসালেন, দিদিরাও ছিল। সবাই আমাকে দেখে খুশিই হলেন, মনে হল।

রূপাদি বলল, 'রাণু, চা খাবি ?'

আমি — দাও।

দিদিমণি — তোমার আজ পরীক্ষা কেমন হল, ঝিলিক ?

আমি — বেশ ভাল হয়েছে।

আমার গলা কাঁপছিল। সবাই খুব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছি, সবাই খুব মনঃকষ্টে আছে। আমার কান্না পেতে লাগল — এ বাড়ির ‘প্রাণ’, আমার অনু, আজ সুখি নয় — তাই বাড়ির সবাই খুব দুঃখি।

সোনালিদি বললো, ‘রাণু, তুই কাঁদিস না – সব ঠিক হয়ে যাবে।’

ছোড়দির চোখেও জল, আমি আর পারলাম না — কেঁদে ফেললাম।

দিদিমণি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন, ‘কেঁদোনা, ঝিলিক, আমরা আছি তো। রূপা, ঝিলিককে অনুর ঘরে নিয়ে যা—’

অনু আমাকে দেখে খুব খুশি হল।

ও বলল, ‘আয়, রাণু, এখানে বোস —’

রূপাদি বলল, ‘তোরা কথা বল, আমি যাই।’

অনু বলল, ‘না, বড়দি, তুই থাক না —’

বড়দি চলে গেলেন।

আমরা কথা বলতে শুরু করলাম। নানা বিষয়ে কথা হচ্ছে, শুধু অনুর রেজাল্টের ব্যাপারটা আমরা এড়িয়ে যাচ্ছিলাম।

আমি বললাম, ‘জানো, আমরা পরীক্ষার পর বেড়াতে যাব, সাউথ ইন্ডিয়া। প্রায় এক মাসের ট্যুর। অনেকদিন আমাদের দেখা হবে না। আমাকে ভুলে যাবে না তো ?’

অনু বললো, ‘রাণু, তোর কাছে সেদিন আমি যা চেয়েছিলাম, তুই কিন্তু দিসনি আমায়। পরিষ্কার করে কিছু বলিসনি— আমি অন্তত বুঝিনি। আমি তো একটু বোকা আছি — দ্যাখ না, আমার সাথেই এরকম হল।’

আমার বুকটা মুচড়ে উঠল। আবার কান্না পেয়ে গেল — জোর করে হাসলাম, অনু আমার হাসি খুব ভালোবাসে।

বললাম, ‘হেঁ হেঁ, তুমি বোকা? না গো, ভেবো না — আমি একমাস পর ঘুরে এসে আমার জবাবটা ভাল করে তোমায় বলব। এবার আমি যাই, রাত হয়ে গেছে। ভালো থেকো, আনন্দে থেকো।’

আমি বেরিয়ে এলাম — কান্না আর বাঁধ মানছে না। এই ফুলের মতো নিষ্পাপ আর এতো মেধাবী ছেলেটাকেও এত কষ্ট পেতে হবে কেন?

বারো

অনুরণের কথা

আজ আমার অনেক কাজ। অবনীস্যারের বাড়ি যেতে হবে, উনি টেস্টের পর ওঁর বাড়ি যেতে বলেছিলেন। ল্যাবরেটরিতে যেতে হবে, স্কুলে যেতে হবে।

মা সকালে আমাকে আদর করে ঘুম থেকে তুললেন, বললেন, ‘ওঠ, অনু — স্কুলে ক্ষমা চাইতে যাবি কি না সেটা আমরা তোর উপরেই ছেড়ে দিলাম, তোর যা ইচ্ছে তাই করবি। একদম মন খারাপ করিস না —’

মা আমাকে একটা চুমু খেলেন। তারপর স্কুলে চলে গেলেন — মার স্কুলেও পরীক্ষা চলছিল।

অবনীস্যারের বাড়িতে একটা বড় ঘরে ১০/১২ জন ছেলে বসে আছে — আমিও একধারে গিয়ে বসলাম। সবাই আমার সহপাঠী, কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে একটাও কথা বলল না। স্যার এলেন — আমাকে দেখে চমকে গিয়ে বললেন, 'অনুরণ, একটু বারান্দায় এসো, কথা আছে।'

আমি এখন অনেক কিছুই বুঝতে শিখেছি। আমি বুঝে গেছি স্যার কী বলবেন -

স্যর বললেন, 'অনুরণ, দ্যাখো — তুমি তো টেস্টে ঠিক — মানে, কী বলব, তুমি তো —'

বললাম, 'আমি বুঝেছি, স্যার — আমি তাহলে যাই, স্যার?'

স্যর বললেন, 'তুমি কিছু মনে কোরো না — তোমার রেজাল্ট তো আজই বেরোবে, তুমি কাল থেকে এসো।'

এই অবনীবাবুই বলেছিলেন, আমাকে ছেলের মতো দ্যাখেন — হেঁ হেঁ।

এখন কোথায় যাই? মাত্র সাড়ে আটটা বাজে — স্কুল তো সেই দশটায় আরম্ভ হবে। মন্দিরের দিকে গেলাম, বাইরের চাতালে একটা গাছের নীচে বসলাম। চারদিকের ছাত্রাবাসগুলো থেকে ছাত্রদের সম্মিলিত পড়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি— সবাই পড়ছে, আমিই শুধু বসে আছি।

নতুন হেডমাস্টার মিঃ শশাঙ্ক ব্যানার্জি জয়েন করেছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে, দেখি উনি কী বলেন। উনি নিশ্চয় আমার ব্যাপারে সব জেনেছেন।

রাণুর কথা মনে পড়ল। কাল ও এসেছিল। আমার সঙ্গে কোনও বন্ধুই দেখা করতে আসেনি — শুধু রাণুই এল। আমার খুব ভাল লেগেছে। আচ্ছা, আমাদের ব্যাপারটা কি বাড়ির সবাই বুঝে গেছে? না হলে, রাণু তো সবার কাছেই বাইরের লোক, ও এলে সবার তো অস্বস্তিতে পড়ার কথা — কিন্তু, ও আসাতে সবাইতো বেশ খুশিই হয়েছে মনে হল।

নাঃ — রাণুর কথা ভাবব না, আমি কি আর ওর যোগ্য হতে পারব? ওকে মুক্তি দিয়ে দেব — কথা রাখার কোনও কথা আর থাকছে না এই অবস্থায়।

স্কুল শুরু হ'ল — কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে গেলাম। কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যালটা চালিয়ে যাওয়া উচিত। ট্রাইটুরেশনের পরীক্ষাগুলো কিছুদিন না করলেই পরে ভুল হয়ে যায়। তাই, টেস্টের পরেও সবাই ল্যাবরেটরিতে এসে প্র্যাকটিস করে। এই সকালেও দেখছি, কয়েকজন ল্যাবে এসে গেছে।

ল্যাবের স্যার আমার দিকে এগিয়ে এলেন. উনিও আমায় 'ছেলের মতো' ভালোবাসেন — আমার ভয় করতে লাগল। উনিও কি আমায় তাড়িয়ে দেবেন ?

স্যর বললেন, 'অনুরণ, আমাকে বলা হয়েছে, তোমাকে যেন — মানে, আমি বলতে চাইছি—'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, স্যার — আমি চলে যাচ্ছি—'

আমি আর এখানে আসব না — অবনীস্যারের বাড়িতেও আর যাব না। আমি আর ল্যাবেও আসব না, আমি স্কুলেও আর যাব না, নতুন হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখাও করব না। এই মিশনেই আর আমি আসব না। আমি সায়েন্সই আর পড়ব না। আমি আর্টস পড়ব। আমি আর দিদি একসঙ্গে HS দেব — আর্টস নিয়ে — নেতাজি বিদ্যায়তন থেকে।

এখন কোথায় যাই? জেলা গ্রন্থাগারে যাই — স্কুলে আর যাব না।

লাইব্রেরিতে গিয়ে টয়লেটে গেলাম — চোখে কী একটা পড়েছে, জল পড়ছে চোখ দিয়ে। চোখে জলের ঝাপটা দিলাম, আয়নায় দেখলাম — এ কী? আমি কাঁদছি? ছিঃ — 'আমি ভয় করব না ভয় করব না' — আমি কি ভীতু? ভীরুরাই কাঁদে — নাঃ, মন শক্ত করতে হবে।

আমাকে এই তিন মাসে নতুন দুটো ইলেকটিভ সাবজেক্ট পড়তে হবে। কি সাবজেক্ট নেব? ইতিহাস, ভূগোল? না কি ইতিহাস, সংস্কৃত? দেখি, মা কি বলেন —

কোনও ভাল ইন্টারেস্টিং, অ্যাবজরবিং বই আজ বাড়ি নিয়ে যাব — যেটা পড়া শুরু করলে আর কোন দুঃখের কথা মনে আসবে না। আচ্ছা, ইংরাজি বই পড়া শুরু করে দেই? সেটাই ভাল হবে, নতুন নতুন ইংরাজি শব্দ শেখা হবে, মনও ব্যস্ত থাকবে।

একটা মোটা বই বাড়ি নিয়ে এলাম — স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের শার্লক হোমস কমপ্লিট (ইলাসট্রেটেড)। বাঃ, দারুণ বই — বেশ কিছুদিন ধরে পড়তে পারব।

দুপুরে শুয়ে শুয়ে ইংরাজি বইটা পড়ছিলাম, কী ভাল লাগছে। কিছু অজানা শব্দ পাচ্ছি, কিন্তু অর্থ বুঝতে পারছি। পরে ডিক্সনারি দেখে নেব।

মা আমার ঘরে এলেন।

মা বললেন, 'বল, সকাল থেকে কী করলি ?'

আমি সব বলে গেলাম, কীভাবে অবনীস্যার আমাকে চলে যেতে বলেছেন, ল্যাবের স্যার প্রায় তাড়িয়েই দিয়েছেন— লাইব্রেরি থেকে নতুন বই এনেছি — সব বললাম। শুনতে শুনতে মা খুব রেগে গেলেন, চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছিল অথচ চোখ জলে ভরা — মার এই রূপ আমি আগে দেখিনি।

আমি কেঁদে ফেললাম, 'মা, আমি আর সায়েন্স পড়ব না গো। আমি আর ল্যাবে যাব না গো—'

মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'এখন স্কুলে না গিয়ে ভাল করেছিস। একদম ক্ষমা চাইবি না— দেখা যাক, ওরা কী করে। সবে তো ডিসেম্বরের ২০ তারিখ, ফেব্রুয়ারির ১০-১২ তারিখ পর্যন্ত HS-এর ফর্ম ফিল-আপ করা যায়। তোর পড়া চালিয়ে যা। সায়েন্স পড়বি কি পড়বি না, সেটা এখনই ভাবিস না। তবে, দিদির ইতিহাস, ভূগোল বইগুলো, খাতাগুলো, টেস্ট পেপার বইটা উল্টেপাল্টে দেখতে পারিস। সারাদিন পড়াশোনা কর — তোর যা ভাল লাগে, নিজের বই, দিদির বই, গল্পের বই — যা ভাল লাগে, পড়। বাড়ি থেকে বেরোস না — আর অত কাঁদিস না, সোনা — সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মা চলে গেলেন - আমি ভাল করে চোখ মুছে নিলাম। আবার শার্লক হোমসে ডুবে গেলাম।

দেখতে দেখতে জানুয়ারি এসে গেল। আমি শার্লক হোমস, দিদির ইতিহাস আর ভূগোল বই পড়ে যাচ্ছি — নিজের বই একদিনও পড়িনি। কী হবে পড়ে? আমি তো আর্টস পড়ব।

টেস্ট পেপার ঘেঁটে ইতিহাসের দুটো পেপারের ১০+১০ প্রশ্ন বেছে ফেলেছি, এর থেকেই পরীক্ষায় আসবে — আমার সাজেশান করার খুব ভালো ক্ষমতা আছে, হেঁ হেঁ। এবার একটা নতুন খাতায় এই কুড়িটা প্রশ্নের umbrella answer লেখা শুরু করে দিয়েছি — দিদির তো কাজে লাগবেই, আমারও কাজে লাগতে পারে। লাইব্রেরি থেকে কিছু ভালো ইতিহাস বই আনতে হবে। খুব ভাল করে উত্তর তৈরি করতে হবে — পরীক্ষক যেন একটাও নম্বর কাটতে না পারে।

একটা খাতায় সব সালগুলো — সেই পানিনির সময় থেকে, ৮০০ BC থেকে, পরপর লিখে ফেলেছি — পাশে পাশে সেই বছরে কী ঘটনা ঘটেছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখেছি। ইতিহাসে এই সালগুলোর রেফারেন্স দেওয়া খুব জরুরি।

মা আর দিদি তো এই খাতাগুলো দেখে একেবারে যাকে বলে চমৎকৃত, হেঁ হেঁ। খুব খুশি হল ওরা — বলল, 'তুই কি হিস্ট্রিতেও 'লেটার' না নিয়ে ছাড়বি না ?'

আমি হাসলাম, যেটা করব, সর্বাঙ্গসুন্দর করে করাই উচিত।

আজ জানুয়ারির ১৫ তারিখ। এক মাস হয়ে গেল আমি স্কুলে যাইনি। ইতিহাস কমপ্লিট করেছি — দিদি এখন আমার লেখা খাতাটাই পড়ে যাচ্ছে — ওর আগের খাতাগুলো আর পড়ছে না।

এখন ম্যাপ পয়েন্টিং নিয়ে পড়েছি — ২০০ নম্বরের ভূগোল এখন আমাকে শিখতে হবে। মোক্ষম ২০ টা প্রশ্ন বাছা হয়ে গেছে — উত্তর লেখা শুরু করেছি। ভাল ভাল ভূগোলের বই লাইব্রেরি থেকে এনেছি।

একটা বন্ধুও এই এক মাসে আমাকে দেখতে আসেনি। সেই কবে রাণু এসেছিল। রাণুরা জানুয়ারির শেষে ফিরবে। ও বলেছে ফিরে এসেই ওর জবাবটা আমাকে জানিয়ে দেবে।

নীচে অনেক লোক এসেছে, শুনতে পাচ্ছি — দীপকের গলা পেলাম মনে হল? ও কি এসেছে? খুব আনন্দ হল — চোখে জল এসে গেল। সিঁড়িতে অনেক পায়ের শব্দ — এত লোক কারা আসছে? হুড়মুড় করে প্রায় জনা কুড়ি ছেলে ঘরে ঢুকে পড়ল। আশ্রমের ছেলেরা, ছোট, বড়, আমার সহপাঠীরা — অনেক ছেলে।

দীপকও এসেছে। ও বলল, 'কেমন আছিস, অনুরণ ?'

বললাম, 'খুব ভাল আছি রে, তুই কেমন আছিস ?'

আমি তাড়াতাড়ি চোখটা মুছে নিলাম — ওরা দ্যাখেনি। চোখে এত জল যে কোথা থেকে আসে —

বাচ্চা ছেলেগুলো একসঙ্গে প্রশ্ন করছে, 'অনুদা, তুমি স্কুলে কবে আসবে? সবাই তো ফর্ম জমা দিয়ে দিয়েছে।'

দীপক — এ কী? তুই ভূগোল পড়ছিস কেন?

আমি — ওই — একটু দেখছি। দিদিকে হেল্প করছি।

অসীম — তোর নিজের বইগুলো কোথায়? একটাও দেখছি না তো?

দীপক — কী হয়েছে, আমাকে বল অনুরণ — আমরা কানাঘুষো শুনেই এসেছি। তুই নাকি আর্টস নিয়ে পরীক্ষা দিবি ?

আমি — ঠিকই শুনেছিস। আমি আর মিশনে যাব না, নেতাজি বিদ্যায়তন থেকে এ বছর পরীক্ষা দেব — আর্টস নিয়ে।

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল — 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমরাও দেখছি তুমি কী করে এটা কর। তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে না। আমরা সবাই মিলে HM-এর কাছে, স্বামীজির কাছে যাব।'

দীপক — ক্ষমা না চাইতে হলে তুই আমাদের সঙ্গে পরীক্ষা দিবি তো?

আমি — না রে, তোরা পারবি না। কেউ তোদের কথা শুনবে না। তোরা তো আগেও বলেছিস, কোনও লাভ হয়েছে? তাছাড়া, আমার আর মিশনে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই — আমার সায়েন্স পড়ার ইচ্ছেই চলে গেছে।

দীপক — পাগলামি করিস না। আমি দেখছি কী করা যায়।

আমাকে অনেক আদর করে, অনেক ভালোবাসা জানিয়ে ওরা চলে গেল — আমি আবার একা হয়ে গেলাম। উফফ, ভগবান, আমি কী করবো?

আবার অ্যাটলাস খুলে বসলাম — ম্যাপ পয়েন্টিংটা শেখা জরুরি।

আজ জানুয়ারির ৩১ তারিখ — এখনও জানি না, কী করব আমি — কী পড়ব, আর্টস না সায়েন্স? আর তো সময় নেই— ২৫শে মার্চ HS পরীক্ষা।

খুব অস্থির হয়ে উঠছি — আমাকে যেন একটা খাঁচার মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়েছে, মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছি— কিছুতেই পারছি না। কিছুই ভাল লাগছে না — কোনও সাবজেক্টই পড়তে ইচ্ছে করছে না।

আজ সকালে অঙ্ক নিয়ে একটু বসেছিলাম, দেখলাম, বেশ কিছু অঙ্ক করতে অসুবিধে হচ্ছে। সেগুলো আগে চোখ বন্ধ করে করতে পারতাম। ইতিহাস, ভূগোলের অনেক নতুন নতুন তথ্য আমার ব্রেনে ঢুকেছে আর নিজেদের জায়গা করার জন্য ওরা আগের শেখা অনেক কিছুই ব্রেনের বাইরে ফেলে দিয়েছে।

খুব রাগ হল। এরকম কেন হবে? শেখা জিনিস ভুলে যাচ্ছি কেন?

বড়দি সকালের জলখাবার নিয়ে এলো, দুধ-মুড়ি — আমার রাগ গিয়ে ওর উপর পড়ল।

রেগে গিয়ে বলে উঠলাম, 'ঘরে আসার সময় দরজায় নক করে আসতে পারিস না?'

বড়দি বললো, 'অনু, খাবারটা খেয়ে নে ভাই—'

আমি — খাবো না যা — নিয়ে যা। আর, কেউ আসবি না আমার ঘরে—

বড়দি — ঠিক আছে, আসব না, তুই খেয়ে নে — এখানে রাখলাম।

আমি — বেরিয়ে যা — আমি খাবার ফেলে দেব কিন্তু। শিগগির নিয়ে যা—

বড়দি খাবারটা টেবিলে রাখল, আমার কাছে এসে আমার মাথাটা জড়িয়ে ধরল, ও নিঃশব্দে কাঁদছিল। বললো, 'অনু, খাবার নিয়ে কোনওদিন রাগ করবি না। তুই আমাকে মার — কিন্তু খেয়ে নে ভাই —'

আমি ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সরে বসলাম আর চোখ মুছতে থাকলাম। বড়দি উঠে গিয়ে চামচ দিয়ে আমাকে খাইয়ে দিতে লাগল — পুরোটা খাইয়ে ও হাসল — 'গুড বয়' বলে আমার মাথার চুলগুলো ঘেঁটে দিল, তারপর বাটি আর খালি জলের গ্লাস নিয়ে চলে গেল।

আমি বেসিনে মুখ ধুয়ে এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়ালাম — রাগটা কিছুতেই যাচ্ছে না। এই সায়েন্সের বইগুলোই যত নষ্টের গোড়া — এগুলোকে বিদায় করি।

সব বইগুলো — ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, স্ট্যাটিকস, ডিনামিকস, অঙ্ক — সব বই একটা একটা করে র‍্যাক থেকে বের করে দরজা দিয়ে করিডরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে থাকলাম। আস্তে আস্তে রাগ কমতে লাগল। শেষ বইটা, মোটা অরগ্যানিক কেমিস্ট্রির বইটা ছুঁড়ে বাইরে ফেলতেই কে যেন বইটা হাতে তুলে নিল।

দেখলাম দরজায় দাঁড়িয়ে আছে রাণু — আমার প্রাণের রাণু। একমাস পর দেখছি, আরও সুন্দরী হয়েছে ও — কিন্তু কাঁদছে কেন ও? ছিঁচকাঁদুনি মেয়ে আমার একদম ভাল লাগে না।

তেরো

রাণুর (ঝিলিক বসু) কথা —

আমাদের 'দক্ষিণ ভারত' ভ্রমণ শেষ হল — একমাস পর আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। আমি ক্লাস টেনে ফার্স্ট হয়ে উঠেছি— অনু নিশ্চয় জেনেছে আর জেনে খুশি হয়েছে। রেজাল্ট বেরুনোর দিন রাত্রে আমরা ম্যাড্রাস মেলে উঠেছিলাম, অনুকে বলে আসতে পারিনি। আর সেদিনই শুনেছি, ও নাকি আর্টস নিয়ে HS দেবে — আমাদের ছেলেদের স্কুল থেকে। শুনে খুব মন খারাপ হয়ে গেছে আমার।

এই এক মাস আমি সারাক্ষণ অনুর কথা ভেবেছি — ওর কি ক্ষমা চাওয়া উচিত? ওর তো কেরিয়ারই শেষ হয়ে যাবে। একটু আলোচনা করলে হত — কার সঙ্গে করব? বাবাকে বলব? না না, বাবা যদি সন্দেহ করে? যদি বুঝে যায় আমি অনুকে ভালোবাসি?

অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত বাবাকেই বললাম। ঘরে দিদি আর মা-ও ছিল। হোটেলের ঘরের জানালা দিয়ে পাহাড় দেখা যাচ্ছিল — আমরা ফেরার পথে ওয়াল্টেয়ারে এসেছি।

আমি বললাম, 'বাবা, জানো তো — অনুরণ বলে একটা ছেলে, মিশনের ফার্স্ট বয়, পরীক্ষায় কী একটা রচনা লিখে টিচারদের অপমান করেছে, তাই ওকে টেস্টে অ্যালাউ করা হয়নি। এখন যদি ও ক্ষমা চায়, তাহলে HS-এ বসতে পারবে। ক্ষমা না চাইলে পারবে না।'

বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, আমি শুনেছি — অনুরণকে আমি চিনি।'

আমি — তুমি চেনো? কি করে চেনো? কে বল তো?

বাবা — ওই তো, যাদের বাড়ি তুই গান শিখতে যাস, সেই বাড়ির দিদিমণির ছেলে — যার সঙ্গে তুই বড়মাঠে গিয়ে গল্প করিস।

একদম লাল হয়ে গেলাম লজ্জায়, মাথা তুলতে পারছিলাম না। বাবা, মা, দিদি — ওঁরা সব জানে? সবাই খুব গম্ভীর হয়ে আমাকে দেখছিল।

কোনও রকমে বললাম, 'তুমি কী করে জানলে?'

বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন, আমার মাথার চুল ঘেঁটে দিলেন, বললেন, 'রাণু, আমি তোর বাবা — আমার এই ছোট্ট সুন্দরী মেয়েটা কার সঙ্গে মিশছে, কোথায় যাচ্ছে, আমি জানব না?'

দিদি বলে উঠল, 'অনুর যেদিন রেজাল্ট বেড়িয়েছিল, তুই কাঁদতে কাঁদতে বালিশ ভিজিয়ে ফেলেছিলি, মনে আছে? আমরা তো তখনই তোদের ব্যাপার সব জানতাম — তোকে বলিনি।'

আমি বললাম, 'কিন্তু, "বড়োমাঠ"?'

এবার মা কথা বললেন, 'মিঠু তোদের সব কথা আমাদের বলেছে।'

আমি — (নীচুস্বরে) বিশ্বাসঘাতক।

বাবা — মিঠু তোর সত্যি ভাল বন্ধু রে, ও তোর জন্য খুব ভাবত, তুই ভুল না করে বসিস। অনুরণ একটা ব্রিলিয়ান্ট ছেলে, অনেক, অনেক উন্নতি করবে, পরে তোকে যদি ভুলে যায়, তুই যদি কষ্ট পাস — মিঠু সে কারণেই আমাদের সব বলে দিয়েছিল।

আমি তাও লজ্জায় মুখ তুলতে পারছিলাম না।

বাবা বললেন, 'এখন বল, কী বলতে চাইছিস ?'

আমি বললাম, ‘আমার মনে হয় অনুরণের ক্ষমা চাওয়া উচিত। ওর বাবা, মা ওকে সেটা বলছেন না কেন? ওরা অনুরণের উপর সব ছেড়ে রেখেছেন — অনুরণ কি বুঝবে? একটা বাচ্চা ছেলে—’

বাবা বললেন, ‘শোন, ওঁরা ঠিকই করছেন, আমার নিজের ছেলের ক্ষেত্রে এ রকম ঘটলে আমিও কিছুতেই তাকে ক্ষমা চাইতে বলতে পারতাম না। তাতে সারা জীবন যদি আমাদের শাকভাত খেয়ে থাকতে হয়, তবুও — অন্যায় না করে ক্ষমা চাওয়ার কোনও প্রশ্নই আসে না।’

আমি — কিন্তু, অনুরণ তো শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওর আশা, স্বপ্ন, কেরিয়ার — সব ভেঙে যাচ্ছে তো। রেজাল্ট বেরুনোর দিন শুনে এসেছি, ও নাকি আর্টস নিয়ে HS দেবে — আমাদের ছেলেদের স্কুল থেকে। ভাবতে পারো?

বাবা — তুই ভাবিস না — ও যা মেধাবী, দেখবি ও আর্টস নিয়েও বোর্ডে স্ট্যান্ড করবে। তুই একটা হীরের টুকরো ছেলেকেই বন্ধু করেছিস, মা —

আমি — না — আমি চাই, ও ক্ষমা চাক, এখন আপোস করুক — এতেই ওর লাভ।

বাবা — সেটা ঠিক। কিন্তু ও তোর কথা শুনবে না —

আমি — শুনবে। আমি বোঝাব — ও ঠিক শুনবে আমার কথা।

সকাল দশটা নাগাদ অনুর বাড়ি গেলাম। দিদিমণিকে প্রণাম করলাম। দিদিমণি আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন, ‘ঝিলিক, খুব খুশি হয়েছি — তুমি ফার্স্ট হয়েছ। রেজাল্ট বেরোনোর পর তো আর তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি।’

দিদিদেরও প্রণাম করলাম, ওরা আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করল। বড়দির চোখে জল, ও কী একটা বলছিল।

আমি জিগ্যেস করলাম, ‘কী হয়েছে, রূপাদি ?

রূপাদি বলতে লাগল, অনুর খুব মন খারাপ, খেতে চায়নি, খুব রাগ হয়েছে — এখন সায়েন্সের বইগুলোর উপর রাগ দেখাচ্ছে, বইগুলো ছুঁড়ে ঘরের বাইরে ফেলে দিচ্ছে। বলতে বলতে রূপাদি কাঁদতে থাকল। আমারও কান্না পেয়ে গেল— দিদিমণিকে জিগ্যেস করলাম, ‘দিদিমণি, আমি একটু অনুদার ঘরে যাব?’ দিদিমণির চোখেও জল, বললেন, ‘যাও দ্যাখো, তোমার কথা শোনে কিনা। কয়েকদিন ধরেই ও খুব অশান্ত, অস্থির হয়ে পড়েছে।’

দিদিদের নিয়ে অনুর ঘরে গেলাম — পুরো করিডরটা বইয়ে ভর্তি। সব সায়েন্সের বইগুলো অনু ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। আমার খুব রাগ হল। এ কী? একটা মোটা বই এসে প্রায় আমার পায়ের কাছে পড়ল, তুলে নিলাম, অরগ্যানিক কেমিস্ট্রির বই।

অনু আমাকে দেখল, দেখতেই থাকল, আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে গেল। দিদিরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছিল।

আমি অনুকে দেখলাম — এ কোন লোক? একে তো আমি চিনি না? একটা হতাশ হেরে যাওয়া লোক, কাঁধ ঝুলে পড়েছে — সেই ভাবুক চোখ কোথায় গেল? কোথায় সেই আত্মপ্রত্যয়? আমার অনু হেরে যাচ্ছে, এই ঘোর বান্ধববিহীন সংসার সমুদ্রে ও ডুবতে চলেছে — আমি কথা দিয়েছিলাম, ওর সঙ্গে থাকব।

ওকে বাঁচাতেই হবে। বড়রা, আমার বাবা, অনুর বাবা, মা — সবাই যাই বলুক, আমার যা ভাল মনে হয় তাই করব, করতেই হবে।

আমি জানি, সোনালিদি, রূপাদি আমাদের সব কথা শুনতে পাবে, কিন্তু এখন ও সব ভাবার সময় নেই। আমার অনুকে বাঁচাতেই হবে, অনেক দেরি হয়ে গেছে —

চোদ্দো

অনুরণের কথা

রাণু কাঁদছিল — কিন্তু ওর চোখ জ্বলছে, যেন আগুন বেরোচ্ছে। সেদিন মা ও এরকম জলে ভেজা আগুনচোখে তাকিয়ে ছিল।

রাণু বলে উঠল, ‘এই বইগুলো তোমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় — তুমিই একদিন বলেছিলে। আর আজ বইগুলো এভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছ?’

আমি বললাম, ‘আয় রাণু, ভাল আছিস? কতদিন পর তোকে দেখলাম। সাউথ ইন্ডিয়া থেকে আমার জন্য কী এনেছিস?’

রাণু যেন আমার কথা শুনতেই পেল না— বলল, ‘বইগুলোর আর প্রয়োজন নেই, তাই ফেলে দিচ্ছ? তাহলে, আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে আমাকেও এভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেবে?’

আমি বলে উঠলাম, ‘কী বলছিস? তুই আর এই বইগুলো এক হল?

রাণু — কেন? আমি কীসে আলাদা?

আমি — সে কথা আবার আমাকে দিয়ে বলাবি? তুই আমার সব — তোকে ঘিরেই তো আমি বাঁচতে চাই। ও হ্যাঁ, তুই ফিরে এসে আমায় কিছু বলবি বলেছিলি — এখন বল না, শুনি?

রাণু — শুনবে? বলছি — তুমি চাও আমরা দুজন সারা জীবন একসঙ্গে থেকে এই সংসারসমুদ্র পাড়ি দেই — তাই তো? আমি রাজি আছি, তবে, আমার একটা জিনিস চাওয়ার আছে তোমার কাছে। যদি তা আমাকে দাও, তাহলেই আমি রাজি হব— জীবনেও তোমার কাছে আর কিছু চাইব না আমি।

আমি অবাক হয়ে গেলাম, বললাম, ‘কী জিনিস? আমি কি দিতে পারব?’

রাণু বলল, ‘পারবে। আগে বলো দেবে কি না — তাহলেই চাইব।’

বললাম, ‘নিশ্চয় দেব — তুই জানিস তো, তোকে অদেয় আমার কিছু নেই।’

রাণু একটু হাসল, আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। ও একটু চোখ মুছে নিল, গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বেশ স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, ‘কাল স্কুলে গিয়ে ক্ষমা চাইবে, কালই HS-এর ফর্ম ফিল-আপ করবে।’

একদম থ হয়ে গেলাম — কী বলছে ও? কী দৃপ্ত ভঙ্গিমায় ও দাঁড়িয়ে আছে, আমি মোহিত হয়ে গেলাম। এই মেয়ের মধ্যে এত তেজ?

রাণু আবার কথা বলে উঠল, ‘তোমাকে এখন কিছু বলতে হবে না — আমি চললাম। কাল স্কুল থেকে ফেরার সময় আমাদের বাড়ি এসো, আমি অপেক্ষা করব। যদি তুমি অন্য কিছু করার কথা ভাবো, ভাবতেই পারো — তাহলে আমাদের বাড়িতে আর এসো না। সেক্ষেত্রে, আমাদের কিন্তু এটাই শেষ দেখা — ভালো থেকো।’

এই বলে রাণু রাজেন্দ্রাণীর মত পা ফেলে ঘুরে দাঁড়াল — একবারও পিছু ফিরে দেখল না। দিদিরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল — রাণু ওদের ডেকে নিল — ওরা চলে গেল।

বেশ হালকা লাগছে। যেন একটা পাষাণ বুকের উপর চাপানো ছিল — সরে গেছে। নীচে বসার ঘরে এলাম — মা আর দিদিরা গল্প করছে।

মা ডাকলেন — আয় অনু, বোস — চা খাবি?

আমি — হ্যাঁ খাব — জানো, রাণু কী বলল?

মা — সোনালি ভাল করে চা কর, আমরা সবাই খাব। হ্যাঁ। বল অনু, ঝিলিক কী বলল।'

আমি — রাণু বলে গেল, আমি যেন কাল স্কুলে গিয়ে ক্ষমা চাই আর কালই যেন HS–এর ফর্ম ফিল-আপ করে ফেলি।

মা হাসলেন, বললেন, 'ভাল তো, তাই কর। টাকা নিয়ে যাস আর একদম সকালেই যাবি। ঝিলিক ঠিক কথাই বলেছে— বুঝদার মেয়ে। এখন তাহলে আবার পড়া শুরু করে দে — গল্পের বই পড়া একদম বাদ, আর সময় নেই। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মা।'

বড়দি বললো, 'ওঃ মা, রাণু অনুকে যা বলল না — তুমি যদি শুনতে। অনুকে একদম চুপ করিয়ে দিল। বই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া, রাগ দেখানো — সব থেমে গেল। ওইটুকু মেয়ে, কী পারসোনালিটি।'

মা হাসতে হাসতে বললেন, 'তাই না কি ? বল বল, শুনি — ঝিলিক কী বলল।'

আমি লজ্জা পাচ্ছিলাম — ছোড়দি চা নিয়ে এল, চা খেয়েই আমি পালালাম।

একটা রুটিন বানাতে হবে, একদম সময় নেই। সকাল ছ'টা থেকে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত — সারাদিন ঘড়ি ধরে শুধু লেখা আর লেখা। মক টেস্ট। অনেক পড়তেও হবে মনে হচ্ছে — আগে পুরো কোর্সটা চোখের সামনে ভাসত, এখনও ভাসছে, তবে বেশ কিছু অংশ ঝাপসা হয়ে গেছে। সেগুলোকে আবার স্পষ্ট করতে হবে।

সকাল দশটার একটু আগেই স্কুলে চলে এলাম। লম্বা করিডর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, ডানদিকে সব ক্লাসরুমগুলো পড়ছে। ছেলেরা আমাকে দেখছে, ওরা বেরিয়ে এসে পিছু নিল, 'অনুদা তুমি এসেছ?' 'খুব ভাল করেছ, অনুদা' 'অনুদা, আজই ফর্ম ফিল-আপ করবে তো?'— ওরা খুশি হয়ে অনেক কিছু বলছিল। আমার পেছনে ছেলেদের ভিড়টা বেড়েই যাচ্ছিল। সব ক্লাস থেকে প্রায় সব ছেলেরাই বেরিয়ে এসেছে।

করিডরের শেষে তিনটে বড় ঘর, অফিস ঘর, টিচার্স রুম আর প্রধান শিক্ষকের ঘর। আমি প্রধান শিক্ষকের ঘরে নক করে বললাম, 'স্যার ভেতরে আসব?' স্যার বললেন, 'এসো।' আমি ঘরে ঢুকলাম, ছেলেরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল।

নতুন প্রধান শিক্ষক মিঃ শশাঙ্ক ব্যানার্জি আমাকে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। ওনার সঙ্গে আমার এই প্রথম দেখা— উনি আমায় চেনেন না। আমি বললাম, 'স্যার, আমার নাম অনুরণ রায়।'

শশাঙ্কবাবু বেশ খুশি হলেন, বললেন, 'ওঃ অনুরণ, তুমি এসেছ? চলো, টিচার্স রুমে যাই। না, থাক — টিচারদের এখানে আসতে বলছি। তুমি বোসো, আমি এখুনি আসছি।'

দরজা খুলেই উনি অবাক হয়ে গেলেন — বললেন, 'এ কী? তোমরা সব এখানে কী করছ? যাও — সবাই ক্লাসে যাও।'

ভিড়ের মধ্যে একটা ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'স্যার, অনুদা আজ ফর্ম ফিল-আপ করবে তো?'

শশাঙ্কবাবু বললেন, ‘হ্যাঁ, করবে। তোমরা এখন যে যার ক্লাসে চলে যাও। অমূল্য — টিচারদের আমার ঘরে ডেকে নিয়ে এস, বলো, অনুরণ এসেছে। আর অফিসে নির্মলবাবুকেও ডাকো, উনি যেন ফর্ম ফিল-আপের সব পেপার্স নিয়ে এখানে চলে আসেন।’

শশাঙ্কবাবু ফিরে এলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই সব টিচাররা এসে গেলেন, বিরাট ঘরটা প্রায় ভরে গেল — আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

শশাঙ্কবাবু বললেন, ‘অনুরণ, আমরা আজকালের মধ্যেই তোমাকে ডেকে আনার জন্য তোমার বাড়ি যেতাম।’

প্রবীর স্যার (কেমিস্ট্রি)— অনুরণ, তোমাকে কারও কাছে ক্ষমা চাইতে হবে না।

দিলীপ স্যার (বাংলা)— তুমি তো কোনও অন্যায় করোনি — একটা রচনায় যে কেউ তার মত প্রকাশ করতেই পারে।

আমার ‘বর্ম’ খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল — আমি কেঁদে ফেললাম।

স্যামুয়েল স্যার, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, আমাদের ইংরাজি পড়াতেন, ইংরাজি উচ্চারণ, অ্যাকসেন্ট শেখাতেন, আমার মাথায় হাত রাখলেন, বললেন, ‘Be steady, boy — Why are you crying?’

আমি বললাম, ‘Sorry, Sir — It was beyond my imagination that my “Essay” could hurt somebody's feelings. If I have displeased anybody — I swear that it was purely unintentional.’

জ্যোতি স্যার (ফিজিক্স) — অনুরণ, সব ভুলে যাও — এখুনি ফর্ম ফিল-আপ করো। তোমার দুর্ভাগ্য, HS-এর আগে প্রায় পয়ঁতাল্লিশটা অমূল্য দিন তোমার নষ্ট হল। তুমি এই ক্ষতি পূরণ করতে পারবে — আমার বিশ্বাস আছে তোমার উপর।

আমি দেখলাম, সবাই আমার দিকে ব্যথিত মুখে তাকিয়ে আছেন। অবনীস্যার, সুদীপস্যার আর দু’চার জন ছাড়া সব টিচাররাই আজ এখানে আছেন। আমি মনে মনে বলতে থাকলাম, আপনারা রেজাল্টের দিন কেন সবাই চুপ করে থাকলেন, স্যার? কেন অবনীস্যর, সুদীপস্যার আমাকে ওরকম কষ্ট দিলেন? জ্যোতিস্যার যেন আমার মনের কথা বুঝে ফেললেন, বললেন, ‘আমি লম্বা ছুটিতে ছিলাম রে, আমি থাকলে কিছুতেই এরকম ঘটতে দিতাম না।’

হেডমাস্টার শশাঙ্কবাবু বললেন, অনুরণ, ফাইনাল পরীক্ষার পর অনেকেই ছুটিতে ছিলেন, আমিও ছুটিতে ছিলাম। সবাই থাকলে নিশ্চয় তোমায় এমন দুঃখ পেতে হত না। যাই হোক, মনে আর কোন ক্লেশ রেখো না, শুধু পড়ে যাও। আর, তুমি বসো, তোমাকে ফর্ম ফিল-আপ করতে হবে।

আমি বসলাম, অফিসের নির্মলবাবু অনেক পেপার্স নিয়ে এসেছেন। আমার রেজাল্ট শিট আর পরীক্ষার খাতাগুলো দেওয়া হল, আমি দেখতে থাকলাম। শশাঙ্কবাবু আর নির্মলবাবু ফর্মটা ফিল-আপ করতে থাকলেন।

বাংলা সেকেন্ড পেপারে আমি আটাত্তর পেয়েছি — ছয় জন টিচার লাল কালি দিয়ে ‘—৫’ লিখে সই করেছেন — তাই, পেপারের মার্কস দাঁড়িয়েছে আটচল্লিশ। রচনাটায় প্রথমে পনেরো (কুড়ির মধ্যে) দেওয়া হয়েছিল। ছ’টা ‘-৫’-এর জন্য নম্বর এসে দাঁড়িয়েছে ‘—১৫’, হেঁ হেঁ —

রেজাল্টশিটে আমার টোটাল ৮১৮। আমার অনুমান ঠিকই ছিল। আরও ৩০ যোগ হলে টোটাল হত ৮৪৮ — প্রিটেস্টের চেয়েও বেশি — নতুন রেকর্ড — হেঁ হেঁ। রেকর্ডই হল — আমার ৪৫টা দিন নষ্ট হল।

শশাঙ্কবাবু — এখানে, এখানে আর এখানে সই করো, অনুরণ। এই রশিদটা রাখো — টাকাটা কাল এসে দিয়ে যেও। পরীক্ষার খাতাগুলো দেখা হয়ে গেলে দিয়ে দাও — টেস্টের খাতা বাড়িতে নেওয়া যায় না।

আমি — আমি টাকা এনেছি স্যার —

ব্যাস, আমার ফর্ম ফিল-আপ হয়ে গেল। টিচাররা সবাই এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন — কেউ চলে যাননি। এবার ওঁরা আস্তে আস্তে চলে যেতে শুরু করলেন। সবাই আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে যাচ্ছিলেন — আমিও দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে ওঁদের নমস্কার করলাম।

প্রধান শিক্ষক শশাঙ্কবাবু বললেন, 'অনুরণ, তুমি তো জানো, আমি পুজোর পর জয়েন করেই ছুটিতে চলে গেছি— তোমার রেজাল্ট বেরোনোর দিন আমি ছিলাম না। ছুটি থেকে এসে তোমার কথা শুনলাম। রেকর্ড থেকে তোমার সব রেজাল্টগুলো দেখলাম। তুমি খুবই ভাল ছেলে, আমার অনেক আশা রইল তোমার উপর। সব ভুলে গিয়ে মন দিয়ে পড়াশোনায় লেগে যাও।'

আমি শশাঙ্কবাবুকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম।

স্কুল থেকে বেরিয়ে এলাম। এবার রাণুর বাড়ি যেতে হবে, ও বলেছে আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। সাড়ে এগারোটা বাজে — রাণুর বাড়ির লোকেরা কী ভাববে ?

রাণুদের বাড়ি গেলাম, দরজায় নক করলাম — রাণু যেন রেডি হয়ে বসেছিল। দরজা খুলে সাদরে ডেকে নিয়ে সোফায় বসাল। এই প্রথম ওদের বাড়ি এলাম। বেশ বড় ঘর, ভাল করে সাজানো। সোমা এল, রাণুর মা এলেন, আমি রাণুর মাকে প্রণাম করলাম।

রাণুর মা বললেন, 'থাক থাক, বাবা। ফর্ম ফিল-আপ করলে?'

আমি — হ্যাঁ।

উনি খুব খুশি হলেন, আমার মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, 'তোমরা গল্প করো, আমি যাই। তোমার তো ক্ষিদে পেয়েছে দেখছি — খাবার আনছি, দাঁড়াও।'

উনি চলে গেলেন। মায়েরা কী করে যে মুখ দেখে বুঝে যান, আমার সত্যি বেশ ক্ষিদে পেয়েছিল।

সোমা হেসে বলল, 'মা-কে প্রণাম করলে — আমিও কিন্তু একটা প্রণাম পেতে পারি। সম্পর্কে আমি বড়ো'

আমি — কীসের সম্পর্ক, সোমা ?

সোমা — হেঁ হেঁ — রাণু সব বলে দিয়েছে —

আমি বেশ লজ্জা পেয়ে গেলাম — বললাম, 'আমিও তোমার আর দেবুর ব্যাপার তোমার মাকে সব বলে দেব।'

সোমা হাসতে হাসতে বললো, 'মা জানে, মশাই, হিহিহি—'

রাণু এল, শাড়ি পালটেছে, হাতে একটা প্যাকেট। ওর মুখে হাসি লেগেই আছে, কী সুন্দরই যে লাগছে ওকে।

রাণু প্যাকেটটা আমাকে দিয়ে বলল, এই নাও, তোমার জন্য আমার ছোট্ট উপহার। মাইসোর থেকে কিনেছি, সম্পূর্ণ আমার টাকায়। বাবা আমাকে যা হাতখরচ দেন, তা থেকে জমিয়ে এটা কিনেছি।

আনন্দে রাণুর মুখ উদ্ভাসিত — ও খুব হাসছে।

বললাম, 'কী আছে এতে?'

ও বলল, 'খুলেই দ্যাখো।'

প্যাকেটটা খুললাম — একটা চন্দনকাঠের বাক্স, তার মধ্যে সুন্দর কারুকার্যে ভরা চন্দনকাঠের পাঞ্জাবির বোতামের সেট, বারোটা বোতাম — চারটে গলার, চারটে হাতার, চারটে এক্সট্রা। আমি অভিভূত হয়ে গেলাম, এই প্রথম কেউ আমায় এতো সুন্দর কিছু উপহার দিল। কোনও কথাই বলতে পারছিলাম না।

'পছন্দ হয়েছে ?' রাণু জিগ্যেস করল।

'খুব' আমি বললাম, 'তোমাকে এখন এর বদলে আমি কী দেই ?'

রাণু বলল, 'আমি তো তোমায় বলেইছি, আমি কোনওদিন আর তোমার কাছে কিছু চাইব না। তুমি যা দেবে আমি মাথা পেতে নেব।'

সোমা হি হি করে হেসে ফেলল, বললো, 'উফ, কী পাকা মেয়ে — সব উপন্যাসের ভাষা — তুই পারিসও রাণু—'

আমরা সবাই হাসতে থাকলাম। ওদের মা অনেক খাবার নিয়ে এলেন — আমরা সবাই মিলে খেতে থাকলাম।

পনেরো

রাণুর (ঝিলিক বসু) কথা (শেষ পর্ব)

অনুর HS পরীক্ষা হয়ে গেল। বিকেলে অনুর বাড়ি গেলাম। জিগ্যেস করলাম, 'কেমন হল, পরীক্ষা?'

অনু বলল, 'ভাল হল না রে, আরো ভাল হতে পারতো। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি — দুটোতেই ১০, ১৫ করে নম্বর বাড়ানো যেত। ইংরাজি, বাংলা দুটোই এত lengthy question হয়েছে, ৮, ১০ করে নম্বর কম পাব। মোট কথা, প্রিটেস্টে যা পেয়েছিলাম, তার চেয়ে ৩০, ৪০ নম্বর কম পাব। ৮০০-র এদিক ওদিক থাকবে।

আমি দেখেছি, এই ৪৫ দিন অনু কীভাবে পড়েছে। ও যেন সব ভুলে গিয়েছিল — ও কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল, গান করতে ভুলে গিয়েছিল, হাসতে ভুলে গিয়েছিল, প্রেম করতে ভুলে গিয়েছিল — সারাদিন খালি পড়া আর পড়া — পড়া তো নয়, লেখা। টেস্ট পেপার খুলে, ঘড়ি ধরে — সারাদিন ধরে মক টেস্ট দিয়ে চলেছে। আমিও অনেক কিছু শিখলাম ওকে দেখে। দেখলাম, একজন ভাল ছাত্র কীভাবে নিজেকে তৈরি করে।

অনুর রেজাল্ট বেরোল — আশ্চর্য ওর ক্যালকুলেশন, অনু ৮০১ পেয়েছে, পাঁচটা 'লেটার' — বোর্ডে ও ফিফথ হয়েছে। ফার্স্ট যে হয়েছে, সে পেয়েছে ৮১২ — অনুর থেকে মাত্র এগারো নম্বর বেশি।

রেজাল্টের খবর শুনে আমি কেঁদে ফেললাম —

ওর যদি সেই ৪৫ দিন নষ্ট না হত, সেই ৪৫ দিন ধরে ও যদি ইতিহাস, ভূগোল না পড়ত, ওর মা, বাবা যদি আরও আগে ওকে স্কুলে পাঠাতেন, ওর যদি সায়েন্স পড়ার ইচ্ছেই না চলে যেত — তবে আমি নিশ্চিত জানি, আমার অনু এই এগারো নম্বর তো বটেই — আরও অনেক নম্বর বেশি পেয়ে, রেকর্ড নম্বর পেয়ে বোর্ডে ফার্স্ট হত।

আমি কাঁদতেই থাকলাম — এ আনন্দাশ্রু যে থামছেই না।

বিকেলে অনুদের বাড়ি গেলাম। দিদিমণি আমাকে আদর করে ঘরে নিয়ে গেলেন — বসার ঘরে সবাই ছিলেন — অনু, অনুর বাবা, দিদিরা — সবাই।

দিদিমণি বলে উঠলেন, 'রাণু, এই মিষ্টিগুলো তোকে সব খেতে হবে।'

অনুর বাবা বললেন, 'রাণু, এই লিচুগুলো খাও, তুমি লিচু ভালোবাস, তাই তোমার জন্য অনেক লিচু এনেছি।'

দিদিমণি আমাকে এই প্রথম ঝিলিক না বলে রাণু বলে ডাকলেন, তুই করে বললেন — আমাকে আপন করে নিলেন। বাবাও মনে করে রেখেছেন, আমি লিচু ভালবাসি।

বাবা,-মা কে আমি প্রণাম করলাম।

বাবা বললেন, 'রাণু, বড়দের অনেক সময় ভুল হয়ে যায়, ছোটদের কাছে তখন শিখতে হয় — তুমি সঠিক সময়ে এসে পড়ে আমাদের যে কী বিপদ থেকে রক্ষা করলে —

সোনালিদি — তুই বললি বলেই অনু স্কুলে গেল, পড়াশোনা শুরু করল।

রূপাদি — তুই আমাদের ছোট্ট ভাইটার সত্যিকারের বন্ধু।

আমি আর অনু, দুজনেই খুব লজ্জা পাচ্ছিলাম — দিদিমণি আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, আদর করে চুমু খেলেন। উনি আমায় আশীর্বাদ করলেন, 'বেঁচে থাকো মা, সারা জীবন সুখে থেকো। অনু — যা, রাণুকে তোর ঘরে নিয়ে যা—'

আমরা দোতলায় অনুর ঘরে চলে এলাম।

অনু খুব খুশি, সেই আত্মবিশ্বাস যেন ফিরে এসেছে — বলল, 'রাণু, আমাদের আর 'বড়মাঠে' যাবার দরকার নেই। আমরা এখানেই গল্প করতে পারি। তুই বলেছিলি রেজাল্ট বেরোনোর পর তোর সব কথা বলবি — এখন বলবি? বল না?

আমি প্রাণ খুলে হাসলাম — অনু মুগ্ধ হয়ে দেখল — সেই ভাবুক চোখ —

অনু অধৈর্য হয়ে আবার বলল, 'কী রে? বলবি তো?

আমি হেসে বললাম, 'বলছি—'

অলংকরণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

গল্প

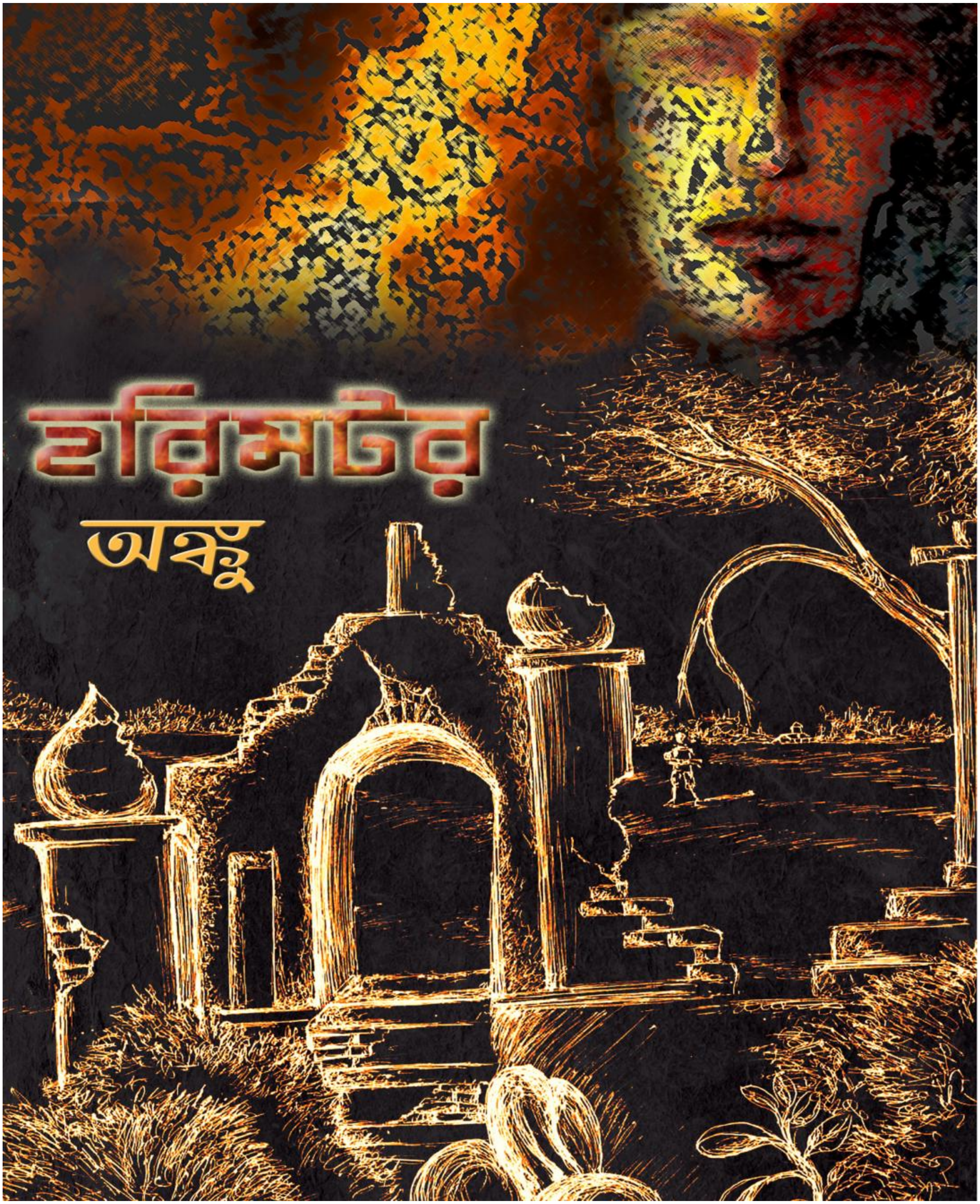

মৃগাঙ্কবাবু

বেজায় চিন্তায় পড়েছেন। এইরকম ধ্যাদ্ধ্যারা গোবিন্দপুরে যে তাকে হঠাৎ বদলি করে দেবে এটা তিনি সত্যিই ভাবেননি। পুলিশের চাকরির প্রথমে কয়েক বছর এরকম কয়েকটা ঝিঁ ঝিঁ ডাকা গ্রামে তাকে থাকতে হয়েছিল বটে কিন্তু দীর্ঘ দশ বছর তিনি কলকাতা শহরের আশেপাশেই থেকেছেন। থানার বারান্দায় চা হাতে দাঁড়িয়ে সামনের পাহাড়ের পিছনে সূর্যটাকে মিলিয়ে যেতে দেখতে দেখতে মৃগাঙ্কবাবু বেজায় চিন্তা করছিলেন যে গিন্নি এসে কী বলবে। মৃগাঙ্কবাবু ডাকসাইটে দারোগা হতে পারেন কিন্তু বাড়িতে গিন্নির রাগকে তিনি বেশ ভয় করে চলেন। বদলির চিঠি হাতে পেতে দেরি হওয়াতে গিন্নি ছেলেপুলে সবাইকে একসাথে নিয়ে আসা হয়নি, তারা আসবে হপ্তা দুয়েক পরে। কিন্তু এখন গ্রামের চেহারা দেখে মৃগাঙ্কবাবু ভাবছেন যে ওরা না এলেই ভাল হয়। আজীবন শহরে থাকা সুমিতা কি এই গ্রামে থাকতে পারবে?

সন্ধে হতেই শেয়াল ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। চতুর্দিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। গ্রামের অর্ধেক জায়গায় মোবাইলে টাওয়ার থাকে না। তার থানার মধ্যে যে গ্রামগুলো পড়ে মৃগাঙ্কবাবু সবকটাই ঘুরে ফেলেছেন গত কয়েকদিনে। অপরাধ নয়, বাড়ির সন্ধানে। এখনো অবধি একটা ঠিকঠাক বাড়ি পাওয়া যায়নি যেখানে তারা থাকবেন। অর্ধেক বাড়ি কাঁচামাটির। আর যে বাড়িগুলো বড়সড় পাকা দালান কিছু না জেনে আগে থেকেই তাদের অনুগ্রহ নিতে পারছেন না মৃগাঙ্কবাবু। কয়েকদিন ধরে তিনি থানাতেই শুচ্ছেন। তা বলে বউ ছেলেপুলে নিয়ে তো আর থানার ভেতরে আস্তানা গাড়া যায় না। নাঃ খুবই চিন্তার বিষয়।

ভোরবেলা হেঁটে একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলেন মৃগাঙ্কবাবু। এ তার অনেক দিনের অভ্যাস। গত কয়েকদিনে গ্রামের দিকটা দেখা হয়ে গেছে বলে আজ থানার পিছনের আমবাগানটা ঘুরে দেখছিলেন তিনি। আমবাগানের পরে পাহাড়টা দেখা যায় থানার বারান্দা থেকেই। দাঁতন করতে করতে বাগানের বুক চিরে পাহাড়ের দিকে হাঁটা লাগালেন তিনি। কিলোমিটারখানেক পরে আমবাগানটা শেষ হয়ে গেল। মৃগাঙ্কবাবু দেখলেন সামনে একটা বিশাল মাঠ, তারপরে পাহাড়টা। পরে একদিন পাহাড়ের দিকে যাবেন ঠিক করে মৃগাঙ্কবাবু আমবাগানের ধার ধরে হাঁটতে শুরু করলেন। জায়গাটা বেশ সুন্দর। তবে কেউ আসে বলে মনে হচ্ছিল না মৃগাঙ্কবাবুর। খানিকটা হাঁটার পরেই উৎফুল্ল মৃগাঙ্কবাবু আবিষ্কার করলেন একটা সুন্দর বাংলো বাড়ি। মাঠের একদম ধার ঘেঁষে। মৃগাঙ্কবাবু ঘুরে ঘুরে বাড়িটা ভাল করে দেখলেন। একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ি। বাড়িটার চারপাশে বেশ খানিকটা জায়গা। একটা কুয়ো আছে জল ভর্তি। পেছনের দিকটায় আগাছায় আর বড় বড় গাছে ভরা একটা বাগান। আম, পেয়ারা আর জামরুল গাছগুলো চিনতে পারলেন মৃগাঙ্কবাবু। তারপর একটা বড়সড় মজা পুকুরও আছে। তার পেছনে অন্য কোন বাড়ির বাগান শুরু হয়েছে। একদমই ফাঁকা। কেউ থাকে বলে মনে হল না। নীচে বাড়ির চারিদিকে চওড়া বারান্দা। দোতলাতেও একই রকম বারান্দা। বাইরে থেকে দেখে শুনে বাড়িটা খুবই পছন্দ হল মৃগাঙ্কবাবুর। বেশ ফাঁকা জায়গাটা। একদমই চেঁচামেচি কলকোলাহল নেই। কে এই বাড়ির মালিক? মৃগাঙ্কবাবু ঠিক করে ফেললেন এই বাড়িটাই ভাড়া নেবেন তিনি। থানার লোকগুলো একদম গাড়োল। থানার এত কাছে এরকম সুন্দর একটা বাড়ি আছে আর ওরা কি না বাড়ির জন্য তাঁকে ছয় সাতখানা গ্রাম ঘুরিয়ে মারছে।

সূর্যদেব মাথার উপর বেশ খানিকটা উঠে এসেছে। থানায় ফিরবেন বলে মৃগাঙ্কবাবু ঘুরতেই দেখলেন একটা সিড়িঙ্গেপানা এক মুখ দাড়িগোঁফওলা লোক একটা কলার কাঁদি হাতে নিয়ে তাকে জুলজুল করে দেখছে। পাগল টাগল না কি? ভাবলেন মৃগাঙ্কবাবু। কিন্তু নাহ চোখ দেখে তো সুস্থ মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। কথা বলেই দেখা যাক।

"এ্যাই কে রে?"

"এজ্ঞে বাবু আমি হরিমটর। আপনে বুঝি বাড়িটা কিনবেন?"

যাক পাগল ছাগল নয় তাহলে। "হুমম। তুমি কি বাড়িটা দেখাশোনা করো ?"

"তা একরকম বলতে পারেন বাবু। এদিকপানে তো কেউ আসেনি। আমি থাকি, আমি দেকি।"

"তা এই বাড়িটা কাদের তুমি বলতে পারো?"

"এ তো আচায্যিদের বাড়ি।"

"হুমম। তা এই বাড়িতে তো কেউ থাকে না। আচার্যরা থাকে কোথায়?"

"তারা বাবু একেনে থাকে না। শহরে থাকে।"

"শহর মানে? জেলা শহর?"

"তা তো বাবু জানেনি। তবে বাবু থানায় জানতি পারে।"

"ঠিক আছে। ঠিক আছে।"

মৃগাঙ্কবাবু থানায় ফিরে আচার্যদের বাড়ির ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করলেন। দেখা গেল তার ধারণাই ঠিক, আচার্যরা জেলা শহরে থাকে। এমনকী আচার্যদের একটা ফোন নাম্বারও পাওয়া গেল। মৃগাঙ্কবাবুর ফোন পেয়ে কমল আচার্য খুবই খুশি। তাদের টাকার প্রয়োজন, এত বড় বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তা ভাড়া হয় না কিছুতেই। জেলা শহরটা এই গ্রাম থেকে বেশ দূরে। তিন চার ঘন্টা ট্রেনে যেতে হয়। তাই মৃগাঙ্কবাবু একদিন বেলাবেলি বেরিয়ে পড়লেন। কমল আচার্যর সঙ্গে দেখা করে অগ্রিম টাকা দিয়ে কাগজপত্র তৈরি করে বাড়ির চাবি নিয়ে ফিরলেন। দুই দিন পরে গিন্নি আসবে। আর কোন অসুবিধা নেই। শুধু ঐ ব্যাটা হরিমটরকে দিয়ে ঘরদোরগুলো পরিষ্কার করে নিতে হবে। কমলবাবু বলেছেন ভেতরে কিছু আসবাব আছে সেগুলো মৃগাঙ্কবাবু ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পারেন।

সুমিতাদেবী দুই ছেলে মেয়ে সৌম্য আর অনুকে নিয়ে গতকাল সন্ধ্যাবেলা এসে পৌঁছেছেন। এখনও সমস্ত বাক্সপ্যাঁটরা খুলে জিনিস গোছানো হয়নি। সুমিতাদেবীর এই বাড়ি মোটেও পছন্দ হয়নি। এরকম আগাছা ঘেরা বাড়িতে দুটো বাচ্চা নিয়ে থাকার ইচ্ছা একদমই নেই তাঁর। তিনি পইপই করে সৌম্য আর অনুকে পিছনের জংলা বাগানের দিকে যেতে বারণ করে দিয়েছেন। শিয়ালটিয়াল থাকতেই পারে, নিদেনপক্ষে সাপখোপ থাকাও আশ্চর্যের নয়। তবে বাড়িটা বেশ বড়সড়। ঘরগুলো খোলামেলা, আলো হাওয়ায় ভরপুর। একতলায় একটা শোবার ঘর, একটা বসার ঘর, রান্নাঘর ও বাথরুম। আর দোতলায় দুটো শোবার ঘর আর বাথরুম। জমিটার চারদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

"কে বলেছিল তোমায় এরকম জনমানবহীন জায়গায় ঘর ভাড়া নিতে? বাজারের কাছে ঘর পেলে না তুমি? এখান থেকে সবচেয়ে কাছের বাড়িটাতে যেতে হলেও কম করে দশ মিনিট হাঁটতে হবে।" জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে মৃগাঙ্কবাবুকে দেখতে পেয়েই সুমিতাদেবী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

"এত বড় বাড়ি, তারপরে খাট আলমারি চেয়ার টেবিল সবই পাওয়া গেল। অথচ ভাড়া কত কম বলো! বাজারের কাছে ঘর নিলে দিবারাত্রি চিৎকার চেঁচামিচি তার থেকে বাপু এই ভাল।"

"আমার তো বাপু কেমন কেমন লাগছে সেই এসে থেকে। এরকম বড় বাড়ি তারপরে জিনিসপত্র সাজানো গোছানো। এত কম ভাড়া! নিশ্চয়ই এ বাড়ির কিছু গোলমাল আছে, তোমায় বোকা পেয়ে গছিয়ে দিয়ে গেছে।"

"গছিয়ে দেবার কী আছে? আমি তো আর বাড়ি কিনে নিইনি। থাকো না কিছুদিন যদি অসুবিধা হয় তো অন্য বাড়িতে উঠে যাব, কিন্তু এই ভাড়ায় এত সুবিধে আর কোথাও পাওয়া যাবে না।"

এই বলে মৃগাঙ্কবাবু একটা ইজিচেয়ারকে ঝেড়েঝুরে তার উপরে গা এলিয়ে দিলেন। সুমিতাদেবী দেখতে পেয়ে তেড়ে এলেন। "জিনিসপত্র গোছানোর নাম নেই। উনি শুয়ে পড়লেন। ওঠো বলছি, ওঠো। এখন ফাঁকা আছে, কাজকর্ম নেই কোথায় সব গুছিয়ে ফেলবে তা নয়।"

"আরে এখন ফাঁকাই ফাঁকা। এই তিন হপ্তা হল তো এসেছি। একটা ছিঁচকে চুরির কেস পর্যন্ত আসেনি। এই এলাকাটা খুবই শান্তিপ্রিয়।"

"তা শান্তিপ্রিয় হলেই ভাল। যা সব কাজ। সারাক্ষণ খুন জখম দাঙ্গা হাঙ্গামা।"

মৃগাঙ্কবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে জানলা দিয়ে সুমিতাদেবী দেখলেন বাড়ির পাঁচিল টপকে কে যেন বাড়ির ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে।

"এ্যাই কে রে? কে ওখানে?" সুমিতাদেবী দৌড়ে গেলেন বারান্দায়।

একটা সরু হাড়গিলে দেহ পাঁচিলের গা বেয়ে টিকটিকির মত নেমে এসে একগাল দেঁতো হাসি হেসে বলল "বাবু আমায় চেনেন মা। আমি হরিমটর। আপনেদের চাকর।"

মৃগাঙ্কবাবু একটা চাকরের বন্দোবস্ত পর্যন্ত করে ফেলেছেন দেখে সুমিতাদেবী যারপরনাই খুশি হলেন। নাহ লোকটা বেশ সংসারী হয়েছে।

মৃগাঙ্কবাবু গলা বাড়িয়ে হরিমটরকে উপরে উঠে আসতে বললেন।

"ও হল হরি। তোমরা আসার আগে বাড়িঘরদোর তো ও-ই ঝেড়ে পুঁছে চারপাশের আগাছা কেটে পরিষ্কার করে দিল। খুব কাজের ছেলে। তা তোমার চাকর লাগবে ভেবেই আমি ওকে আসতে বলেছিলুম।"

হরিমটর অবিলম্বে খোরাকি আর মাসে পাঁচশ টাকায় বহাল হয়ে গেল।

আগাছা পরিষ্কার, কাঠ কাটা, কুয়ো থেকে জল তোলা, ঘরদোর মোছা, জামা কাপড় কাচা, বাসন মাজায় দেখা গেল হরিমটর একেবারে এক নম্বর।

সৌম্য আর অনুর এসে থেকেই জায়গাটা ভীষণ ভাল লেগে গেছে। কলকাতায় তো মা ঘরের বাইরে বেরোতেই দিত না। সামনেই ছিল বড় রাস্তা। সারাক্ষণ গাড়ি চলছে, যদি কিছু হয়ে যায় এই ভয়ে। এখানে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। আমবাগানের আলোছায়ার খেলা। দূরের পাহাড়ের গম্ভীর হাতছানি সৌম্য আর অনুকে পাগল করে তুলল। এখানে নতুন স্কুলে ওরা ভর্তি হবে। তার আগে অবধি দুজনেরই পড়াশুনার কোন চাপ নেই। দুই ভাই বোনে মনের আনন্দে সারাদিন ধরে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারা দুদিনেই আবিষ্কার করে ফেলল আমবাগানের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে থানায় পৌঁছতে সময় লাগে দশ মিনিট, কিন্তু রাস্তা দিয়ে ঘুরে গেলে আধা ঘন্টার বেশি লেগে যায়।

একদিন বিকেলবেলা রোজকার মতই সৌম্য অনুকে নিয়ে ঘুরতে বেরোল। হরিমটরকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল অনু। **"**ও হরিমটর দাদা আমাদের সাথে চল না। গ্রামটা ঘুরিয়ে দেখাবে। আমরা একা একা বেশি দূর যেতে পারি না। তুমি গেলে আমরা সেই নদী অবধি ঘুরে আসব।**"**

কিন্তু হরিমটর কিছুতেই যেতে চাইল না। **"**উরিবাবা ঘরে বলে কেতো কাজ আছে। আমি তোমাদের সাথে যাব কী করে**?** আমি চলে গেলে তোমরা ফিরে এসে খাবে কী**?"** বলল হরিমটর।

সৌম্য অনুকে নিয়ে পাড়া বেড়াতে বেরোল। সুমিতাদেবী আগের দিনের মতোই এক ঘন্টার মধ্যে ফেরার কথা বলে দিলেন। সৌম্য আর অনু রাস্তা ধরে বেশ খানিকটা গিয়ে ঠিক করল আজ আর থানার দিকে যাবে না। সেইখানেই একটা বাড়ির সামনের উঠোনে তিনটে বাচ্চা ছেলেমেয়ে এক্কা দোক্কা খেলছিল। সৌম্য আর অনুকে দেখে তারাও খেলা থামিয়ে দেখছিল। ওদের মধ্যে একটু বড় একটা মেয়ে এগিয়ে এল।

"তোমরা খেলবে? আমাদের কুমিরডাঙ্গা খেলার লোক পাচ্ছি না তাই এক্কা দোক্কা খেলছি। তোমরা খেললে কুমিরডাঙ্গা খেলতে পারি। তবে প্রথম দানে তোমায় কিন্তু কুমির হতে হবে ভাই।"

সৌম্য রাজি হতে মেয়েটি বলল — "আমার নাম টুসি। এ লাটাই আর ও মিষ্টি। তোমাদের নাম কী?"। নামধাম বলে সৌম্যরা টুসিদের সাথে খেলায় মেতে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই খেলা বেশ জমে গেল। যখন খেলা শেষ হল তখন সূর্য ডুবে গেছে। ছায়া ছায়া অন্ধকার নেমে আসছে। সৌম্য বেজায় চিন্তায় পড়ল মা মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবে। অনুদাদার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল যে দাদা কী ভাবছে।

"দাদা দাদা বাড়ি চল। অনেক দেরি হয়ে গেছে মা খুব রাগ করবে।"

"কী হয়েছে অনু?" টুসি এগিয়ে এল।

"বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে টুসিদিদি। আমাদের বাড়িটা একটু দূরে তো অনেকটা যেতে হবে। যেতে যেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। মা খুব বকবে।" সৌম্য বলল। মা তো আর অনুকে পেটাবে না সৌম্যকেই দেবে উত্তম মধ্যম এই ভেবে সৌম্য বেজায় কাতর হয়ে পড়ল।

"ও। তোমরা থাকো কোথায়? " টুসির প্রশ্নের উত্তরে সৌম্য তাদের বাড়ির জায়গাটা বোঝানোর চেষ্টা করল।

"ওঃ মাঠের পাশে বাংলো বাড়ি। ও তো আচার্যদের বাড়ি। তবে ওখানে গেলে আমার তো ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। আমি বরং তোমাদের একটা রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি তোমরা ওটা দিয়ে ছুটে চলে গেলে বেশিক্ষণ লাগবে না। তবে সাবধানে যাবে। একটা মজা পুকুর আছে। আর ঝোপঝাড় আছে। সাবধানে।" — এই বলে টুসি ওদের রাস্তাটা দেখিয়ে দিল। টুসিদের বাড়ির বাগান টপকে একটু মাঠের রাস্তা ধরতেই পাঁচমিনিটে ওরা বাড়ির পিছনের দিকের বাগানটায় পুকুরের পাড়ে চলে এল।

"হেই দাদাবাবু গো। আমি সেই কখন থেকে বসি আছি তোমাদের জন্য। তাড়াতাড়ি চলো গো। মা দেখলি ভীষণ বকবি।" হরিমটর ওদের জন্য বাড়ির পিছন দিকে এসে অপেক্ষা করছিল।

"মা উঠে পড়েছে গো হরিদাদা?"

"এখনও ওঠেনি। তবে উঠতি কতক্ষণ। শিগগিরি চল।"

সুমিতাদেবীর ঘুম ভাঙতে দেরি হওয়াতে সৌম্যর পিঠটা বেঁচে গেল। সুমিতাদেবী যখন ঘুম থেকে উঠলেন ততক্ষণে সৌম্য আর অনু হাত মুখ ধুয়ে দিব্বি ভালোমানুষের মত চানাচুর মুড়ি খাচ্ছে। সাথে হরিমটরের করে দেওয়া গরম পেঁয়াজি।

"দাদা হরিদাদা খুব ভালো তাই না?"

সৌম্য গাল ভর্তি মুড়ি চেবাতে চেবাতে বলল — "ভগবান, ভগবান।"

অনু মনোযোগ দিয়ে মুড়ি খাচ্ছিল দাদার কথায় সে একটু ধন্দে পড়ল। মুড়ি খাওয়া থামিয়ে অনু সৌম্যকে জিজ্ঞাসা করল "দাদা ভগবানদের দেখতে তো সুন্দর হয়। তাই না?" সৌম্য মাথা ঝাঁকাল। "তাহলে দাদা হরিদাদাকে দেখতে এত বাজে কেন?"

"তার কারণ আমি ভগবান নই গো দাদাবাবুরা, আমি ভুতি।" হরিমটর এক গাল হাসি আর পেঁয়াজি হাতে করে ঘরে ঢুকল। "প্যাঁজি নেবেন গো দাদাবাবু? দিদিমণি?"

অনু একটু ভয় পেয়েছিল। সেটা দেখে সৌম্য বলল "যত ভুলভাল কথা। তাহলে মোটেও হরিদাদা রান্নাঘরে ঢুকত না। জানিস না ভুতেরা আগুনকে ভয় পায়।"

"হেঁ হেঁ। ওসব আগিকার দিনের ভুতিরা পেত গো দাদাবাবুরা। আজকালকার ভুতি ওসব ভয় টয় পায়নে। হেঁ হেঁ।" পেঁয়াজি দিয়ে হাসতে হাসতে হরিমটর চলে গেল।

সৌম্য খুব মনোযোগ দিয়ে পেঁয়াজি খেতে লাগল।

"দাদা টুসিদিদি আসতে চাইল না কেন বল তো? কী এমন সময় লাগল? পাঁচ মিনিটেরও কম।"

সৌম্যও ব্যাপারটা খেয়াল করেছিল, কিন্তু সে আমল দিল না খুব একটা। "অন্ধকার হয়ে গেছে বলে বোধহয়।"

"না রে দাদা তুই যখন বলছিলি যে তুই কোন বাড়িতে থাকিস তখন টুসিদির মুখটা কেমন যেন হয়ে গেছিল। মনে হল টুসিদি ভয় পেয়েছে।"

"যাহ। ভয় পাবে কেন? ভয় পাওয়ার আছেটা কী এখানে?"

"দাদা এখানে সত্যি সত্যি ভুত নেই তো?"

"ধুসস যতসব ভুলভাল। কাল খেলতে গেলে টুসিদিকে জিগ্যেস করব। ঠিক আছে?"

অনু ঘাড় দোলাল।

দিন বেশ ভালই কাটতে লাগল। ঘরদোর গুছানোর হিড়িক কমে যেতে সুমিতাদেবীও হাতে খানিকটা সময় করে একদিন থানা, একদিন বাজার ঘুরে এলেন। সৌম্য আর অনুর তো এখন নতুন ইস্কুলে ভরতি হওয়া হয়নি। সুমিতাদেবী একদিন হাই স্কুলে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এলেন কবে ফর্ম দেবে ইত্যাদি।

সুমিতাদেবী খোঁজ নিয়ে স্কুল থেকে একটা রিক্সা ধরে ফিরছিলেন। রিক্সাওয়ালাকে বাড়ির রাস্তা বলতে রিক্সাওয়ালা খুব অবাক হয়ে সুমিতাদেবীর দিকে তাকাল।

"আপনি আচায্যিদের বাড়িতে এসেছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ। আমরা এই দিন কয়েক হল এসেছি।"

"আপনারা জানেন না। তাই না?"

"কী জানি না?"

"আমি ঠিক ধরেছি আপনারা জানেন না। তাই আচায্যিদের বাড়িতে এসেছেন। আর কোনো বাড়ি পেলেন না গ্রামে? আচায্যিদের বাড়ি!"

"আরে কী জানি না বলবে তো?"

"সে আমি বলতে পারব না। এই নিন আপনার বাড়ি এসে গেছে।"

"এ কী বাড়ি তো এখনও বেশ খানিকটা।"

"না না আমি আর যাব না। আপনি না হয় আমায় পাঁচ টাকা কম দেবেন।"

সুমিতাদেবী খুবই অবাক হয়ে রিক্সা থেকে নেমে পড়লেন। হেঁটে বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে সুমিতাদেবি ঠিক করলেন আজ বিকেলে সৌম্য আর অনুর সাথে বেরিয়ে ওরা যে বাড়িতে খেলতে যায় সেখানে যেতে হবে। কারোর সাথে আলাপ পাতিয়ে জিগ্যেস করতে হবে ব্যাপারটা ঠিক কী?

বিকেলে সৌম্য আর অনু যখন খেলতে বেরোচ্ছে তখন মাকে বেরোতে দেখে দুজনে অবাক হয়ে গেল।

"চল তোদের সাথে আমিও একটু ঘুরে আসি। এসে থেকে তো বেরোনো হয়নি একদমই।"

সুমিতাদেবী হরিমটরকে বিকেলের জলখাবারে কী কী হবে জানিয়ে সৌম্য আর অনুর সাথে বেরিয়ে পড়লেন।

টুসি খুবই অবাক হল সৌম্যর মা আসতে। তাড়াতাড়ি গিয়ে ডেকে নিয়ে এল মাকে। টুসির মা বেশ মোটাসোটা মধ্যবয়স্ক মহিলা, গায়ের রঙ কালোর দিকেই কিন্তু মুখটা বেশ সুন্দর। উনি তো সৌম্যর মাকে দেখে অবাক।

"আরে দেখুন দিকি এই তো আপনার কথাই বলছিলাম মেয়েকে। রোজ ছেলেমেয়ে দুটো খেলতে আসে। কই আগে তো দেখিনি। আপনারা নতুন এসেছেন বুঝি এখানে?"

টুসির মা সুমিতাদেবীকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন। আজ আর অন্যরা খেলতে আসেনি তাই তিনজনে বাইরে বসে ভাবছিল কী করা যায়। এমন সময় টুসি বলল — "চল মাঠে যাই, ওখানে কেউ আসতে পারে। না হলে তোদের শিবের মন্দির দেখিয়ে আনব।"

"শিবের মন্দির কোথায় গো ?"— সৌম্য জানতে চাইল।

"ওই মাঠের ওপর। তোদের বাড়ির আগেই পরে। তাই তো আচার্যরা বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।"

"মন্দিরের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে গেল?"

"আরে না না। মন্দিরের জন্য কেন হবে? মন্দির তো ভাল।"

"তাহলে গেল কেন?"— সৌম্য বেশ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

"খারাপ কিছুর জন্য গেছে?" – অনু জিজ্ঞেস করল।

"এত কথায় কাজ কী। ওসব মন্দিরটন্দির দেখতে যেতে হবে না। আমি ভেতরে যাই।" বলে টুসি উঠে ভেতরে চলে যাচ্ছিল। সৌম্য আর অনু মিলে টেনে বসাল। "না না টুসিদিদি আমরা কোনও কথা বলব না। চলো মন্দির দেখে আসি।"

তিনজনে মিলে বনবাগান ঠেঙিয়ে মাঠ পার করে মন্দির দেখতে গেল। সৌম্যরা দেখল প্রথম দিন ওরা যে রাস্তা দিয়ে বাড়ির পিছন দিকে পৌঁছে ছিল সেখান দিয়েই টুসি ওদের নিয়ে যাচ্ছে।

"এই দিকেই তো আমাদের বাড়ি।" — অনু বলল।

"হ্যাঁ আমি জানি। আর এই হল সীমান্ত শিবের মন্দির।"— একটা ঝোপঝাড়ে ঢাকা বড় বড় চারটে ঝাঁকড়া গাছের নীচে ভাঙাচোরা একটা মন্দির না ধ্বংসস্তূপ কী দেখিয়ে টুসি বলল।

"এ তো কয়েকটা ইঁট গো শুধু টুসি দিদি" — অনু বলল।

"খুব পাকা হয়েছো। জানো সীমান্ত শিব আছে বলেই আমরা বেঁচে গেছি। "

"সীমান্ত শিব কী?" — সৌম্য খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল। "এরকম নাম তো আগে শুনিনি।"

টুসি সীমান্ত শিবের উদ্দেশে টপ করে দুটো প্রণাম করে নিয়ে বলল — "এরকম ভয়ঙ্কর জায়গা আর আছে নাকি যে শুনবে! এই হল সীমানা। ব্যাস্ এখান অবধিই আসা যায়। আর যাওয়া যায় না।"

"কই আমরা তো প্রতিদিনই যাই। কিছু হয় না তো" – অনু আগ বাড়িয়ে বলে উঠল।

টুসি স্পষ্টতই শিউরে উঠল — "এই জন্যই তো আচার্যদের বাড়িতে কেউ থাকে না।"

"আমরা থাকি তো।" — অনু জোর দিয়ে বলল। "কই কিছু হয় না তো।"

টুসি খানিকক্ষণ ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলল। "তাই তো মা বলছিল যে তোমাদের তাড়াতাড়ি ওই বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।"

সৌম্য আর অনু এ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

রাত্রিবেলায় খাওয়া দাওয়ার পর সবাই ঘুমাতে চলে গেলে সুমিতাদেবী দোতলার বারান্দায় একটা মোড়া টেনে এনে বসলেন। মৃগাঙ্কবাবু ওখানে আগে থেকেই বসে হাওয়া খাচ্ছিলেন।

"জানো আজ সৌম্য-অনুর সাথে সেনদের বাড়িতে গেছিলাম।" মৃগাঙ্কবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন সুমিতাদেবীর দিকে। "আরে টুসিদের গল্প করে না ছেলেমেয়ে দুটো রোজ। যাদের বাড়িতে খেলতে যায় গো ওরা। ওই বাড়িতে গেছিলাম আজকে।"

"তা ভাল, তা ভাল। সারাদিন বাড়িতে বসে থেকে কী করবে? তার থেকে এখানকার লোকজনের সাথে চেনা পরিচয় হবে। ভাল ভাল।"

"মোটেও ভাল নয়। সেনগিন্নি যা বললেন তাতে তো আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যাচ্ছে।"

"এই তোমাদের এক স্বভাব। খালি অন্যের কোথায় নাচো। কে কী বলল কী না বলল অমনি সেটা নিয়ে বসে রইলে।"

"তুমি আমার কথাটা আগে শুনবে না কি নিজেই বক বক করবে ভেবেছ?"— ঝাঁঝিয়ে উঠলেন সুমিতাদেবী। মৃগাঙ্কবাবু চুপ করে মাথা নাড়লেন। "সেনগিন্নি বলল ঐ যে তাল খেজুরের ঝোপটা আছে, ওদিক থেকে আসার পথে মাঠের মধ্যে পড়ে যে টা আমাদের বাড়ির পিছনদিকে গেলে দেখা যায়। ওই ঝোপটার ওখানে নাকি একটা শিবের মন্দির আছে। সীমান্ত শিব।"

"কী শিব ?"

"সীমান্ত শিব। ওই শিবের মন্দিরটাই নাকি সীমানা তার এইদিকে কখন কেউ আসে না। ওরা কেউ এই দিকে কোনওদিনও আসেনি।"

"সে আবার কী? সীমানা মানে কীসের সীমানা? কেউ আসে না কেন?"

"আরে ঠিক এই কথাগুলোই আমি সেনগিন্নিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাতে উনি খুলে কিছু বললেন না। দেখলুম সীমান্ত শিবের উপর খুব ভক্তি। যতবার নাম করছে ততবার প্রণাম করছে। উনি শুধু বললেন যে এপারটা শিবের ভক্তদের আর ওই পারটা মানে আমাদের বাড়ি আর ওই মাঠ হল শিবের চ্যালাচামুন্ডার। "

"সে আবার কী?"

"এবার বুঝে নাও। যা বললাম। "

"ধুসস ! যতসব। শিবের চ্যালাচামুন্ডা মানে ভুত প্রেত তাই তো। বোকা পেয়েছে তোমায় ওই জন্য ভুতের গল্প শুনিয়েছে। বোগাস যত।" — মৃগাঙ্কবাবু এখানকার লোকগুলোর উপর ভারী খাপ্পা হয়ে উঠলেন।

"আরে না গো শুধু যে সেনগিন্নি বলছিলেন তা নয়।"

"আবার কোন গিন্নির সাথে দেখা করে এলে?"

"গিন্নি নয়।" বলে সুমিতাদেবী সেই রিক্সাওয়ালার অদ্ভুত ব্যাবহারের কথাও মৃগাঙ্কবাবুকে বললেন।

মৃগাঙ্কবাবুর ভুরুতে একটা কোঁচ পড়ল। তিনি চুপ করে বসে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে থাকলেন। "এ আবার কী রকম ব্যাপার? এই একবিংশ শতাব্দীতে লোক সত্যি সত্যি ভুতে বিশ্বাস করে?"

মৃগাঙ্কবাবুর কথার উত্তরেই যেন সারা মাঠ জুড়ে হু হু করে হাওয়া উঠল। দূরে মনে হতে লাগল সারা মাঠে আগুন লেগেছে। অজস্র লোকের কোলাহল শোনা যাচ্ছে দূর থেকে। কারা যেন চেঁচিয়ে কি সব বলছে। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মৃগাঙ্কবাবুর সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠল। মনে হল কারা যেন আগুন থেকে বাঁচতে ছুটে আসছে তাঁর দিকে। হাজারে হাজারে লোক ছুটে আসছে। কারোর হাত নেই, কারোর পা নেই। সব বিকট বিকৃত দেহাবয়ব দৌড়ে আসছে। মৃগাঙ্কবাবুর সারা শরীর অসাড় হয়ে গেল। চিন্তাভাবনা গুলিয়ে গেল। জলন্ত মূর্তিগুলো আরও কাছে আসতে তিনি স্পষ্টই তাদের গলে যাওয়া মুখগুলো দেখতে পেলেন। সবাই যেন বিকট চিৎকার করতে করতে ঘিরে ধরছে তাকে। দর দর করে ঘামতে লাগলেন মৃগাঙ্কবাবু। সুমিতাদেবীর গলাও পেলেন মৃগাঙ্কবাবু। চেঁচিয়ে বলতে গেলেন "এখানে এসো না। পালাও।" কিন্তু গলা থেকে একফোঁটা আওয়াজ বেরোল না তার।

"কী তখন থেকে শুয়ে শুয়ে গোঁ গোঁ করছ? ওঠো, ওঠো বলছি।" সুমিতাদেবী ঠেলা দিলেন মৃগাঙ্কবাবু কে। "আরে হল কী। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছ আবার।"

মৃগাঙ্কবাবু ধড়ফড় করে উঠে বসে সুমিতাদেবীর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

"উঠে পড়ো, সকাল হয়ে গেছে। হরিমটরও চলে এসেছে। এখুনি চা হয়ে যাবে। আরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছ কী?"— সুমিতাদেবী চলে গেলেন।

মৃগাঙ্কবাবু তখনও স্বপ্নের রেশ কাটাতে পারেননি। বেশ কিছুক্ষণ থম মেরে বিছানার উপর বসে রইলেন তিনি। সুমিতাদেবী চা নিয়ে এসে আবার ঠেলা দিলেন মৃগাঙ্কবাবুকে। "কী এমন স্বপ্ন দেখলে যে তখন থেকে এমন করছ ?"

"ও কিছু নয়। একটা বাজে স্বপ্ন।" মৃগাঙ্কবাবু স্ত্রীর হাত থেকে চায়ের কাপ নিতে নিতে ঠিক করলেন এখুনি সুমিতাকে এসব ব্যাপার কিছু বলা যাবে না, আগে নিজে যাচাই করে দেখতে হবে সত্যি সত্যি কিছু আছে না এসব সাধারণ লোকের রটনামাত্র।

থানায় গিয়ে মৃগাঙ্কবাবু খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করলেন সীমান্ত শিবের মাঠ সম্পর্কে। কন্সটেবলগুলি অধিকাংশই নতুন ছেলে তারা ওসব কিছুই জানে না। তারা থাকেও অন্যদিকে এইদিকের মাঠ সম্পর্কে তাদের আগ্রহ বিশেষ নেই। সীমান্ত শিবের নাম শুনেছে কিন্তু আর কিছুই তারা সেরকম বলতে পারল না। মৃগাঙ্কবাবু বিরক্ত হয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন। সময় গড়িয়ে চলল। মৃগাঙ্কবাবু খানিকটা আনমনে থানার কাজ করতে করতে ভাবছিলেন আগের রাতে দেখা স্বপ্নের কথা। এরকম বীভৎস রকমের স্বপ্ন তিনি আগে কখন দেখেননি। উপরন্তু স্বপ্নটা এতটাই সত্যি মনে হচ্ছে যে মৃগাঙ্কবাবু জেগে উঠেও অনেকক্ষণ বিশ্বাস করতে পারেননি যে তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। এমনকী এই থানার লোকজনের মাঝে বসেও যখন তিনি স্বপ্নের কথা ভাবছিলেন তখন আবারও শিউরে উঠলেন। "নাহ ওইসব ভুলভাল কথা ভেবে মাথা খারাপ করার কোন দরকার নেই।" – এই ভেবে মৃগাঙ্কবাবু জোর করে কাজে মন বসালেন।

দিনের শেষে থানা থেকে বেরনোর সময় থানার বুড়ো চৌকিদার চরণ মৃগাঙ্কবাবুর কাছে এসে নীচু স্বরে বলল - "বাবু আপনার সাথে কিছু কথা আছে।"

"কী ব্যাপারে।"

"আজ্ঞে আপনি যে ব্যাপারে জানতে চাইছেন, সেই ব্যাপারেই।"

"সীমান্ত শিবের ব্যাপারে?"

"হ্যাঁ বাবু।" — চরণ চট করে একটা প্রণাম করে নিল সীমান্ত শিবের উদ্দেশে। "আপনি তো বাবু আচার্যদের বাড়িতে আছেন। তা আপনি কিছু দেখেননি বা শোনেননি ?"

"আমরা আজ দু' সপ্তাহের উপরে আছি ওখানে চরণ। এখনো কিছুই হয়নি আমাদের। আমি জানি না তোমাদের কীসের সংস্কার, কিন্তু আমরা কিছুই দেখিনি বা শুনিনি বা অনুভবও করিনি যাতে করে বলব যে ওখানে কিছু একটা আছে যা খারাপ।"

"কিন্তু বাবু এই গ্রামের কেউ ওই সীমানার ওধারে যায় না। শুধু এই গ্রাম নয় আশেপাশের গ্রামের লোকেরাও যায় না।"

"কেন বলতে পার?"

"কারণ ওইটাই সীমানা। তারপর আর যেতে নেই।"

"সত্যি কি কখনও কিছু ঘটেছে?"

"হ্যাঁ ঘটেছে। একবার গিয়েছিল এই গ্রামের তিনটে ছেলে। পরে তিনজনকেই মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে সীমান্ত শিবের মন্দিরের ওখানে।"

"বলো কী। পুলিশ যায়নি? চোরডাকাতের কাজ হতে পারে তো।"

"পুলিশ তো গেছিল স্যার কিন্তু কোনও কিনারা করতে পারেনি। এমন কী আগের দারোগাবাবুও ঐ মাঠ এড়িয়ে চলতেন। এই বছর খানেক আগে বাড়িটায় এক মাড়োয়াড়ি এসে ছিল। ওই মাঠে জমি কিনে ফ্যাক্টরি করবে না কীসব ব্যাবসা করবে বলে। তারপরে একদিন দেখা গেল সেও চোখ উলটে মরে পড়ে আছে। সেবার বেশ হইচই হয়েছিল। আগের দারোগাবাবু পল্টন নিয়ে সীমান্ত শিবের মাঠে গেছিল। তারপর মাঠের মাঝে পথ হারিয়ে গোটা তিনদিন পরে থানায় ফিরে এসেছিল সবাই। আমরা তো ভেবেছিলাম দারোগাবাবু বোধহয় আর ওই মাঠ থেকে ফিরে আসবে না। তা বাবু ওরা ফিরে এসেছিল কিন্তু তারপর থেকে আর কেউ কথা বলেনি। সবাই বোবা।"

"হুমম। কিন্তু দ্যাখো চরণ আজ প্রায় দু' সপ্তাহের উপরে হয়ে গেল আমরা আছি আমাদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। এমনকি আমার দুই ছোট ছেলেমেয়েও আছে। ওরাও কিছু দেখে ভয় পায়নি। এই সীমান্ত শিবের মন্দির কত পুরোনো তা কি তুমি জানো ?"

"তা হলে তো স্যার অনেক কথাই বলতে হয়। অনেক পুরোনো ঘটনা।"

"তা বলো। আমার হাতে সময় আছে, শুনি।"

"আচার্যরা ছিল এইখানকার দশ বারোটা গ্রামের জমিদার। ওদের বিষয় আশয়ের কোন অভাবই ছিল না। ঐদিকের মাঠটা ছিল এই গ্রামগুলোর চাষিদের ধানিজমি। কিন্তু আসতে আসতে অধিকাংশ জমি চলে গেল আচার্যদের হাতে। ওই পুরো মাঠটায় তখন ওরা একাই চাষ করাত। ওই শিবের মন্দির আচার্যরা গড়ে ছিল। কিন্তু তখন এর নাম সীমান্ত শিব হয়নি। হঠাৎ করেই গ্রামে ভূতের উপদ্রব শুরু হোল। অনেকেই রাত বিরেতে রাস্তাঘাটে তেনাদের দেখে পেতে লাগল। তো আশেপাশের গ্রামের সব মাতব্বরদের ডেকে আচার্যরা এর একটা বিহিত করার ব্যবস্থা করল। এক বিশাল যজ্ঞ হল। সেইদিন রাতে দেখা গেল পাহাড়ের গায়ে আগুন জ্বলছে। সবাই বলল ভূতেদের ওই পাহাড়ের ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তারপরের দিনই আচার্যদের বাড়িতে আগুন লাগল সেইদিন ওই বাড়িতে গ্রামের অন্যান্য মাতব্বররাও ছিল। সবাই পুড়ে মারা গেল। এত বড় অগ্নিকান্ড আমাদের এখানে আগে কখন ঘটেনি। প্রায় পঁচিশ ত্রিশ জন লোক মারা গেছিলেন। তারপরের দিন আমরা দেখলাম আচার্যদের শিব মন্দির ভেঙে গেছে আর ওখানে পোড়া ছাই দিয়ে লেখা আছে সীমান্ত শিব।"

"এই ঘটনা কতদিন আগে ঘটেছিল বলতে পার?"

"খুব বেশি দিন নয় স্যার। বছর ত্রিশের বেশি হবে না।"

"ওই ঘটনার পর আর কেউ যায়নি ওধারে?"

"না স্যার তা নয়। প্রথম প্রথম তো অত বোঝা যায়নি। অতবড় চাষের মাঠ। আচার্যরা তো সব ছেড়েছুড়ে শহরে চলে গেল। অনেকেই চাষ করার জন্য ওইদিকে যেত। কিন্তু আস্তে আস্তে নানান ঘটনা ঘটতে লাগল। মাঝে মাঝেই কেউ না কেউ ঘরে ফিরত না। দুই একদিন বাদে যখন ফিরত তখন হয় পাগল হয়ে, নয়ত বোবা। লোকে ভয়ে ওইদিকে যাওয়া কমিয়ে দিল। আর ঐ মাড়োয়াড়ির ঘটনার পর থেকে তো কেউ ওদিকে আর পা বাড়ায় না।"

চরণের কাছ থেকে সব ঘটনা শুনে মৃগাঙ্কবাবু বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি এসব কথা বাড়িতে জানালেন না। তার বেশ পছন্দই হয়েছিল বাড়িটা। আর তা ছাড়া ভূতে তো মৃগাঙ্কবাবুকে কিচ্ছুটি বলছে না। এমনকি জানানও দিচ্ছে না যে সে আছে।

দিন দিব্বি কাটতে লাগল। সৌম্য আর অনু ভরতি হল স্কুলে। লোকজনের মুখে উলটোপালটা গল্প আর নিষেধবাণী শোনা ছাড়া অন্য কোন অসুবিধাই মৃগাঙ্কবাবুর পরিবারের কারোর হচ্ছিল না। দেখতে দেখতে আরো মাস খানেক কেটে যেতে ওই সমস্ত কথা চারজনেরই গা সওয়া হয়ে গেল। শুধু সুমিতাদেবী গুন গুন করে মাঝে মাঝে বাড়ি পরিবর্তনের কথা বলতেন।

হরিমটরও প্রায় বাড়ির লোকের মতই হয়ে উঠল। খুঁতখুঁতে আর সন্দেহবাতিকগ্রস্ত সুমিতাদেবীকেও স্বীকার করতে হল যে, হরিমটরের মত কাজের লোক তিনি আর কোথাওই দেখেননি। যেমন বিশ্বাসী তেমনই কাজের সে। এই বাড়িতেই থাকে, কাজ করে। দিনে শুধু একবার করে মাঠ পেরিয়ে কোথায় যেন যায় পাহাড়ের দিকে। তবে এছাড়া সুমিতাদেবী কিছুতেই হরিমটরকে বাড়ির বাইরে বার করতে পারেননি। সে কিছুতেই সৌম্য আর অনুকে ইস্কুল থেকে আনতে যাবে না। এমনকী কোনও কোনও দিন যদি মৃগাঙ্কবাবু তাড়া আছে বলে বাজার করতে না পারেন তখনও তাকে বাজারে পাঠানো যাবে না কিছুতেই। বাইরের কাজ সুমিতাদেবীকেই সব করতে হয়। মৃগাঙ্কবাবু মজা করে বলেন— সবাই যেমন এদিকে আসতে ভয় পায়, তেমনি আমাদের হরিমটর ওইদিকে যেতে ভয় পায়। হরিমটর এইসব কথা শুনলে খুব গম্ভীর হয়ে যায়।

প্রথম প্রথম এই বাড়ি আর সীমান্ত শিবের গল্প শুনে মৃগাঙ্কবাবু হরিমটরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে সে কিছু জানে কি না। তার উত্তরে হরিমটর বলেছিল "তাহলে তো বাবু আমিও ভূত। আমিও তো মাঠেই থাকি।" এই শুনে মৃগাঙ্কবাবুর ধারনা আরও জোরদার হয়েছে যে ভূতটুত কিছুই নেই, ওইসব গেঁয়ো লোকের কুসংস্কার মাত্র।

একদিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। সন্ধে হয়ে গেছে। সবাই দোতলার বারান্দায় বসে চা মুড়ি খাচ্ছে। হরিমটর নিচে রান্না ঘরে রান্নার জোগাড় করছে। এমন সময় দেখা গেল মাঠের পরের পাহাড়টায় আগুন লেগেছে। পাহাড়ের নিচে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। চারজনে মিলে হাঁ করে দেখতে লাগল সেই দৃশ্য। ক্রমশ সেই আগুন যেন বাড়তে লাগল। কিন্তু কী অবাক কাণ্ড আগুন যেন মাঠ বেয়ে এগিয়ে আসছে। মৃগাঙ্কবাবুর মনে পড়ে গেল তাঁর স্বপ্নের কথা। কিন্তু স্বপ্নের মত আগুন বাড়ীর কাছ অবধি এল না। অনেক দূরে মাঠের মধ্যেই যেমন দপ করে জ্বলে উঠেছিল তেমনই হঠাতই নিভে গেল আগুনটা। চারজনে হাঁ করে অন্ধকার মাঠের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে সামলে নিয়ে মৃগাঙ্কবাবু বললেন "একেই বোধহয় আলেয়া বলে।"

"কিন্তু বাবা আলেয়া তো জলা জায়গায় হয়।" — সৌম্য জানতে চাইল।

"তাহলে অন্য কিছু বলে। তোমার বাবার খালি বিজ্ঞান।" — সুমিতাদেবী ঝংকার দিয়ে উঠলেন। "কবে থেকে বলছি অন্য জায়গায় বাড়ি দেখার কথা, কে কার কোথা শোনে। কাল সকাল হলেই আমি বেরবো বাড়ির খোঁজে।"

এই বলে সুমিতাদেবী নীচে গেলেন হরিমটর কী করছে দেখতে। একটু পরেই নীচ থেকে সুমিতা দেবীর চেঁচামিচি শুনে সবাই দুড়দাড় করে নীচে গিয়ে দেখল নীচের খিড়কি দরজা খোলা আর হরিমটরের কোনও পাত্তা নেই।

হরিমটরকে এদিক ওদিক খুঁজে পাওয়া গেল না। সুমিতা দেবী রান্না করতে বসলেন। তার ভয় ভয় লাগছিল বলে লাগোয়া খাবার ঘরের টেবিলে মৃগাঙ্কবাবু একটা বই নিয়ে পড়তে বসলেন। সৌম্য আর অনুও বসল তাদের স্কুলের পড়া নিয়ে।

একটু পরে মৃগাঙ্কবাবু নাক ডাকতে শুরু করলেন। অনু দাদাকে একটা খোঁচা দিল।

"এই দাদা।"

"কী?"

"ওটা কী ছিল রে?"

"কোনটা?"

"ওই যে মাঠে।"

"আগুন ছিল। আবার কী।"

"আগুন ওইভাবে দপ করে নিভে যায় নাকি?"

"সেটাই তো তদন্ত করে দেখতে হবে।"

"কে তদন্ত করবে? তুই নাকি?"

"হ্যাঁ আমিই করব। তোকে কিছু বলব না তুই সব ফাঁস করে দিবি।"

"না না আমি কাউকে কিচ্ছু বলব না। এই বিদ্যা ছুঁয়ে বলছি। বল না রে কী করবি ?"

"হুঁ। তোর সাহায্য আমার দরকার পড়বে বটে। দ্যাখ আমি ঠিক করেছি কাল সকালে আমি ভাতটাত খেয়ে ইস্কুলে যাব বলে বেরোব কিন্তু আমি আসলে ইস্কুলে যাব না।"

"সে কি ইস্কুলে যাবি না? কোথায় যাবি তাহলে?"

"আমি ওই পাহাড়ের দিকে যাব।"

"দাদা তুই একা একা পাহাড়ে যাবি? তোর কিছু হয়ে গেলে?" অনু কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল।

"এই জন্যই আমি তোকে কিছু বলতে চাই না। সবেতেই ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ। ভূতেরা দিনেরবেলা বেরোয় না রে হাঁদি।"

"আমি যাব না তোর সাথে?"

"তুই এতটা হাঁটতে পারবি না। আর তোকে অন্য কাজ করতে হবে। আমার ইস্কুল ব্যাগটা আমি রেখে যাব ওই পুকুরের দিকে আমলকী গাছটার তলায়। তুই ওটা দুপুরবেলায় মা যখন ঘুমাবে তখন চুপি চুপি গিয়ে নিয়ে আসবি। আমার ফিরতে বিকেল হয়ে গেলে মা যদি সন্দেহ করে তবে ইস্কুল ব্যাগটা দেখিয়ে বলবি আমি ইস্কুল থেকে এসে খেলতে চলে গেছি। বুঝলি"

"তুই সন্ধের আগে ফিরে আসবি তো?"

"হ্যাঁ রে। আমি ঠিক সকাল দশটা থেকে দুপুর একটা অবধি হাঁটব। তার মধ্যে যদি পৌঁছোতে না পারি। তবে ফিরে চলে আসব। তাহলেই ঠিক সন্ধের আগেই চলে আসবো বাড়ি।"

"কী করে বুঝবি সময়?"

"বাবার একটা ডায়াল ভাঙা ঘড়ি ছিল না? ওটা তো বাবা পড়ে না। আমি ওটা নিয়ে রেখেছি আমার কাছে। ওতে সময় দেখে নেব।"

অনুর তার দাদার উপর পুরো ভরসা আছে। দাদা তাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিয়েছে অনু মনে মনে এতটাই উত্তেজিত হয়ে উঠল যে রাতে ঠিকঠাক ঘুমই হল না তার। সকাল বেলা ঘুম ভেঙে সে দেখল হরিমটর এক গ্লাস দুধ হাতে তাকে ডাকছে।

"আরে মটরদাদা কাল তুমি কোথায় চলে গেছিলে রাতে? জানো আমরা কী দেখছি কাল রাতে?"

"উসব পোরে হবে দিদিমণি। তুমি তৈয়ার হয়ে নাও জলদি জলদি। ওনেক বেলা হোয়ে গিল।" হরিমটর অনুর ইস্কুলের জামাকাপড় বের করে খাটে রেখে ব্যাগ গুছিয়ে দিল।

সকাল থেকেই মৃগাঙ্কবাবু একটু চিন্তায় আছেন। কারণ সুমিতাদেবী তাঁকে আজ বেরতে দেয়নি। এমনিতে থানায় কাজকর্ম কিছুই নেই। তবে সুমিতাদেবী বলেছেন আজ সৌম্য স্কুলে চলে গেলে আর অনু ইস্কুল থেকে ফিরলে তাকে হরিমটরের জিম্মায় রেখে দুজনে মিলে বাড়ি খুঁজতে যাওয়া হবে। সুমিতাদেবী আর একরাতও এই বাড়িতে থাকতে রাজি নন। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবুর এই বাড়িটা ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছা একদমই নেই। তিনি দারোগা। ভূতের ভয়ে বাড়ি থেকে পালালে পাঁচ গাঁয়ের লোক কী বলবে। তাই সুমিতাদেবী মোটেও মৃগাঙ্কবাবুর উপর বাড়ি খোঁজার দায়িত্ব পুরো ছাড়তে রাজি নন, তিনি নিজেও সাথে যাবেন। চরণ কয়েকটা বাড়ির খোঁজ দিয়েছিল। সেগুলোই আগে ঘুরে দেখবেন বলে ঠিক করেছেন মৃগাঙ্কবাবু। সকালে হরিমটর আসতে কাল রাত্তিরের ঘটনার জন্য হরিমটরকে খুব বলেছেন তিনি। ওইভাবে দরজা খুলে রেখে চলে যাওয়া তার যে একদম উচিত হয়নি তা হরিমটর স্বীকার করে নিয়েছে।

সৌম্য খেয়ে দেয়ে ইস্কুলে বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই অনুকে নিয়ে সুমিতাদেবী ফিরে এলেন।

"আজ দুপুরে আমরা একটু বেরোব হরি। তুমি খুকিকে একটু সামলে রেখো।"

"নিচ্চয় মা। আপনেরা দুজনায় বেরোবেন ?"

"হ্যাঁ হরি, তোমার মা-এর আর এই বাড়ি সহ্য হচ্ছে না তাই আমরা দুপুরবেলা অন্য বাড়ি দেখতে বেরোব। পছন্দ হলে আজই ভাড়াও নিয়ে নেব।" মৃগাঙ্কবাবু বললেন।

"বাবু তাহলে আমার কী হবে?" — হরিমটর হাতজোড় করে বসে পড়ল। "আপনারা চলে গেলে আমার কী হবে বাবু?"

"কেন হরি তুমি যাবে আমাদের সাথে নতুন বাড়িতে।" সুমিতাদেবী বললেন।

"না মা আমি যেতে পারব না।" হরিমটর বলল।

"কেন হরি কী হয়েছে? তুমি যাবে না কেন?" মৃগাঙ্কবাবু অবাক হলেন।

"বাবু ওই গ্রামের লোকেরা আমাদের পছন্দ করে না। আমরা তাই ওই গ্রামে যাই না।"

"তোমরা মানে কারা?"

"বাবু আমরা নীচু জাত তো তাই ওরা আমাদের পছন্দ করেনেকো। আপনেদের কি একেনে কোন অসুবিধা হচ্চে বাবু? আপনে শুধু আমায় বলুন কী হয়েচে। আমি সব অসুবিদা মিটিয়ে দেব বাবু। আপনেরা যাবেন না।" মৃগাঙ্কবাবু লক্ষ করলেন যে হরি স্পষ্টতই এড়িয়ে গেল তার প্রশ্নটা।

"আসলে হরি এখানকার লোকেরা এই বাড়িটা নিয়ে নানারকম কথা বলে। আর কালকে রাতে আমরাও অদ্ভুত আলো দেখছি ওই পাহাড়ে ..." – সুমিতাদেবী একটু কিন্তু কিন্তু করে বললেন।

"মা আজ তো আপনেরা এতদিন এখানে আছেন। কিছু কি হয়েচে? লোক অইসব বলে থাকে।" — হরি আলোর ব্যাপারটাও এড়িয়ে গেল।

"আচ্ছা হরি ঠিক আছে আজ আমরা দেখে আসি কয়েকটা বাড়ি সেই রকম পছন্দ না হলে যাব না।"

হরি মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল। মৃগাঙ্কবাবুকে সুমিতাদেবী জিজ্ঞাসা করলেন "ব্যাপারটা কি বল তো?"। "কী জানি?" — বলে হাত ওল্টালেন মৃগাঙ্কবাবু।

অনুকে লক্ষ্মী হয়ে থাকার আর হরিমটরকে একদম জ্বালাতন না করার নির্দেশ দিয়ে সুমিতাদেবী আর মৃগাঙ্কবাবু দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে হরিমটর যখন এক পাঁজা বাসন মাজতে ব্যস্ত তখন অনু দেখল এই সুযোগ। ও চুপি চুপি চলে গেল পুকুর ধারে আমলকী গাছের দিকে। গিয়ে দেখল দাদা কথামত ওখানে ব্যাগটা রেখে গেছে। ব্যাগটা খুলে দেখল দাদা জলের বোতল আর টিফিন বক্সটা নিয়েই গেছে। অনু ব্যাগটা টানতে টানতে দোতলার ঘরে নিয়ে এল। ব্যাগটা খাটের তলায় লুকিয়ে রেখে হাত পা ধুয়ে এসে লক্ষ্মী মেয়ের মত শুয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙ্গল হরিমটরের ডাকে। "দিদিমণি উঠে পড়ো। সন্ধে হয়ে এল।" অনু চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে পড়ল। বাইরে সত্যি সত্যি অন্ধকার হয়ে এসেছে তখন।

"মা বাবা আসেনি? "

"উনারা তো বলে গেলেন আসতে দেরি হবে। কিন্তু আমার চিন্তে হচ্চে যে দাদাবাবু এলেনি কেন একোনো?"

"দাদা আসেনি এখনও?" — সব ভুলে গিয়ে অনু চেঁচিয়ে উঠল।

"হ্যাঁ। দাদাবাবু তো এলেনি একোনো। "

"ও হরিদাদা কী হবে এবার।" — বাইরের অন্ধকার দেখে কেঁদে ফেলল অনু।

"আ হা এতো চিন্তের কী আচে? গেচে ইস্কুলে। নিচ্চয় কোতাও বন্দুর বাড়ি চলে গেছে।"

"না হরি দাদা। দাদা পাহাড়ে গেছে।"

"কোতায় গেচে?" — হরি আতঙ্কিত হয়ে জিগ্যেস করল।

"পাহাড়ের দিকে যেখানে আগুন জ্বলল কাল। কী হবে গো হরি দাদা।" — অনু কাঁদতে কাঁদতে বলল।

"কোখোন গেচে দাদাবাবু ?"

"সেই সকালবেলা। ইস্কুলে যায়নি আজ ও।"

"না না। এটা ঠিক করেনি দাদাবাবু। আমাকে একুনি যেতে হবে। দিদিমণি তুমি একা থাকতে পারবে?"

"না না হরি দাদা। আমি একা থাকতে পারব না। ওরে বাবা অন্ধকার হয়ে গেছে গো।"

হরি বুঝল যতক্ষণ না অনুর মা বাবা আসছেন ততক্ষণ কোথাও যাওয়া যাবে না। আবার ওই দিকে যত দেরি হবে দাদাবাবু ততই ওই মাঠে অন্ধকারের মধ্যে বিপদে পড়তে পারে। হরি অসহায় রাগে ছটফট করতে লাগল।

"দাদা যে বলেছিল বিকেল হওয়ার আগেই ফিরে আসবে। আসছে না কেন হরিদাদা।"

হরি অনুকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল।

প্রায় এক ঘন্টা পরে মৃগাঙ্কবাবুরা ফিরলেন। দোতলার বারান্দা থেকে মৃগাঙ্কবাবুদের দেখতে পেয়েই হরি অনুকে বলল — "আমি দাদাবাবুকে খুঁজতে যাচ্চি। তুমি নীচের দরজা খুলে মা বাবাকে সব বলো।"

হরি এক দৌড়ে চলে গেল। অনু দরজা খুলে মা বাবাকে পেয়ে আবার হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। অনুর কাছে সব শুনে সুমিতাদেবীর তো মুর্ছা যাওয়ার মত অবস্থা। মৃগাঙ্কবাবু থপাস করে মাটিতেই বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে সামলে নিয়ে মৃগাঙ্কবাবু থানা থেকে পুলিশ ফোর্স নিয়ে পাহাড়ে যাবেন বলে স্থির করলেন।

মৃগাঙ্কবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে যখন আমবাগানের রাস্তা ধরতে যাবেন তখনই তিনি দেখলেন মাঠের দিক থেকে কেউ একজন আলো নিয়ে এগিয়ে আসছে। মত বদল করে মৃগাঙ্কবাবু ছুটলেন আলোটা লক্ষ্য করে। একটু এগিয়েই

তিনি হরিকে আসতে দেখলেন তিনি। হরি অচেতন সৌম্যকে কোলে করে নিয়ে আসছিল। আর একজন কেউ একটা আগুন জ্বালিয়ে তাদের রাস্তা দেখাচ্ছে বলে মৃগাঙ্কবাবুর মনে হল।

মৃগাঙ্কবাবু ছুটে গেলেন হরির দিকে। আগুনটা ফেলে দিয়ে কে যেন পালিয়ে গেল বলে মনে হল মৃগাঙ্কবাবুর কিন্তু ওসব দিকে মন দেবার মত অবস্থা ছিল না তাঁর। সৌম্যকে হরির কোল থেকে নিয়ে নিতে হরি মাঠে পড়ে থাকা মশালটা তুলে নিল। "কোথায় পেলে? ঠিক আছে তো?"— মৃগাঙ্কবাবু হাহাকার করে উঠলেন।

"দাদাবাবু মাঠে রাস্তা হারিয়ে ঘুরে ঘুরে অজ্ঞান হয়ে গিয়েচে।"

সৌম্যকে ঘরে এনে শুইয়ে দেওয়া হল। সুমিতাদেবী তাড়াতাড়ি জল নিয়ে এসে সৌম্যর মুখ হাত মুছিয়ে দিতে লাগলেন। মৃগাঙ্কবাবু ছুটলেন ডাক্তারের খোঁজে। হরি এক বাটি খাবার জল আর একটা পরিষ্কার কাপড় নিয়ে এসে, কাপড়টাকে পলতে বানিয়ে একটু একটু করে জল খাওয়াতে লাগল সৌম্যকে। প্রায় দু বাটি জল এই ভাবে এক ঘণ্টা ধরে খাওয়াল হরি। ডাক্তার নিয়ে যখন মৃগাঙ্কবাবু ফিরলেন তখন সৌম্যর মুখ চোখ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, কিন্তু গায়ে তার প্রচন্ড জ্বর।

ডাক্তার সৌম্য পরীক্ষা করে বললেন "কী করে এরকম ডিহাইড্রেশন হয়ে গেল ?"

মৃগাঙ্কবাবু শুধু বললেন। "সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরেছে।"

"হুঁ। এখন কয়েক দিন এই বিছানা থেকে নাড়ানোর কোন দরকার নেই। রোদে আর ডিহাইড্রেশনে জ্বর চলে এসেছে। ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি রাতের বা ভোরের দিকে জ্বর কমে যাবে। আমি কাল বেলার দিকে আবার এসে দেখে যাব।"

সুমিতাদেবী চিন্তিত গলায় বললেন "ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ আগে ওর একবার জ্ঞান এসেছিল তখন ও জড়িয়ে জড়িয়ে খালি বলছিল যে ও ভূত দেখেছে।"

"ভূত? ভূত আবার কী? ওরকম উলটোপালটা কিছু বলতে পারে জ্বরের ঘোরে। একটা তো শক পেয়েছেই। সারাদিন এইভাবে। চিন্তার কোনও কারণ নেই। জ্বর নেমে গেলে একদম ঠিক হয়ে যাবে।"

মৃগাঙ্কবাবু ডাক্তারকে ছাড়তে গেল।

সকালের দিকে সৌম্যর জ্বর সত্যি সত্যি কমে এল। সারা রাত ধরে জ্বরের ঘোরে সে শুধু একটা কথাই বলেছে। "এখানে সত্যি ভূত আছে। এখান থেকে পালিয়ে চলো।"

একটু বেলায় ডাক্তারবাবু এসে সৌম্যকে দেখলেন। তখন আর একদমই জ্বর নেই ওর। কিন্তু ও তখন ঘুমাচ্ছিল। ডাক্তারবাবু ওষুধ পালটে অন্য ওষুধ দিয়ে দিলেন। সুমিতাদেবী ঘরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। কাল সারারাত তিনি, হরি আর মৃগাঙ্কবাবু জেগে কাটিয়েছেন।

"এই তো এখন একদম জ্বর নেই। দিব্যি ঘুমাচ্ছে। আজকে বিকেলের দিকে জ্বরটা আবার আসতে পারে, তবে একদম চিন্তা করবেন না। ও দু এক দিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।" ডাক্তার চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে হরি এসে বলল "মা কাল রাত থেকে কিচ্চুটি কাননি। একোন একটু কিচু কেয়ে নেবেন চলুন।"

"অনু কোথায় হরি ?"

"দিদিমণিকে আমি ভাত কাইয়ে দিয়েচি। দিদিমণি ঘুমিয়ে পড়েচে। কাল রাতে ঘুম হয়নি কিনা।"

"তুমি বাবু আর আমার খাবার দাও নীচে। আমি আসছি।"

হরি চলে যেতে সুমিতাদেবী ঠিক করলেন না এর একটা বিহিত করতেই হবে। জানতেই হবে কী ব্যাপার এখানকার।

খেতে বসে মৃগাঙ্কবাবু হরিকে ডাকলেন। "এখানে একটু বস হরি।"

হরি মেঝেতে থেবড়ে হাঁটু দুটোকে বুকের কাছে ভাঁজ করে বসল।

"কাল আমরা এখান থেকে চলে যাব হরি।" কথাটা বলে মৃগাঙ্কবাবু থামলেন, ভাবলেন হরি বোধহয় কিছু বলবে। কিন্তু হরি কিছু বলল না। মাথা নীচু করে নিবিষ্ট মনে মেঝেতে পোকামাকড় দেখতে লাগল।

"যাওয়ার আগে আমি জানতে চাই হরি এখানকার ব্যাপারস্যাপার কী? আজ তোমার এটাই শেষ সুযোগ। তুমি যদি কিছু বলতে চাও তো বলো। তা না হলে আমিও বাইরে গিয়ে এই কথাটাই বলব সবাইকে যে এখানে ভূতপ্রেত আছে। সীমান্ত-শিবের মাঠে যাওয়া উচিত নয়।"

হরি বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। মৃগাঙ্কবাবুর মনে হল হরি হয়ত বলবে না। মৃগাঙ্কবাবু আর সুমিতাদেবী খাওয়া শেষ করে দোতলায় যাওয়ার সময় হরি ডাকল।

"বাবু আমি যদি সব কথা আপনেকে বলি তাহলেও কি আপনে চলে যাবেন?"

মৃগাঙ্কবাবু সুমিতাদেবীকে উপরে উঠে যাওয়ার জন্য ইশারা করলেন। সুমিতাদেবী চলে গেলেন। মৃগাঙ্কবাবু নীচে এসে হরির কাঁধে হাত দিল।

"হরি এই জায়গাটা আমার অন্ততঃ খুবই ভাল লেগেছিল। তাই তোমাকেও ছাড়তে আমাদের একটুও ইচ্ছা করছে না। কিন্তু এটা আমার ছেলেমেয়ের সুরক্ষার ব্যাপার। আজ সৌম্য যা করেছে বা যা ঘটেছে তা আমি আর ঘটতে দিতে পারি না। তাই এখানে যদি থাকতেই হয় তাহলে আমায় জানতেই হবে কী এমন ব্যাপার যে সামনের মাঠে কোনও বসতি কেন গড়ে ওঠেনি ?"

"বসতি ছিল এখানে।" হরির গলার স্বরে চমকে উঠলেন মৃগাঙ্ক বাবু। চেয়ে দেখলেন হরির মুখ বিকৃত হয়ে গেছে যন্ত্রণায়।

"তোমার খারাপ লাগলে কিছু বলতে হবে না হরি।"

"না বাবু আজ আমি সব বলব। আমাকে বলতে হবেই। আর কতদিন আমরা মুখ বুজে থাকব? আমরা কি মানুষ নই বাবু ?" হরি কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছতে লাগল।

"তোমরা ? এর মানে তুমি ছাড়াও আরো অনেকে আছে ?"

"হ্যাঁ বাবু। এই বসতি তে আমি ছাড়াও আছে আরো ছয় জন। আর আগের বসতিতে বাবু পঞ্চাশের বেশি লোক ছিল।"

"তো কী হল সেই বসতির ?"

"তাহলে বাবু প্রেথম থেকে বলতে হয়।"

"হ্যাঁ বল তুমি।" মৃগাঙ্কবাবু সোফায় বসলেন। হরিও বসল মেঝের উপর।

"আজ থেকে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে আমাদের ছোটবেলায় এই সব সীমান্ত শিবের মাঠ বা মন্দির কিছুই ছিল না। এইখানে ছিল জমিদারদের একটা বাড়ি আর ওইদিকের মাঠটা ছিল ওদের ধানি জমি। আমার বাবা মা দুজনেই কাজ করত এই মাঠে। আমরা কিছুই জানতাম না যতদিন না আমার মায়ের অসুখ হয়। আমার মায়ের যখন অসুখটা হয়েছিল তখন সবাই মিলে মাকে বের করে দিল গ্রাম থেকে। ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে গ্রামের লোকেরা মাকে হয়ত মেরেই ফেলতে যদি না আমার বাবা থাকত। বাবা রুখে দাঁড়িয়েছিল। বাবা ছিল ভাগচাষীদের মোড়ল। কিন্তু আশেপাশের কোন গ্রামই মাকে ঠাঁই দিতে পারল না। তখন বাবা কি করবে কিছুই বুঝতে পারছিল না। বাবা ঠিক করেছিল মাকে আর আমাকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবে। কিন্তু আমাদের ভয় ছিল অন্য জায়গার লোক যদি আবার আমাদের তাড়া করে তখন কি হবে। এখানে না হয় বাবা মোড়ল বলে লোকে তাও মাকে মেরে ফেলেনি। তখন ওরকমই আরেকটা লোক রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে এসেছিল আমাদের বাড়িতে আর মাকে এই বসতির সন্ধান দিয়েছিল। এই মাঠটার প্রায় শেষে ঐ পাহাড়ের গায়ে ওখানে একটা ঝরনা আর পুকুর মতন আছে। খুব কম লোকই জানে সেই কথা। সেই ঝরনার থেকে একটু দুরেই ছিল ওদের বসতি। আমার মা ওখানেই গিয়েই থাকতে শুরু করে। আমি তখন খুবই ছোট ছিলাম। তাও বুঝতাম যে লোকে আমাদের এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে। কেউ বাবাকে কাজ দিতে চাইত না। একদিন বাবা আমায় নিয়ে চলে গেল মায়ের কাছে। তারপর নিজের চেষ্টায় ওখানে একটা ছোট মাঠ মত বানিয়ে চাষ করত। কিন্তু অসুস্থ লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছিল। আমাদের ফসলে সবার আধ পেটা খাবারও জুটত না। তাই মাঝেই মাঝেই ওরা হানা দিত জমিদারের মাঠে বা বাগানে রাতের অন্ধকারে। আশেপাশে পাঁচটা গ্রাম থাকায় তাতেও আমাদের দিন চলে যাচ্ছিল। এখানে কেউ তো সোনাদানা টাকাকড়ি চুরি করত না। সে সব নিয়ে ওরা করবেই বা কী? ওরা শুধুই খাবার দাবার চুরি করত, কখনও কখনও জামা কাপড়। যারা কাল বাঁচবে কি না জানে না তারা টাকাকড়ি নিয়ে করবেই বা কী। কিন্তু গ্রামের লোকেরা কিছু একটা সন্দেহ করল। যদিও আমাদের বসতিটা ছিল জঙ্গলের আড়ালে বাইরে থেকে কেউ বুঝতেই পারবে না যে ওখানে কিছু আছে। কিন্তু আমি ছিলাম ছোট। অতগুলো রোগী মানুষের মধ্যে আমার থাকতে ভাল লাগবে কেন? আমি মাঝে মাঝেই বেরিয়ে আসতাম জঙ্গল থেকে। মাঠের ধারে এসে গ্রামের ছেলেদের সাথে খেলতাম। আবার ফিরে যেতাম জঙ্গলে। আমার পিছু নিয়েই হয়ত গ্রামের লোকেরা আমাদের বসতির খোঁজ পেয়ে গেল। একদিন রাতে ওরা এল। পুরো বসতিতে আগুন লাগিয়ে দিল। অসুস্থ মানুষগুলো কিচ্ছু করতে পারল না। আমাদের ঘরটা অন্য জায়গায় ছিল বলে। বাবা আর আমি বেঁচে গেলাম। বাবা চিনতে পেরেছিল লোকগুলোকে। ওরা আচার্যদের লেঠেল ছিল। আর ছিল এই গ্রামগুলোর মাতব্বর মাথারা সব। সবাইকে মেরে ফেলল ওরা। আমার মাও মারা গেল। সকালে পোড়া ছাই ছাড়া আর কিছু ছিল না অত বড় বসতিটার।। বাবা আমাকে নিয়ে রাত্রি বেলায় গেল জমিদার বাড়ি। তখন ওই বাড়িতে সব মাতব্বরদের মজলিশ বসেছে। অসুস্থ লোকগুলোকে পুড়িয়ে মেরে ওরা কত পুন্যির কাজ করেছে সেই গল্পই চলছিল তখন। লোকগুলো রাত বিরেতে দুটো খাবার চুরি করতে যেত বলে ওরা মনে করেছিল ওদের গ্রাম অসুস্থ হয়ে পড়বে। বাবা গুলি করে মেরে ছিল সবাইকে। বাবার কাছে বন্দুক এসেছিল কিভাবে আমার মনে নেই। গুলি করে মারার পর। বাবা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল ওই বাড়ি। মাঠভরা ধান ছিল তখন তাতেও আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল বাবা। কিন্তু বাবাও পুড়ে গেছিল সেই আগুনে। আমি পালিয়ে চলে গিয়েছিলাম অন্য জায়গায়। তারপরে কাজ করতাম এখানে ওখানে। বিয়ে করলাম। কিন্তু আমারও কী পোড়া কপাল বাবু। আমার বউয়েরও একই অসুখ হল। কোথাও থাকতে পারছিলাম না। যেখানেই যাই লোকে তাড়া

করে। একদিন স্বপ্ন দেখি বাবা ডাকছে। বলছে কোনও ভয় নেই। তারপর চলে এলাম এখানে। সেই আগের জায়গাতেই আবার থেকে গেছি। বাবার দয়ায় সত্যি কোন ভয় নেই। বাবা এই মাঠ পাহারা দিচ্ছে। এখানে বাইরের কেউ আসতে পারে না তাই। জানি না কোথা থেকে খবর পেয়ে একে একে আরো জনাছয়েক এসে জুটল। বাগান থেকে যা ফল পাকুড় পাওয়া যাচ্ছিল তাতে বাবু আমাদের চলে যাচ্ছিল, কিন্তু এতজনের চলে কী করে বলুন। তখনই আপনারা এলেন। আমরাও দুটো ভাত পেয়ে বেঁচে গেলাম বাবু। কিন্তু আমাদের কপালে আর শান্তি বা সুখ কোনটাই লেখা নেই। এই দুই দিন আগে কয়েকটা হতচ্ছাড়া এসে আমাদের ঘরগুলো সব পুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বাবার দয়ায় আমরা বেঁচে গেছি। ব্যাটারা নিজেদের আগুন নিজেদের গায়ে লাগিয়ে মরেছে। আর বাবু আজ আপনিও চলে যাচ্ছেন। আমাদের না খেয়ে মরতে হবে এবার।"

মৃগাঙ্কবাবু আশ্চর্য হয়ে শুনছিলেন হরির গল্প। মানুষ এত নিষ্ঠুরও হয় যে এতগুলো লোককে পুড়িয়ে মেরে দেবে তাও আজ থেকে বেশিদিন আগের কথা নয়। এই ছবির মত সুন্দর গ্রামের ভেতরে এত নোংরা? আর হরি বলছে কি দুইদিন আগে আবার কারা তাদের মারার জন্য গেছিল। ভেবেছেটা কী গ্রামের লোক আইন আদালত সব উঠে গেছে। নাহ এর একটা বিহিত করতেই হবে। রাগটা একটু সামলে নিয়ে মৃগাঙ্কবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"তোমাদের কী অসুখ হরি ?"

"অসুখ আমার কোনদিনও হয়নি বাবু। অসুখ ছেল আমার মায়ের। অসুখ আমার বউয়ের।"

"কী অসুখ?" যদিও মৃগাঙ্কবাবু খানিকটা আন্দাজ করতে পারছিলেন যে কী অসুখ হতে পারে।

"ওই যে অসুখে মানুষ আর মানুষের মত দেখতি থাকেনি। হাত পা নাক মুখ খসি খসি পড়ে যায়। ভূতির মত দেখতি হয়ে যায়। ঐ জন্যই তো দাদাবাবু ভয় পেয়েচে। খালি বলতেচে ভূতি দেকিচি, ভূতি দেকিচি।"

"কুষ্ঠ !"

"হ্যাঁ বাবু।"

মৃগাঙ্কবাবু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তা অন্যান্যদের আর দোষ কী তিনি নিজেই কি আর সব কিছুর উর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন। কুষ্ঠ শোনার পর থেকেই তার মন কেমন কুঁকড়ে যাচ্ছে। সামনে বসে থাকা মানুষটাকে দেখলেই ঘৃণা হচ্ছে যদিও তার দেহে বিকৃতির কোন চিহ্নমাত্র নেই। সে বলছে তার কোন অসুস্থতা নেই। তবুও... মৃগাঙ্কবাবুকে চুপ করে থাকতে দেখে হরি বুঝল বাবুর অস্বস্তি হচ্ছে। সে বলল "বাবু এখানে কাজে ঢোকার পর থেকে আমার বউ আর আমায় ওদের ওখানে থাকতে দেয় না। আমি শুধু দুবেলা ওদের খাবারটা দিয়ে আসতাম। আর অসুখ করার পর থেকে বউ আমায় কোখনো ওকে ছুঁতি দেয়নি পেজ্জন্ত।"

"না হরি কুষ্ঠ ছোঁয়াচে রোগ নয়।"

হরি ঘাড় নাড়ল "হ্যাঁ বাবু আমারও তাই মনে হয়। তাহলে এত দিনে আমার কি হত না।"

"হরি তোমাদের এখানে এখন কতজন আছে?"

"তা বাবু বাড়তি বাড়তি আবার একন পনরো জনা রোগী আর আমায় নিয়ে তিন জনা সুস্থ লোক আচে।"

"এত জনের খাবার দাবার জোটাও কী করে ?"

"এই মাঠের জমিন বাবু খুব ভাল। বীজ ছড়ালেই চাষ হয়। আমরা একটু কষ্ট করে চাষ করি। একটা বাগানও করেচি। সবই বাবার দয়া। আগে হলে কি হত বাবু। গাঁয়ের লোক সব পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে দিত। এখন বাবা আছেন।"

"আচ্ছা হরি তুমি এতদিন ওদের সাথে কাটিয়েছ তাও তোমার কিচ্ছু হয়নি?"

"না বাবু। আমি ঠিক সাথি থাকি না ওদের। সেই যে বুড়ো বাবা আমার মাকে নিয়ে গেচিল। তারপর যকন আমার বাবা আমায় নিয়ে গেল, তকন সে আমাদের ওকেনে থাকতি দেয়নি। ওই বুড়ো বাবা নাকি দাক্তার ছেল। ওই বলেছেল যে ওদের যে সর্দি কাশি হয় বা মুকির থুতু এইগুলির কাচে গেলে তবেই তোমার হতি পারি। আমরা তাই অন্য জায়গায় চান করতেম। অন্য কাবার খেতেম। কিন্তু বাবু ওরা তো মানুষ। আবার অসুস্থ মানুষ। ওদের যদি সবাই ঢিল ছুঁড়ে মারে, ভিক্কে না দেয়, কেতে না দেয় তবে হবে কী করে। এমনিতেই তো বাঁচবে না। যে কদিন বাঁচে..."

"না হরি, এই রোগের ওষুধ আছে। কে বলেছে বাঁচে না। আমি জানি ঠিকঠাক চিকিৎসা হলে এরা আবার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।"

হরি অবিশ্বাসের চোখে তাকাল মৃগাঙ্কবাবুর দিকে। মৃগাঙ্কবাবু ঘাড় দোলালেন। হরির চোখে আশার আলো ফুটে উঠল।

"আজ বাবার দয়াতেই সব কিচু। আমার বউ যদি ভালো হয়ে যায় বাবু। তবে আমি সারাজেবন আপনের পায়ে পড়ে থাকব। আজ এইজন্যি বাবা আপনাকে একানে এনেচে। বাবা আপনাকে ঠিক বুজতি পেরেচে বাবু।"

"বাবা মানে?"

"আমার বাবাই তো সীমান্ত শিব গো বাবু। তেনিই তো এতদিন ধরি আমাদেরকে রক্কা করচে। তা না হলে গাঁয়ের লোকিরা আমাদেরকে শেষ করি দিত না এতদিনে। তিনি ঢুকতি দেননি গাঁয়ের লোকিরে। তাই তো আপনেরা প্রেথম যেদিন এলেন। আমি ভাবি বাবা এ কী করল। একন বুজতে পারচি বাবার কোন ভুল করেনিকো ঠিক লোককে নে এসেচে।"

"তোমার বাবা সীমান্ত শিব? মানে, সীমান্ত শিবকে তুমি বাবা বলে মানো?"

"মানবো কেন? উ তো আমার বাবাই। আমার বাবার নামই ছেল সীমান্ত শিব। আমার নাম হরিমটর শিব। শিব আমাদের উপাধি গো।"

মৃগাঙ্কবাবু হতভম্ব ভাবটা কষ্ট করে ঝেড়ে ফেললেন। তাঁর এখন অনেক কাজ করার আছে।

কিছুদিন বাদে গ্রামের লোকেরা অবাক হয়ে দেখল যে সীমান্ত শিবের মাঠে হই হই করে কী বিশাল এক কর্মযজ্ঞ চলছে। আস্তে আস্তে তাদের চোখের সামনে তৈরি হল এক হাসপাতাল। কুষ্ঠরোগীদের জন্য। সেই হাসপাতাল থেকে যেদিন সুস্থ হয়ে হরিমটর তার বউকে নিয়ে বেরিয়ে এল সেই দিন মৃগাঙ্কবাবুর মনে হচ্ছিল আজ বুঝি সীমান্ত শিবের আশীর্বাদে সমস্ত পাপ ধুয়ে যাবে এই গ্রামের লোকেদের।

অলংকরণঃ জিতাদিত্য ও দেবজ্যোতি

গোয়েন্দা গল্প

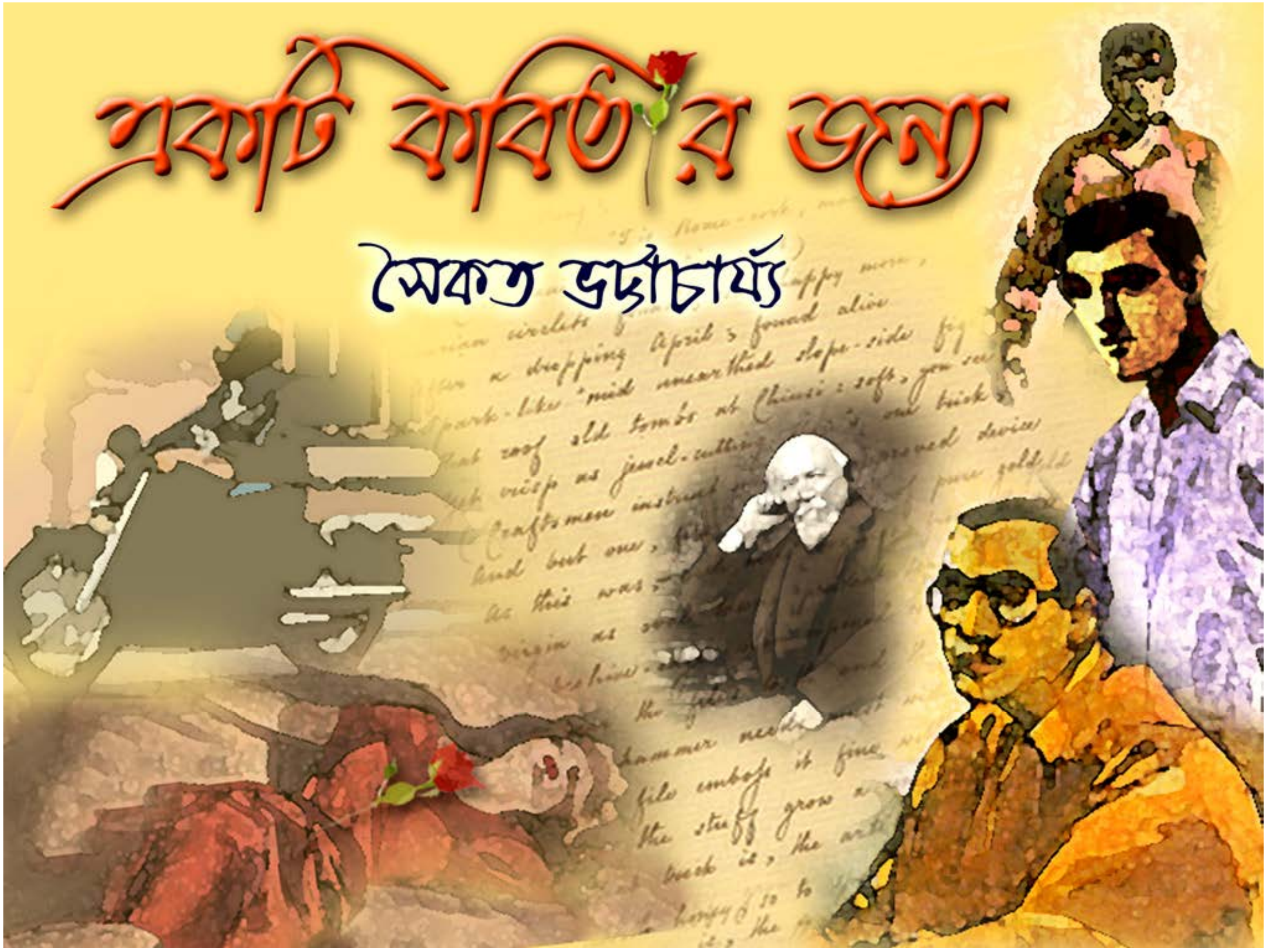

ঘড়ির কাঁটা ১১টার ঘর পেরোনোর পর থেকেই সুজান উঠি উঠি করছে। খ্রিসমাসের দিন বলে বাড়িতে রাত হচ্ছে বলে কিছু বলবে না, কিন্তু তাও বেশি দেরি করাটা ঠিক নয়। পার্টি হয়তো এদের সারা রাত চলবে। কিছু বিশ্বাস নেই। তাই আর ইতস্তত না করে জোহানকে ডেকে বলেই ফেলল, “এই জোহান, রাত অনেক হল। বাড়ি যাই রে।”

সুজান বা জোহান জন্মসূত্রে ব্রিটিশ হলেও এত বছর এদেশে থাকার পর পাক্কা বাঙালি বনে গেছে। এমনকী বেশিরভাগ সময় নিজেদের মধ্যেও বাংলাতেই কথা বলে। হিমালয়ের পায়ের কাছে, ডুয়ার্সের একটা ধার ঘেঁসে এই ম্যাকমোহনপুরের বৈশিষ্ট্যই এটা। এখানের আদি বাসিন্দাদের সাথে সেই ব্রিটিশ আমল থেকে কয়েকঘর ব্রিটিশ বাস করেন। তাদের রাজত্ব এ দেশ থেকে চলে গেলেও, তারা বন্ধু হয়েই থেকে গেছেন কয়েক পুরুষ ধরে। এমনকী এই ম্যাকমোহনপুরের নামও সুজানদের এক

পূর্বপুরুষের নামে। ভাতে মাছে বাঙালি হলেও নিজেদের উৎসবের কোনও ফাঁক পড়ে না। যেমন এই খ্রিসমাস। জোহান ম্যাকলরেনদের বাড়িতে সবার নিমন্ত্রণ ছিল রাতের পার্টিতে। আর পাঁচজন বাঙালি মেয়ের মত সুজানকেও বাবা বেশি রাত অবধি বাইরে থাকতে দেন না। কিন্তু খ্রিসমাসের জন্য একটা দিন ছাড় পাওয়াই যায়। জোহান সুজানের কলেজের বন্ধু। কলেজের সব বন্ধুরা মিলেই হই-হুল্লোড় চলছিল। কিন্তু সুজানের মনটা এই পার্টির মধ্যে ছিল না। তাই অনেকক্ষণ ধরে উশখুশ করলেও বলতে পারছিল না। এগারোটা বাজতে বলেই ফেলল বাড়ি যাওয়ার কথা।

"এখুনি চলে যাবি? বোস না। সবাই তো আছে। অনামিকারাও তো রয়েছে। একসাথে ফিরিস।" জোহান বলে।

-"না রে। যাই। কিছু কাজও আছে। পড়াশোনা।"

-"উফ্। আজকের দিনেও মাগিং। প্লিজ..."

-"হে হে। না কলেজের পড়া নয়। এমনি এটা ওটা। সত্যি বলছি রে..."

-"বাট যাবি কী করে? একা একা এত রাতে এতটা রাস্তা..."

-"কিচ্ছু হবে না। ঠিক চলে যাব।"

-"না না। পাঁচ মিনিট বোস। আমি এগিয়ে দিয়ে আসব।"

-"কোনও দরকার নেই জোহান। আমি কচি খুকি নই। স্যাম আঙ্কেলের বাড়ির সামনের শর্টকার্টটা নিয়ে নেব।" মাথার লম্বা সোনালি চুলটা গোছা করে, গায়ে জ্যাকেটটা চড়িয়ে বলে সুজান।

-"একটু দাঁড়া না।"

_"না, বলেছি, না। আমি ঠিক চলে যাব।" সুজানকে কলেজে আড়ালে 'আয়রন লেডি' বলে ডাকে বন্ধুরা। একবার যেটা ভাববে, সেটা থেকে নড়চড় খুব কম হয়।

সুজানের 'না' শুনে জোহান আর কিছু বলল না। প্রত্যুষ আর সাম্যও শুনছিল। সুজান সবাইকে বাই করে বেরোতেই সাম্য বলল, "চল। আয়রন লেডিকে ভয় দেখাই।" কলেজে সাম্যর দুষ্টু বুদ্ধির কথা সবাই জানে। ওর মাথায় সব দুষ্টু বুদ্ধির বাসা। সেগুলো ক্ষতিকর হয় না, শুধুই মজা। তাই সবাই ঘিরে ধরে বলল, "কী করবি রে?"

-"কিছু না। শুধু ওর পিছু নেব। একটু দূর থেকে। যাতে ও বুঝতে পারে কেউ পিছু নিয়েছে, কিন্তু চিনতে না পারে। তারপর আয়রনের কি দশা হয় দেখা যাক।"

-"এহ। শুধু শুধু ভয় দেখাবি?" জোহান মৃদু আপত্তি জানায়।

-"আরে, ভয় পাক বা না পাক, ওর এসকর্ট তো হবে। সেটা তো ভেবে দ্যাখ একবার।"

-"সেটা ঠিক।" ভাল দিকটা ভেবে জোহান মেনে নেয়।

সাম্য আর প্রত্যুষ একটা হুডওয়ালা জ্যাকেট পরে বেরিয়ে পড়ে। কিছুটা পা চালিয়ে আসার পর সুজানকে দেখতে পায়। অন্ধকার রাস্তায় চিনতে পারার কোন সম্ভাবনা নেই জেনেও মোটামুটি ষাট মিটার তফাতে হাঁটতে থাকে দুজনে। কিছুটা চলার পর সুজান পিছনে ফিরে তাকায় একবার। তারপর জোরে পা চালায়। সাম্যরাও জোরে পা চালায়। বুঝতে পারে যে, ভয় পেয়েছে। সুজান ওদের কাটানোর জন্য অনেক অলিগলি দিয়ে অকারণে ঘুরতে থাকে। সুজান ভয় পাচ্ছে এটা দেখে, সাম্য আরো মজা পায়। প্রত্যুষ অবশ্য একবার বলেছিল যে, "মেয়েটাকে শুধু শুধু আর ভয় পাইয়ে লাভ নেই। চল গিয়ে বলে দি।"

-"বাজে বকিস না তো। তোকে আনাই ভুল হয়েছে।" এক ধমকে চুপ করিয়ে দেয় সাম্য।

হঠাৎ একটা বাইকের আওয়াজ পাওয়া যায়। এইসময় পুলিশে টহল দিতে বেরোয়, এটা খেয়াল ছিল না। দুজনে মিলে একটা বাড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। নাহলে সুজান যদি কিছু বলে, তাহলে এই মজার নামে প্রচুর ঝামেলা পোহাতে হবে। নাহ, বাইকটা থামে নি। তারমানে সুজান কিছু বলেনি।

-"কিন্তু, এত রাতে একটা মেয়ে একা রাস্তায় দেখে, কিছু বলল না?" সাম্য বলল।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তা ফাঁকা দেখে দুজনে আরো অবাক হয়ে যায়। এত তাড়াতাড়ি মেয়েটা গেল কোথায়? রাস্তাও তো সোজা।

-"চল, সাম্য। অনেক মজা হয়েছে। এবার ফিরি। আমার আর ভাল লাগছে না।" প্রত্যুষ ভয় পাওয়া গলায় বলে।

-"হ্যাঁ রে, চল ফিরি।" সাম্যও একটু ভয় পেয়েছে বোঝা যায়। দুজনেই ফিরতে থাকে।

জোহানের বাড়িতে ফেরা মাত্রই সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাম্যদের ফ্যাকাশে মুখ দেখে সবাই বুঝে গেছে যে মিশন সাকশেসফুল নয়।

"মার খাসনি তো রে ?" প্রতীক বলে।

আরও সবাই দু-একটা ইয়ার্কি মারার মাঝখানে জোহানের ফোনটা বেজে ওঠে।

"দাঁড়া। সুজানের বাবা, ক্রিস্টোফার আঙ্কেল ফোন করছেন।" বলে ফোন নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে যায়। একমিনিট পরেই ফিরে এসে বলে, "মেয়েটা তো এখনও বাড়ি ফেরেনি। মোবাইলও বন্ধ। কোথা অবধি দেখে এসেছিস তোরা?"

-"সে কী!" সাম্য লাফিয়ে ওঠে।

সাম্য দু-এক কথায় বুঝিয়ে তিনচারজন মিলে টর্চ নিয়ে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তার ওই মোড়টায় এসে সাম্য দেখিয়ে দেয় লাস্ট কোথায় ওরা সুজানকে দেখেছিল। ঠিক তার পাশে একটা অর্ধেক তৈরি হওয়া বাড়ি দেখিয়ে জোহান বলল, "তোদের ভয়ে ওর মধ্যে ঢুকে বসে নেই তো?"

সবাই মিলে বাড়ির সামনে গিয়ে দু-একবার 'সুজান' 'সুজান' বলে ডাকে। কোন সাড়া মেলে না। নীচের তলায় শুধু পিলার থাকায় কোথাও লুকোনোর জায়গা নেই। তাও সব জায়গাটা টর্চ ফেলে দেখে নেয় জোহান।

"জোহান, দোতলায়।" বলে সাম্য সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায়।

দোতলায় ঘরের দেওয়াল গাঁথা হয়ে গেছে। আবার ওর কয়েকবার নাম ধরে ডাকে। কোনও সাড়া নেই। প্রথম ঘরটা ফাঁকা। জোহান এগিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় ঘরে পা দিয়েই চিৎকার করে ওঠে। সবাই দৌড়ে গিয়ে দেখে মেঝের ওপর সুজান পড়ে আছে। চোখের মণি দুটো স্থির। আর বুকের ঠিক ওপর একটা গোলাপ ফুল।

প্রতিদিন সকালে যাবতীয় কাজকর্ম শুরু করার আগে খবরের কাগজটা মন দিয়ে না পড়লে সব্যসাচীর মনটা খুঁতখুঁত করতে থাকে। তাই যেদিন কাগজ আসতে দেরি হয়, কোনও কাজেই মন বসে না। আজও সেই। প্রায় আটটা বাজতে চলল, এখনও খবরের কাগজের পাত্তা নেই। ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে মোবাইল ফোনে টাইমস অফ ইন্ডিয়া পড়েই কাজ চালাচ্ছিলেন আর

বার বার বাইরের দিকে তাকাচ্ছিলেন, কাগজের ছোকরাটা এল কিনা। এলে কী বলে বকবেন, সেটাও মনে মনে রিহার্স করে রাখছিলেন কফির কাপে চুমুক মারতে মারতে।

হঠাৎ ফোনটা বেজে ওঠাতে ই-কাগজ পড়া আর রিহার্সাল দুটোতেই ব্যাঘাত ঘটল। মোবাইলটা কানে লাগিয়ে "হ্যালো" বলতেই ওপাশ থেকে একটা পরিচিত গলা শুনতে পেলেন।

-"সব্যসাচী, আমি শুভ বলছি রে। শুভ ব্যানার্জী।"

-"কী ব্যাপার, ডি জি সাহেব? এত সকাল সকাল?"

-"তোর একটু সাহায্য চাই।"

-"আমার সাহায্য? কী ব্যাপার?" এক হাতে কফিকাপ নিয়ে কানে মোবাইল ধরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন সব্যসাচী মজুমদার।

-"একটা বছর কুড়ির মেয়ে, অ্যাংলো। কাল রাতে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। উপর মহল থেকে চাপ এসেছে উইদিন আ উইক কেসটা সল্ভ করার। পুলিশের যা লোক, এক সপ্তাহ কেন, এক বছরেও কিছু হবে না। তুই যদি একটু..."

-"সক্কাল সক্কাল এইসব! এখনও কাগজ পড়া হয়নি।" বলতে বলতে কাগজের ছেলেটি কাগজটি রেলিঙের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়ে হাওয়া। কানে ফোন থাকায় কিছু বলতেই পারলেন না সব্যসাচী। "তা আমি কী করব বল ?"

-"আমি লোকাল থানায় সব জানিয়ে দিচ্ছি। ঘটনাটা ঘটেছে তোদের ম্যাকমোহনপুরেই।"

-"সে কী! মেয়েটা কে?"

-"সুজান ম্যাকমোহন।"

-"সুজান!! কী বলছিস এই সক্কাল বেলায়! আমি তো খুব ভাল করে চিনি। থানায় একটা রেফেরান্স দিয়ে দে। আমি যাচ্ছি আধঘন্টার মধ্যে।"

-"কী যে বলে..."

-"পরে বলবি, আপাতত থানায় বলে রাখ।" বলে ফোনটা কেটে দেন সব্যসাচী।

ডিজি শুভ ব্যানার্জী সব্যসাচী মজুমদারের কলেজের বন্ধু। দুজনেই প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে একসাথে পাস করেন। তারপর সব্যসাচী আই এফ এস আর শুভ আই পি এস। পঞ্চাশ বছর বয়েসে এসে সব্যসাচীর মনেহয় এসব চাকরি করে কী হবে! তাই সব ছেড়ে দিয়ে অকৃতদার সব্যসাচী এই ম্যাকমোহনপুরে এসে একটা বাড়ি করে রয়ে গেছেন। জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে পাখি দেখেই অধিকাংশ সময় কাটে। আর বাকি সময় মানুষের মনের খোঁজে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটা কেসে পুলিশকে সাহায্য করে বেশ বিখ্যাত। আর সেই কারণেই সকাল বেলা কলেজের বন্ধুর কাছ থেকে ফোন।

থানায় পৌঁছাতেই ওসি জয়ন্ত বসাক খুব আদর আপ্যায়ন করে নিজের ঘরে নিয়ে বসালেন। প্রথমত সব্যসাচী এই অঞ্চলের একজন নামকরা লোক, দ্বিতীয়ত ডিজি সাহেবের রেফেরেন্স।

-"বলুন স্যার, চা না কফি ?"

-"কিছু না। ঠিক কী হয়েছে বলুন কেসটা। গুছিয়ে। এইটুকু একটা মেয়ে..."

-"হ্যাঁ, স্যার। কী আর বলব। এতদিন ধরে পুলিশে আছি, কত খুন জখম দেখলাম, কিন্তু এরকম ফুলের মত সুন্দর একটা মেয়েকে... আবার খুন করে একটা গোলাপফুল রেখে গেছে।"

-"খুন, আপনি শিওর তো?"

-"মানে?"

-"মানে সুইসাইড নয় তো ?" সব্যসাচী একটা চুরুট ধরান।

-"একটা মেয়ে বন্ধুর বাড়ির পার্টি থেকে ফিরছে। সে কেন... তারওপর গলায় যেভাবে দাগ, তাতে..."

-"গলায় দড়ি?"

-"দেখে তো মনে হচ্ছে দড়ি জাতীয় কিছু, কিন্তু সেটা কোথাও পাওয়া যায়নি। আমাদের ডাক্তার বললেন দড়ি নয়, কারণ দড়ি হলে একটা মোটা দাগ পড়ত। কিন্তু এখানে অনেক গুলো সুক্ষ দাগ, মানে ঠিক অনেক গুলো সরু সরু সুতো একসাথে করে নিলে যেরকম হয়, সেরকম।"

-"ইন্টারেস্টিং..."

-"সুইসাইড হলে তো সেই জিনিসটাও ওখানেই পাওয়া যেত, তাই না ?"

-"ঠিক।"

-"সেইজন্যই..."

-"ঘটনাটা গোড়া থেকে বলুন শুনি।"

জয়ন্ত বসাক ঘটনাটা জোহানদের কাছ থেকে যেরকম শুনেছিলেন সেটাই বললেন সব্যসাচীকে। সব্যসাচী চোখ বুজে চুরুট মুখে সবটা মন দিয়ে শুনে বললেন, "এদের সবার জেরা হয়েছে?"

-"হ্যাঁ। রুটিন জেরা তো হয়েইছে। এবার আপনি চাইলে আর একবার..."

-"চাই তো বটেই, তবে এখুনি না। আপনি আমাকে কাল যারা যারা ওখানে ছিল, তাদের নাম ফোন নাম্বার আর ঠিকানাটা একটা কাগজে লিখে দিন।"

-"নিশ্চয়ই স্যার।" বলে ইন্সপেক্টর বসাক একটা কাগজে সবার নামধাম লিখে দিলেন ওনার নিজের খাতা দেখে। সব্যসাচী কাগজটা নিয়ে মন দিয়ে খানিক্ষণ দেখে বললেন, "এরা সবাই কাল পার্টিতে ছিল?"

-"আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যার। এরা সবাই মেয়েটির কলেজের বন্ধু।"

-"বেশ। এবার আপনি বলুন, এই কেস সম্পর্কে আপনার কী অ্যানালিসিস ?"

-"আজ্ঞে, মানে এখনও পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আসেনি। তার আগে..."

-"মুশকিলটা কী জানেন? এই আধুনিক ডাক্তার আর পুলিশরা রিপোর্ট আসার আগে অবধি কিছুই করতে পারে না। ভগবান আপনাদের সহজাত ইনটুইশন কী করতে দিয়েছেন, কে জানে?"

-"না, মানে সেরকম ভাবে তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তবে, কোন চোর-ডাকাত হলে তো একটা ধস্তাধস্তির চিহ্ন থাকত, তাও নেই। সেকারণে খুব কনফিউজড হয়ে গেছি, স্যার।"

-"ঠিক আছে। দেখছি। তবে আমার দুটো জিনিস চাই। প্রথমত একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট। এই বয়েসে দৌড়দৌড়ি পোষায় না।"

-"ওকে, স্যার, আমার সাব-ইনস্পেক্টর রূপককে বলে দিচ্ছি। ও আপনাকে যাবতীয় হেল্প করবে। খুব ইন্টেলিজেন্ট ছেলে।"

-"বেশ, দ্বিতীয়ত, আমি সুজানদের বাড়ি যেতে চাই।"

-"নিশ্চয়ই। আপনি নিজের মত জেরা করুন।"

-"জেরার জন্য নয়, জয়ন্ত। সমবেদনা জানাতে। ওইটুকু একটা মেয়ে..."

-"তা ঠিক। আসলে পুলিশে থেকে থেকে এই মানবিকতাগুলো উবে যাচ্ছে স্যর। কী করি বলুন তো ?"

-"বই পড়।" সব্যসাচী চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। বলেন, "একবার ঘটনাস্থলটা দেখা যায়?"

-"নিশ্চয়ই। চলুন।"

পুলিশের গাড়ি করে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সব্যসাচী দেখলেন উৎসাহী লোকজনের ভিড়, দুজন পুলিশ ঢোকার মুখে পাহারা দিচ্ছে। সব্যসাচীরা ভিতরে গিয়ে দোতলায় উঠে যান।

-"এইখানে পাওয়া গেছিল, স্যার।" জয়ন্ত বসাক জায়গাটা দেখান। একটা সাদা চক দিয়ে মার্ক করা রয়েছে। সব্যসাচী চারদিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নেন। এক কোনায় কিছু ইঁট আর বালি জমা করা রয়েছে, আর কয়েকটা বাঁশ। বাইরের দিকের দেওয়ালে ভারা বাঁধা আছে। নিয়মিত কাজ চলছে বোঝাই যাচ্ছে। তবে অন্যান্য ঘরগুলোর তুলনায় এই জায়গাটা পরিষ্কার। এখনও ঘর বলা যায় না। কারণ চারটে ইঁট গাঁথা দেওয়াল ছাড়া আর কিছুই নেই।

"আপনারা থরোলি সার্চ করেছেন?" সব্যসাচী বলেন।

-"হ্যাঁ। করা হয়েছে। কিন্তু সেরকম কিছুই পাওয়া যায়নি।"

-"কিছু কী পাওয়া গেছে ?"

-"ওই গোলাপফুল।"

-"আমি একবার দেখি।" বলে সব্যসাচী হাঁটু গেড়ে বসে পড়েন। তারপর বেশ অনেকক্ষণ মাটিতে প্রায় নাক ঠেকিয়ে এদিক ওদিক দেখেন। পকেট থেকে একটা ম্যাগনিফায়িং গ্লাস বের করেও মাটিতে কী সব দেখে একটা ছোট্ট কাগজের টুকরো তুলে নিয়ে পকেটে রাখেন।

জয়ন্ত বসাক বললেন, "কিছু পেলেন?"

সব্যসাচী অন্য কিছু ভাবছিলেন। আনমনা হয়েই বললেন, "আপনি কোনও রাজমিস্ত্রিকে কাজের ফাঁকে বই পড়তে দেখেছেন ?"

সুজানদের বাড়িটা পুরোন ইউরোপিয়ান ধাঁচে তৈরি। সামনে বেশ খানিকটা লন। দেখাশোনা হলেও খুব যে যত্ন হয় না, সেটা দেখলেই বোঝা যায়। সামনের বাগানের দরজা ঠেলে ঢুকতেই সব্যসাচীর মনটা খুব ভারী হয়ে গেল। হয়ত কালকেই এই বাগানের পথে হেঁটে গেছে মেয়েটা। আজ আর সে নেই। সত্যি কী অদ্ভুত মানুষের এই জীবন। এরকম চূড়ান্ত আনসার্টেইন হওয়া সত্ত্বেও সবাই কেমন আজ থেকে পাঁচ বছর পর কী করবে, তার জন্য প্ল্যান করতে থাকে। এটাই চরম আশ্চর্য। যুধিষ্ঠির ঠিকই বলেছিলেন।

সুজানের বাবা ক্রিস্টোফার ম্যাকমোহানের সাথে সব্যসাচীর পূর্বপরিচয় ছিল। উনি একসময় এখানকার এম এল এ ছিলেন। এখনও পার্টি করেন। পরেরবার ভোটে হয়ত আবার প্রার্থী হতে পারেন বলে কথা হচ্ছে। ভদ্রলোকের বয়েস পঞ্চাশের ঘরে। কিন্তু মেয়ে হারানোর শোকে এক রাতেই যেন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন অনেক। একটা আরাম কেদারাতে গা এলিয়ে চুপ করে চেয়ে আছেন সিলিংয়ের দিকে। সব্যসাচীকে ঘরে নিয়ে এল সুজানের দিদি এলিসা। বসতে বলে ক্রিস্টোফারকে আস্তে আস্তে বলল, ''বাবা, সব্যসাচী আঙ্কেল এসেছেন। দেখা করতে। কথা বলো একটু। উঠে বোসো।''

এলিসার কথা শুনে খুব ধীরে ধীরে চেয়ারে উঠে বসলেন ক্রিস্টোফার। সব্যসাচী এগিয়ে গিয়ে একটা হাত চেপে ধরে চুপ করে বসে রইলেন পাশে। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে মুখ খুললেন, "ক্রিস্টোফার, এ দুঃখের কোনও ভাষা হয় না। আমি সকাল থেকে শোনার পর থেকেই... আমাকে ডিজি শুভ ফোনে খবরটা দিল। ও চায় যে আমি দোষীকে খুঁজে বের করি। তুমি কি রাজি আছ?"

সব্যসাচীর কথাটা শুনে প্রায় তিরিশ সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর খুব ধীরে ধীরে ক্রিস্টোফার বললেন, ''যা ভাল বোঝো। আমার মেয়েটাকে তো ফেরাতে পারবে না।''

-"ঈশ্বরকে বলো ও যেন ভাল থাকে। তুমি একা থাকো। আমি এলিসার সাথে কথা বলি একটু।" বলে সব্যসাচী পাশের ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

এলিসা আর সুজান দুই বোন। ওরা বাবার কাছেই মানুষ। সুজানের পাঁচ বছর বয়েসে ওদের মা মারা যান। ক্রিস্টোফারও আর বিয়ে করেননি। একাই মা বাবা দুজনের অভাব পুরণ করেছেন এতদিন।

এলিসা নিজের ঘরে জানলার দিকে ফিরে চুপচাপ বসেছিল। সব্যসাচীর পায়ের শব্দে দরজার দিকে ফিরে তাকায়।

-"আসতে পারি?"

-"নিশ্চয়ই। আসুন।"

-"মা, এই শোকের দিনে আমার অন্যায় আবদার করছি। সুজানের ব্যাপারে কিছু কথা ছিল। আসলে, পুলিশ থেকে আমাকেই ধরল খুনীকে ধরার জন্য। বাবার বয়স হয়েছে, শোকে আরও ভেঙে পড়েছেন। তুই যদি একটু সাহায্য করিস..."

-"বলুন। বসুন আপনি।" বলে একটি চেয়ার এগিয়ে দেয়। চেয়ারে বসে সব্যসাচী বলে, "তোর কি মনে হয় আমায় বল তো? এরকম কে করতে পারে?"

একটু চুপ থেকে এলিসা বলল, ''সত্যি কথা বলতে আমি এই প্রশ্নটা অনেকবার ভেবেছি। কিন্তু এখনও উত্তর পাইনি।''

-"বোনের সাথে তোর সম্পর্ক কেমন ছিল? মানে সব কথা শেয়ার করত?"

এলিসা অন্য কিছু ভেবে বলে উঠল, ''হঠাৎ করে সব কেমন পাস্ট টেন্স হয়ে গেল, বলুন? এই তো কাল অবধি বলতাম 'আছে'। আজ হয়ে গেল 'ছিল'।" আবার একটু থেমে বলে ওঠে, ''হ্যাঁ, আবার না। ও খুব চাপা ছিল। খুব মনের কথা কারোর সাথেই কোনদিন শেয়ার করত না। তবে রোজকার কথা, যেমন ধরুন কলেজে কী হচ্ছে, বন্ধুদের কথা, এসব হত। কিন্তু সেসব থেকে এই ঘটনা লিংক করার মতো কিছু তো পাচ্ছি না।"

-"কারো সাথে কোনও সম্পর্ক? মানে তোরা যাকে বয়ফ্রেন্ড বলিস?"

-"ছিল। ওর সাথে স্কুলেই পড়ত ছেলেটি। ঋতম। কিন্তু ছেলেটির স্বভাব ভাল ছিল না। পড়াশোনাতেও খুব খারাপ। কলেজে আসার পর ওদের সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যায়। বোনই ব্রেক আপ করে। ছেলেটি অনেক জ্বালিয়েছে। ফোন করে বাবাকে অবধি থ্রেট করেছে।"

-"পুলিশকে বলেছিস এটা?"

-"বলেছি। কিন্তু, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, ও এটা করবে না।"

-"কেন?"

-"প্রথমত, এটা প্রায় দু'বছর আগের ঘটনা। কিছু করার হলে, তখনই করত। আর দ্বিতীয়ত, ছেলেটি এখন আর একজনের সাথে এনগেজ্‌ড। সুতরাং... "

-"ছেলেটির পুরো নাম আর ঠিকানা জানিস? তাহলে একটা কাগজে একটু লিখে দিবি?"

এলিসা মাথা নেড়ে টেবিলের ওপর রাখা একটি কাগজে লিখে দেয়। সব্যসাচী কাগজটা পকেটে রাখেন। বলেন,"এটা কি তোদের দুজনের ঘর?"

এলিসা মাথা নাড়ায় নিঃশব্দে। সব্যসাচী উঠে গিয়ে বুকশেলফের সামনে দাঁড়ান।

-"সুজান ইংলিশ নিয়ে পড়ত?"

-"হ্যাঁ।"

-"এই সব বই ওর?"

-"ম্যাক্সিমাম। আমি তো কেমিস্ট্রির স্টুডেন্ট। তাই যত লিটেরাচার দেখছেন, সব ওর।"

-"বাঃ। ভাল পড়াশোনা ছিল তো! একটু দেখব ঘরটা ?"

-"দেখুন। আপনার জন্য কফি করে আনি?"

-"না রে। এসব কিছু দরকার নেই। তুই বোস। তোর সাথে কথা বলতে বলতেই ঘরটা দেখি একটু।"

সব্যসাচী উঠে গিয়ে বুক-শেলফের সামনে দাঁড়ান। মন দিয়ে বই গুলো লক্ষ করতে থাকেন। নিজের মনেই বলেন, "কবিতার বই-ই তো সব। শেলি, ব্রাউনিং থেকে টেড হিউস। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দও আছেন দেখছি। বাঃ।" এলিসার দিকে ফিরে বলেন, "ও কি কবিতা লিখত নিজে?"

-"মাঝে মধ্যে। আমাকে কয়েকবার পড়িয়েছিল।"

-"সেগুলো আছে কোথায়?"

-"টেবিলের ওপর ওর ওই হলুদ ডায়েরিটা।"

সব্যসাচী গিয়ে ডায়েরিটা হাতে নেন। হিজিবিজি অনেক স্ক্রিবলে ভর্তি। মাঝে মধ্যে কয়েকটা কবিতা। বেশিরভাগ ইংলিশে, কিছু বাংলাও আছে। উল্টে-পালটে দেখে বললেন, "এটা আমি একটু নিয়ে যেতে পারি? আমাকে হয়তো কিছু সাহায্য করতে পারে।"

-"ঠিক আছে। নিন।"

-"থ্যাঙ্কু। ও কোন ডায়েরি মেনটেন করত? মানে যাকে বলে রোজনামচা?"

-"নাহ। আমি তো দেখিনি সেরকম কিছু। করত না। তাহলে আমি জানতাম।"

-"এটাই ওর রিসেন্ট ডায়েরি তো?"

-"হ্যাঁ।"

-"পুরোনো ডায়েরি? বা এরকম স্ক্রিবলিংয়ের খাতা? ধর দুবছর আগের?"

-"মানে যেসময় ঋতমের সাথে ব্রেক-আপ হয়?"

-"ইন্টেলিজেন্ট। একদম ঠিক।"

-"দাঁড়ান।" বলে এলিসা উঠে এসে একটা ড্রয়ার খুলে তিনটে খাতা বের করে। "এগুলো সব নানা সময়ের খাতা ওর। আপনি রেখে দিন। কাজে লাগতে পারে হয়তো।"

সব্যসাচী খাতাগুলো নিয়ে উলটে-পালটে দেখে নেন। মধ্যে মধ্যে কিছু ভাঁজ করা কাগজ রাখা। সব্যসাচী সেগুলোকে না দেখে খাতা চারটে নিয়ে কাঁধের ব্যাগের রেখে দেন।

-"অনেক সাহায্য করলি রে, মা। আজ চলি। তুইও বোনের জিনিসপত্র দেখিস। কিছু যদি সিগনিফিকেন্ট মনে হয় আমায় ফোন করিস। আমার নাম্বারটা রেখে দে। তোর নাম্বারটাও আমায় দে।"

রূপক ছেলেটিকে দেখে বেশ বুদ্ধিমান মনে হয়। জয়ন্ত বসাক বিকেলবেলাই সাব-ইন্সপেক্টর রূপক মুখার্জিকে সব্যসাচীর বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। সব্যসাচী বারান্দায় বসেছিলেন হাতে কফির মগ আর সুজানের ডায়েরিগুলো নিয়ে। অনেককিছু লেখা। বেশিরভাগই কবিতা। মনের কথা কয়েক জায়গায়। একটা জায়গায় একটা লিমেরিক লেখা দেখে চোখ আটকে গেল সব্যসাচীর। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক লাগল। কারণ, সুজানের বাকি কবিতার যা ধরন, তার সাথে লিমেরিক জিনিসটা ঠিক খাপ খায় না। আর লিমেরিকটাও একটু অদ্ভুত। বেশ রোম্যান্টিক।

খবর পেলাম দখিন হাওয়ায় তোমার বাড়ির কাছে
আমার নামে ছোট্ট এক ঠিকানা রাখা আছে
প্রদীপ নিয়ে হাতে
উতলা হৃদয়েতে
রাতের আলোয় তোমায় পেলাম কদম বনের মাঝে।

সব্যসাচী বেশ কয়েকবার লিমেরিকটি পড়লেন। খুব রিসেন্টলি লেখা হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে। কারণ তার পরে আর মাত্র দশ পাতা লেখা। তারমধ্যেও আর কোথাও কোনও লিমেরিক লেখা নেই। যদি নতুন ধাঁচে কবিতা লেখা শুরু করার চেষ্টা করত তাহলে তো আরো দু-তিনটে থাকাই উচিত। নাকি, একটা লিখেই স্যাটিসফায়েড না হয়ে ছেড়ে দিয়েছিল লেখা? এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল গেটের সামনে। রূপক এসে বলল ওকে জয়ন্ত বসাক পাঠিয়েছেন, এই কেসে

সব্যসাচীকে হেল্প করার জন্য। ছেলেটির বয়স বেশি নয়। দেখলে মনে হয় তিরিশের আশেপাশে। প্রায় ছ'ফুট লম্বা। মেদহীন সুন্দর চেহারা।

সব্যসাচী ওকে বসতে বলে জিজ্ঞেস করেন, "কী নেবে? চা, কফি? নাকি বিয়ার?"

-"কফিই চলুক। অন ডিউটি বিয়ারটা ঠিক হজম হবে না, স্যার।"

-"তা ঠিক। জিগ্যেস করাটাই বোকামি হয়েছে। বোসো। 'তুমি' করেই বলছি। আমার চেয়ে অ-নে-ক ছোট তুমি।"

-"নিশ্চয়ই।"

সব্যসাচী ঘরের ভিতরে গিয়ে অনুকুলকে বলে আসেন আর একটা কফি পাঠানোর কথা। অনুকুল প্রথম প্রথম বাড়িতে পুলিশ দেখে ভড়কে যেত। এখন সয়ে গেছে।

-"আমি একটু ধুমপান করলে তোমার নিশ্চয়ই অসুবিধা নেই?"

-"না না, ঠিক আছে।"

সব্যসাচী একটা চুরুট ধরান। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলেন, "তোমার কী অ্যানালিসিস কেসটা নিয়ে? নাকি, তুমিও জয়ন্তর মত বলবে যে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট না এলে কিছু বলা যাবে না!"

-"না, তা নয়। তবে কী জানেন? আমাদের তো হাত-পা বাঁধা থাকে। মেথডিক্যাল ভাবেই কাজ করতে হয়। ভুলচুক কিছু থেকে গেলেই প্রেস থেকে মন্ত্রী অবধি সবাই পেছনে পড়ে যাবে। তাই সব দোষ পুলিশকে দিয়ে লাভ নেই। তবে এই কেসটা নিয়ে আমার কিছু ভিউজ আছে। যেরকম ধরুন, খুনটা কীভাবে করা হল, সেটা নিয়ে। আপনি নিশ্চয়ই সেই রাতের ঘটনা শুনেছেন।"

সব্যসাচী মাথা নাড়েন। রূপক বলতে থাকে, "সে রাতে যারা দুজন পিছু নিয়েছিল। তারা এই ব্যাপারটা করতে পারে। এসে বাকিটা বানিয়ে বলছে।"

-"মোটিভ?"

-"জানি না। খুঁজতে হবে। দ্বিতীয়ত, আর একটি সম্ভাবনা। সেই প্রাক্তন প্রেমিক ঋতম।"

-"কিন্তু সে কী ভাবে জানবে যে... আচ্ছা, তুমি বলতে চাও এই ছেলে দুটির মধ্যে কেউ ঋতমের ইনফর্মার হয়ে কাজ করেছে। কিন্তু, এতদিন পর হঠাৎ করে ঋতমই বা বদলা নিতে তৎপর হবে কেন?"

-"এগুলো সবই ওপেন। আমার কাছে কোনও জবাব নেই। আমাদের আরও কোনও সম্ভাবনা আছে কিনা খুঁটিয়ে দেখতে হবে।"

-"গুড। তা তুমি কিভাবে এগোতে বলছ? আই মিন আমাদের প্রথম স্টেপ কী হওয়া উচিত ?"

-"আগে সবার সাথে কথা বলা দরকার। পুলিশ একবার বলেছে। কিন্তু আপনি একবার বলুন।"

-"পুলিশের সাথে কী কথা হয়েছে, তার রেকর্ড আছে ?"

-"হ্যাঁ, অবশ্যই।"

-"এনেছ?"

-"হ্যাঁ। আপনার জন্যে জেরক্স করে এনেছি এক কপি।"

-“বাঃ। তুমি তো বেশ কাজের ছেলে হে।” সব্যসাচী বাচ্চাদের মত তালি দিয়ে বলে ওঠেন। রূপক স্টেপল করা কয়েকটা কাগজ বাড়িয়ে দেয়। সব্যসাচী সেটা হাতে নিয়ে উলটে পালটে দেখেন। তারপর বলেন, “আজ রাতটা আমায় একটু সময় দাও। এই কেসের সাথে জড়িত কেউ যেন বাইরে কোথাও না যায়। এটা এনশিওর করো। কাল সকাল ঠিক নটায় আমায় পিক আপ কোরো।”

-“কোথায় যাবেন?”

-“এদের সাথে কথা বলা দরকার। তবে কার সাথে কখন কথা বলব সেটা রাতে ডিসাইড করব।”

-“ওকে, স্যার। চলি তাহলে?”

-“এসো।”

রূপক চলে যেতে সব্যসাচী সামনের বাগানে একটু হাঁটতে বেরোলেন। মনটা সাংঘাতিক খারাপ হয়ে রয়েছে। এখনও তিনি প্রফেশনাল গোয়েন্দা হয়ে উঠতে পারেননি যে এরকম একটা মর্মান্তিক ঘটনার পরও স্থিতপ্রজ্ঞমুনিপ্রবর হয়ে থাকতে পারবেন। তাই কেসটা সল্ভ করার রোখটা আরও বেশি পেয়ে বসেছে। কিন্তু এখনও অবধি ক্লু কিছু নেই হাতে। শুধু ওই খাতাগুলো। রাতের বেলা আবার ওগুলো নিয়ে বসতে হবে।

সকাল ঠিক নটার সময় রূপক গাড়ি নিয়ে হাজির হল। ছেলেটির পাংচুয়ালিটি দেখে বেশ খুশি হলেন সব্যসাচী। আগেই ব্রেকফাস্ট করে স্নান করে তৈরি ছিলেন। রূপক আসতেই বেরিয়ে পড়লেন। প্রথমে যেতে চাইলেন জোহানের বাড়ি। যেহেতু ওইদিন ওর বাড়িতেই পার্টি ছিল। তাই ওকে দিয়েই শুরু করা যাক।

রাতের বেলা সুজানের সবকটা ডায়েরি মন দিয়ে পড়েছেন সব্যসাচী। ঋতমের সাথে যখন ওর ব্রেক-আপ হয় সেই সময়ের ঘটনাও। ঋতম খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। এমনকী ওকে লাইফ থ্রেটও দিয়েছে, সে কথাও লিখেছে সুজান। তার সাথে ওর নিজের মনের অনেক কথা। যদি সত্যিই একজন ভালোবাসে তাহলে কি করে এরকম ব্যবহার করতে পারে? পড়লেই বোঝা যায়, তখন ওর মনের অবস্থা খুব খারাপ ছিল।

গাড়িতে যেতে যেতে রূপকের সাথে টুকটাক কথা বলছিলেন সব্যসাচী। প্রধানত এই কেসটা নিয়ে। এছাড়াও টুকটাক এটা ওটা নিয়ে। ছেলেটিকে বেশ লাগছিল সব্যসাচীর। অনেক বিষয়ে অনেক পড়াশোনা আছে। সাহিত্য তো বটেই, পাখি, গাছ-পালা নিয়েও বেশ উৎসাহী।

যোহানের সাথে কথা বলে সব্যসাচী খুব বেশি কিছু ইনফর্মেশন পেলেন না। সে রাতে যা যা ঘটেছিল সেটা আবার ব্রিফ করল যোহান। বোঝা গেল পুলিশ যা বলেছে, সেটা যোহানের কথাই। যোহানের সাথে সুজানের বন্ধুত্ব ছিল ভালই। দুই পরিবারের মধ্যেও ভাল সম্পর্ক থাকার জন্য সুজান আর যোহান দুজনেই ভাই-বোনের মত বড় হয়েছে।

-“তুমি কাউকে সন্দেহ কর, যে এই কাজ করতে পারে?” সব্যসাচী ডান পা-টা বাঁ পায়ের ওপর তুলে প্রশ্ন করেন।

-"নাহ। ওর মত মেয়ের কোনও শত্রু থাকতে পারে এটাই তো ভাবতে পারছি না। বিলিভ মি আঙ্কেল, ও এতটাই ভাল ছিল যে... মানে কী বলব? ওকে সবাই ক্লাসে নানা নাম দিত, খ্যাপাত। আমি কোনওদিন ওকে কারোর সাথে ঝগড়া করতে দেখিনি।"

-"ওর পার্সোনাল লাইফ সম্পর্কে কতটা জানো? মানে প্রেম..."

-"খুব বেশি নয়। সেই ঋতমের ব্যাপারটা আমরা সবাই জানি। ব্যাস্, ওটুকুই। তারপর ও খুব মনমরা থাকত। তবে... সেটা অবশ্য আমার ভুল হতে পারে।"

-"কী?"

-"ইদানীং, মানে বেশ কিছুদিন ধরে ওকে দেখেছিলাম, সেই ঋতমের ব্যাপারটা মনে হচ্ছিল কাটিয়ে উঠেছে। আমি জানি না, আমি ওকে ছোট থেকে দেখেছি তো, তাই কেন জানি না মনে হয়েছে যে ও বোধহয় নতুন করে কারও সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছে নিজেকে। দু-একবার জিজ্ঞেস করেছি। বাট, কিছু বলেনি।"

-"কিছু বলেনি, নাকি বলবে না বলেছে?"

-"না, বলেছে যে, অ্যাজ টাইম হিলস্ এভেরিথিং, ও-ও রিকভার করে উঠেছে।"

-"তুমি ছাড়া ওর আর কোনও ক্লোজ ফ্রেন্ড। মেয়েদের মধ্যে কেউ?"

-"সুদেষ্ণা, মৈত্রী ওর ভাল বন্ধু। তবে মনে হয় না যে ও কারও সাথে সব কথা শেয়ার করত।"

-"আচ্ছা, ওদের ফোন নাম্বারগুলো আমায় একটু লিখে দেবে?" সব্যসাচী নিজের লাল ডায়েরিটা বাড়িয়ে দিলেন। যোহান নিজের মোবাইল থেকে দেখে ওদের ফোন নাম্বারদুটো লিখে ডায়েরিটা ফেরত দেয়।

-"মেনি মেনি থ্যাঙ্কস। তোমার বাবার সাথে কথা বলা যায় একবার ?"

-"নিশ্চয়ই। দাঁড়ান, বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।"

-"নাহ। ডাকতে হবে না। যদি অসুবিধা না থাকে আমি একা গিয়ে একটু কথা বলতে চাই।"

-"ওহ, আসুন।" সব্যসাচী রূপককে বসতে বলে ভিতরে চলে যায় যোহানের সাথে।

রূপক যে ব্যাপারটাতে খুশি হয়নি ওর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। সব্যসাচী সেটা লক্ষ করেই বললেন, "কী ব্যাপার ? অখুশি মনে হচ্ছে ?"

-"নাহ। পুলিশকে এভাবে অন্ধকারে রেখে তদন্ত করাটা কি ঠিক ?"

-"অন্ধকার কোথায় হে? রবি ঠাকুর পড়নি? অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো।"

-"সেই, এত আলো যে অন্ধ হয়ে যাচ্ছি প্রায়।"

-"রাগ করে না। দেখ, যোহানের বাবা তোমায় চেনেন না। তাই তোমার সামনে হয়ত সব কথা খুলে বলতে সঙ্কোচ করবেন, মানে যেগুলো হয়ত আমায় একা দেখলে বলবেন, সেগুলো তোমার সামনে নাও বলতে পারেন।"

-"প্রথম কথা হল, যে উনি তো কোনওভাবেই এই কেসের সাথে যুক্ত নন, তাছাড়া, যদি কিছু জানেনও সেটা পুলিশকে জানানো তাঁর প্রাইমারি কর্তব্য।"

-"উফ। এত বুকিশ হোয়ো না। সাইকোলজি ভাব। উনি এমন অনেক কিছু হয়তো জানেন যেগুলো এই কেসের সাথে যুক্ত নয়। কিন্তু কেসের ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করার জন্য খুব প্রয়োজনীয়। আর সেটা আমি হয়তো বুঝব, বা তোমায় বললে তুমি বুঝবে, কিন্তু উনি সেটা না বুঝে তোমার সামনে হয়ত ডিসক্লোজ নাও করতে পারেন।"

-"তাহলে এবার তো আমায় বলুন অ্যাট লিস্ট। উনি কী বললেন ?"

-"বাদুড় বলে ওরে ও ভাই সজারু, আজকে রাতে দেখবি একটা মজারু।"

-"সে আবার কী?"

-"ধৈর্যং রহু। যথা সময়ে সব জানতে পারবে।" বলে সব্যসাচী জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে একটা সুর ভাঁজতে থাকলেন। যোহানের বাবার ঘরে যখন ঢুকেছিলেন, ওদের পুরোনো রেকর্ড প্লেয়ারে বাখের এই সিম্ফনিটা বাজছিল।

সুদেষ্ণা আর মৈত্রী দুজনের সাথেই দেখা হল সব্যসাচীর। দুজনেই বাকিদের থেকে অতিরিক্ত সেরকম কিছু বলতে পারল না। তবে দুজনেই যোহানের কথার সাথে একমত হল যে সুজান ঋতমের ব্যাপারটা থেকে ইদানীং বেশ রিকভার করে উঠেছিল। তবে সেটা কারোর সাথে নতুন সম্পর্কের জন্য কিনা সেটা তারা শিওর নয়।

সুদেষ্ণার বাড়ি থেকে বেরিয়ে সব্যসাচী ঠিক করলেন ঋতমের বাড়ি যাবেন। ঘড়িতে বারোটা বাজে প্রায়। সাম্য আর প্রত্যুষকে ফোন করা হয়েছিল। কিন্তু ওরা বাড়ির বাইরে থাকায় বিকেলের দিকে দেখা করবে বলেছে। ঋতমকে ফোনে পাওয়া যায়নি। তাই সব্যসাচী ঠিক করলেন ওর বাড়ি গিয়েই সরাসরি দেখা করবেন।

ঋতমদের বাড়িটা প্রায় ছোটখাটো প্রাসাদ একটা। ওর বাবা এখানকার একটি রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। একসময় স্থানীয় কাউন্সিলর ছিলেন। এখন এম এল এ হওয়ার লড়াইয়ে আছেন। বাড়ির দরজায় বেল বাজাতেই একজন কাজের লোক বেরিয়ে এল।

-"ঋতম আছে? বলুন পুলিশ থেকে এসছি।"

-"না, ঋতমদাদা তো নেই।"

-"বাড়িতে যে আছেন, ডাকুন।"

-"একটু দাঁড়ান।" বলে সে ভিতরে চলে যায়। মিনিট দুয়েক পর একজন ভদ্রমহিলা এসে দরজা ফাঁক করেন।

-"কী ব্যাপার?"

-"নমস্কার। আপনি কি ঋতমের মা?"

-"হ্যাঁ, ঋতম বাড়ি নেই। কী ব্যাপার ?"

-"আমরা একটি কেসের ব্যাপারে ঋতমের সাথে কথা বলতে চাই।"

-"কী কেস ?"

-"কাল রাতে এখানে একটি মেয়ে খুন হয়েছে, সেই ব্যাপারে!"

-"মানে? ঋতম ওইসব খুন খারাপিতে কী করবে ?"

-"মেয়েটির সাথে ঋতমের আগে সম্পর্ক ছিল। তাই আমরা ঋতমের সাথে কথা বলতে চাই।"

-“এসব মিথ্যে কথা। ঋতমের সাথে কারও কোনও সম্পর্ক ছিল না। ঋতম বাড়ি নেই। আর আপনাদের সাথে কোনও কথা বলবে না। ওর বাবার সাথে কথা বলবেন।” বলে ধড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেন। সব্যসাচী বোকার মত মুখ করে রূপকের দিকে তাকান। রূপক মিটিমিটি হাসছিল।

-“পলিটিক্যাল লিডার। তাও আবার রুলিং পার্টি। এবার উপর থেকে চাপ আসল বলে।” রূপক গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলে।

-“যদি নির্দোষই হয়, তাহলে কথা বলতে কী অসুবিধা?” সব্যসাচীও পা বাড়ান গাড়ির দিকে।

-“সেটাই তো চিন্তার ব্যাপার, স্যার! থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে কথা বের করা যেত যদি ওর ওই বাপ না থাকত মাথার ওপর।” বোঝা গেল রূপক বেশ রেগে গেছে ভদ্রমহিলার ব্যবহারে।

-“দাঁড়াও, মাথা ঠান্ডা রাখো। ভাবতে হবে। এইসব টপকেও ওকে ধরা যায় কিনা।” সব্যসাচী গাড়িতে বসে বলেন।

-“এখন কোথায়? লাঞ্চ করে নেওয়া যাক, নাকি?”

-“চলো। তুমি আমায় আমার বাড়িতে ড্রপ করে দাও। দিয়ে ঠিক তিনটেয় ফিরে এসো। বাকি দুজনের সাথে কথা বলে নিতে হবে। তাহলে আশা করি আজকের মত কাজ শেষ।”

লাঞ্চের পর সব্যসাচী নিজের ঘরে বসে সুজানের খাতাগুলো আবার উলটে পালটে দেখছিলেন। ঘড়িতে সবে দুটো কুড়ি। এখনও চল্লিশ মিনিট বাকি বেরোনোর। আজ এখনও অবধি যাদের সাথে কথা হল, সেগুলো থেকে ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্টগুলো একটা ডায়েরিতে আগেই লিখে ফেলেছেন। সুজানের খাতাটা ওল্টাতে ওল্টাতে সেইসব একসাথেই চিন্তা করছিলেন। হঠাৎ সদর দরজায় বেল বাজাতে চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। অনুকুল বোধহয় ছাদের ঘরে ঘুম দিচ্ছে। সব্যসাচী নিজেই উঠে যান খোলার জন্য।

দরজা খুলতেই একটি চোয়াড়ে গোছের ছেলে ঘরে ঢুকে আসে। বাইরে আরো দুজন দুটো বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে। ছেলেটি ঘরে ঢুকেই বেশ কিছু গালিগালাজ করে বলতে থাকে, “বয়স হয়েছে, টিকটিকিগিরি করার স্বভাব গেল না? আমার পিছনে পোড়ো না কাকা। বেশি ওস্তাদি মারলে আমার বাবাকেও লাগবে না, আমিই ওই ঠ্যাঙদুটো ভেঙে দেব। বলে রাখলাম।”

সব্যসাচী কিছু বলার আগেই বেড়িয়ে বাইকে বসে অদৃশ্য হয়ে যায়। বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না যে এই হল ঋতম। থ্রেট শুনেও খুব একটা হেলদোল হল না সব্যসাচীর। নির্লিপ্তভাবে এসে আবার ডায়েরিগুলো খুলে বসলেন। মনের মধ্যে অনেকগুলো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। নিজের ডায়েরিতে সেগুলো লিখতে শুরু করলেন।

১। খুন হল কেন?

২। যে খুন করবে, সে কি জানত সুজান ওই সময় ওখানে আসবে?

৩। জানত যদি কী করে জানল ?

৪। যে ছেলেদুটি পিছু নিয়েছিল, ওদের সাথে যোগসাজশ ছিল কি? নাকি সুজান নিজেই বলেছিল?

৫। হত্যা করার অস্ত্র কী? এবং কোথায়?

৬। হত্যার পর বুকের ওপর গোলাপফুলই বা রাখল কেন? তাহলে কি প্রিয় কেউ?

৭। ঋতম কি জড়িত? ওর অ্যালিবাই? (রূপককে বলতে হবে খোঁজ নিতে)

৮। সুজানের খাতা পড়ে কিছু একটা খটকা লাগছে — কিন্তু সেটা কী?

৯। রাজমিস্ত্রি কি বই পড়ে?

এত অবধি লিখতে লিখতেই বাইরে গাড়ির আওয়াজ হল। রূপক এসে গেছে। ঘড়িতে ঠিক তিনটে বাজে। সময়জ্ঞান আছে বলতে হবে।

সাম্য ছেলেটিকে দেখে মনে হয় না যে খারাপ কিছু করতে পারে। দুষ্টু সবাই কমবেশি হয়। বিশেষ করে এই বয়েসে। কিন্তু বদমাইশ আর দুষ্টুর মধ্যে পার্থক্য আছে। সাম্য হল দুষ্টু। কিন্তু তাকে দোষী হিসাবে ভাবাই যায় না। সব্যসাচী নিজের ফিলিংসকে সরিয়ে রাখলেন। সাম্যর বাড়িতে সবাই বেশ ভয় পেয়েছে বোঝা যাচ্ছে। ওর মা তো প্রায় কেঁদেই ফেলবেন মনে হচ্ছে। বাবাও গম্ভীর খুব। ছেলের সাথে তো কথাই বলতে দেবেন না প্রথমে। তারপর সব্যসাচী ওনাকে বোঝালেন যে ওঁর ছেলেকে সন্দেহ করা হচ্ছে না, কিন্তু দোষীকে ধরার জন্যে ওর সাহায্য চাই। তখন কিছুটা নিমরাজি হয়ে দিলেন।

সাম্য সেদিন রাতে যা ঘটেছিল সেটা আবার বলল। সব্যসাচী সবার কাছ থেকেই রাতের ঘটনাটা শুনছেন, কোনও অসঙ্গতি আছে কি না শুনতে চাইছেন। এখনও অবধি কোন অসঙ্গতি ধরা পরেনি। সাম্যর কথার সাথেও বাকিদের কথা মিলে গেল।

-"তোমরা একটা বাইকের আওয়াজ শুনেছিলে বললে। দেখেছিলে বাইকটাকে?"

-"না। আমরা শুধু আওয়াজ শুনেছিলাম। রাতের বেলা, এইসময়, শীতকালে তো অনেক দূরের থেকেও আওয়াজ পাওয়া যায়।"

-"হেডলাইট?"

-"নাহ। তাও দেখিনি। আসলে আওয়াজ শুনেই তো আমরা ওই একটা বাড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিলাম। তাই কিছু দেখতে পাইনি।"

-"আচ্ছা। তা যেখানে লুকিয়েছিলে, সেখান থেকে রাস্তা দেখতে পাচ্ছিলে?"

-"হ্যাঁ। বাড়ির সামনের রাস্তাটা দেখা যাচ্ছিল।"

-"সেখান দিয়ে বাইকটাকে যেতেও দেখনি। তাই তো ?"

-"না, দেখিনি।"

-"ওখানে তো কোনও মোড় নেই যে ওটা অন্য রাস্তায় যাবে।"

-"এটা হতে পারে যে এসে আবার ফিরে গেছে।" রূপক বলে।

-"হুম। ভাবাচ্ছে ব্যাপারটা। এমনও তো হতে পারে যে বাইক আরোহী এসেছিল সুজানের সাথেই দেখা করতে। এবং দুজনে ওই বাড়িতে ঢোকে, তারপর খুন করে। কিন্তু বাইক আরোহী যদি খুনিই হয়, তাহলে সুজান ওর সাথে কেন যাবে? আর যদি জোর করেই নিয়ে যায়, তাহলে ওরা কিছুটা হলেও চিৎকার শুনতে পেত, বা কোন আওয়াজ পেত। কিন্তু সেসব তো কিছু শোননি। তাই না?"

-"না, স্যার।" সাম্য বলে।

-"সেটাই হচ্ছে কথা। আচ্ছা, রূপক ওর মোবাইলের কল বা মেসেজ রেকর্ড থেকেও কিছু পাওয়া যায়নি, তাই না?"

-"সেটা আপনি দুদিন পর, আজ জিগ্যেস করছেন ?" রূপক একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করে।

-"হ্যাঁ। কারণ, ওখান থেকে কিছু পাওয়া গেলে তোমরাই কেসটা সল্‌ভ করতে, আমায় ডাকতে হত না।"

-"তা বটে। নাহ। সব চাঁছাপোছা। কিচ্ছু ছিল না। একজন অনেক প্ল্যান করে যেন সমস্ত কিছু ডিলিট করেছে মোবাইল থেকে।"

-"তার মানে সে সুজানের মোবাইল স্ট্রাকচারটাও জানত।"

-"অথবা মোবাইলটা রিসেট করেছিল। সিমপ্লি।" রূপক ওর ভাবনাটাতে দিশা পায়।

-"ফিঙ্গার প্রিন্ট?"

-"নাহ। কিছু পাওয়া যায়নি। খুব যত্ন করে মুছে দিয়েছে। অথবা হাতে গ্লাভস ছিল।"

সাম্যদের বাড়ি থেকে বেরোতেই বেশ জোর বৃষ্টি নামল। সকাল থেকেই বেশ মেঘ করেছিল। এখন সেটা ঝমঝমিয়ে নেমে গেল। খানিকটা যাওয়ার পর ড্রাইভার বলল এত বৃষ্টিতে চালানো যাচ্ছে না।

-"আমার কোয়ার্টার কাছেই। যাবেন? কফি খাবেন চলুন।" রূপক বলে।

-"অগত্যা। চল। ঠান্ডায় কফিটা ভালই জমবে।" সব্যসাচী রাজি হয়ে যান।

রূপকের কোয়ার্টারে ঢুকে একটু আরাম বোধ হল সব্যসাচীর। "আপনি একটু বসুন, আমি কফি বসাই।" বলে কিচেনের দিকে চলে যায় রূপক।

সব্যসাচী ঘুরে ঘুরে রূপকের ঘরটা দেখছিলেন এই ফাঁকে। আসবাব কিছু নেই তেমন। ব্যাচেলরস্ রুম। একটা টেবিল। তার ওপরে কিছু বইপত্র ছড়ানো। বেশীরভাগই সাহিত্য। ব্রাউনিং, শেলি, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, লীলা মজুমদার — নানারকম। একদিকে একটা দেওয়াল আলমারি। একটা পাল্লা খোলা। নীচের তাক থেকে কিছু বই আর উপরে জামাকাপড় উঁকি মারছে। সব্যসাচী টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ান। একটা মধুসূদন রচনাবলী দেখে হাতে তুলে নেন। পাতা ওলটাতেই রূপক এসে ঢোকে। ধূমায়িত কফি সহ।

সব্যসাচী একটা কাপ তুলে নিয়ে চেয়ারে বসেন। "তুমি মধুসূদন পড় নাকি?" সব্যসাচী প্রশ্নটা করে গরম কফিতে একটা চুমুক দেন।

-"হ্যাঁ, চেষ্টা করি।"

-"পড়ার অভ্যাস খুব ভাল। এখন তো মোবাইল, ফেসবুকের যুগে বই পড়ার অভ্যাস কমেই যাচ্ছে। একদিন দেখবে বই কী জিনিস সবাই ভুলে গেছে।"

-"ফারেনহেইট ফোর ফিফটি ওয়ান ?"

-"হ্যাঁ, কাইন্ড অফ। শুধু ওখানে রাষ্ট্র করেছিল, এখানে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় করবে।"

-"তা ঠিক।" বলে রূপক চেয়ার টেনে নিয়ে বসে।

-"যাই হোক, কেসটা নিয়ে কী ভাবছ ?"

-"দেখুন এটা যদি একটা জমাটি গোয়েন্দা গল্প হত, আর ঋতমের বাবার এত প্রভাব না থাকত, তাহলে অবশ্যই একজন বোকা পুলিশ হিসাবে ঋতমকে তুলে নিয়ে যেতাম থানায়।" সব্যসাচীর মুখে একটু হাসি খেলে যায়। রূপক বলতে থাকে, "কিন্তু আমি এখনই কোন কনক্লুশনে আসতে চাই না। মে বি ঋতমই খুন করেছে, কিন্তু মোটিভ নিয়ে একটু ডাউট আছে। দুজনের বাবা দুটো বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এম এল এ পদপ্রার্থী। সেটা নিয়ে এরকম নোংরা খেলা খেলতেই পারে। কিন্তু প্রমাণ কই ?"

সব্যসাচী মন দিয়ে সবটা শুনে বলেন, "সেদিন রাতে সাম্যরা যে বাইকের আওয়াজ শুনেছিল, সেটা ঋতমের হতে পারে। এমন কী হতে পারে যে, একা রাস্তায় সুজানকে দেখে ঋতম ওকে ধরে নিয়ে যায়। খারাপ কিছু করতে গেছিল, কিন্তু সুজান বাধা দেওয়ায় হয়ত হত্যা করে।"

রূপক প্রবাল মাথা নেড়ে বলে, "এটা কী বলছেন, স্যার? তাহলে ওই ছেলে দুটো একবারও কোনও আওয়াজ শুনবে না? অন্তত একটা চিৎকার তো শোনাই উচিত।"

সব্যসাচী মাথা নেড়ে বলেন, "ঠিক বলেছ। যদি ওরা ক্লিন হয়।"

-"মানে?"

-"মানে হয়তো ওরাই বাইকওয়ালাকে ডেকে আনে। এখন পুলিশের বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জনের জন্য আধা সত্যি বলছে।"

-"সেটা যুক্তিপূর্ণ হলেও আমার কেন জানি মনে হয় ছেলেদুটো খারাপ নয়।"

-"দ্যাখো ভাই, সব মনে হওয়া দিয়ে কাজ চলে না। আর কাউকে ক্লিন বা কাউকে দোষী ধরে নিয়ে যুক্তি সাজালে ভুল থেকে যায়। যুক্তি সাজিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসা উচিত।"

রূপক মাথা নেড়ে, "তা ঠিক" বলে চুপ করে যায়। দুজনে কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর সব্যসাচী বলেন, "আচ্ছা, ওই গোলাপফুলের ব্যাপারে কী মত?"

-"কোন গোলাপফুল ?"

-"সুজানের বুকের ওপর একটা রাখা ছিল।"

-"ওহ। জানি না। হয়তো সুজানের কাছে ছিল। খুনের পর সেটা কোনভাবে পড়ে যায়। খুনি সেটা বুকের ওপর রেখে চলে যায়।"

-"প্রথম কথা হল, সেটাকে তুলে অত সুন্দর করে সাজিয়ে রেখে কেন যাবে? দ্বিতীয়ত, কেউ কোনওদিন খ্রিসমাস পার্টিতে গোলাপ ফুল নিয়ে যায়?"

-"সেটা ঠিক কথা। তাহলে কী বলতে চান, খুনির সাথে সুজানের কোনও সম্পর্ক..."

-"থাকতে পারে। আচ্ছা, এখানে ফুলের দোকান কী অনেক আছে?"

-"বাজারের দিকে আছে কিছু।" একটু থেমে আবার বলে, "আপনি কী ভাবছেন, গিয়ে খোঁজ নেবেন যে গোলাপ ফুল কিনেছিল কিনা, সেদিন কেউ?"

-"ভাবছিলাম।"

-"দেখা যেতে পারে। কিন্তু কোনও ফল পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। দু-তিনদিন আগে কে একজন একটা গোলাপফুল কিনেছে, সেটা মনে করে রেখে দেবে না। আর গোলাপফুল নাও কিনতে পারে, কে বলতে পারে, তার বাড়িতে গাছ থাকতে পারে। নয় কি?"

-"তা ঠিক।"

-"তবে একবার গিয়ে দেখা যেতে পারে। বৃষ্টিটা থামলে চলুন একবার।"

"হুম" বলে সব্যসাচী চুপ মেরে যান। রূপক একটু পরে বলে, "কী ব্যাপার? আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে, আপনি সব হাল ছেড়ে দিচ্ছেন।"

-"তা যা বলেছ ! এরকম কেস পাইনি কখনও। কোন ক্লু-ই পাচ্ছি না। সত্যি নেই, নাকি দেখতে পাচ্ছি না, কী জানি?"

-"ফ্যাক্টস যা যা আছে, তা থেকেই ভাবতে হবে। কেউ তো আর খুনির নাম লিখে দিয়ে যাবে না।"

সব্যসাচী কফি শেষ করে কাপটা টেবিলের ওপর রেখে আবার মধুসূদন রচনাবলী তুলে নেন।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর নোটস আর সুজানের ডায়েরিগুলো নিয়ে সব্যসাচী টেবিলে বসতেই ফোনটা বেজে ওঠে। এলিসা।

-"হ্যাঁ রে, মা, বল।"

-"আঙ্কেল, আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম না তো ?"

-"একদম না। বল।"

-"আসলে হঠাৎ একটা কথা মাথায় এল। বোন সেদিন মানে খ্রিসমাসের দিন রাতে যোহানদের বাড়ি যাওয়ার সময় হাতে একটা বই নিয়ে বেরিয়েছিল। এটা ওর নতুন কিছু নয়, কিন্তু বইটা কি পুলিশ পেয়েছে ?"

-"না তো। আমায় জয়ন্ত বসাক, মানে ইন্সপেক্টর বলল শুধু গোলাপফুল আর সুজানের মোবাইল ছাড়া আর কিছু ছিল না।"

-"ওহ। তাহলে কি ওর বন্ধুদের কাউকে দেওয়ার জন্য..."

-"দাঁড়া আমি ওর বন্ধুদের ফোন করে জিগ্যেস করে তোকে জানাচ্ছি।"

-"ওকে, আঙ্কেল, গুড নাইট।"

-"গুড নাইট।"

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে ভাবলেন সব্যসাচী। তারপর সুজানের ডায়েরিটা হাতে নিয়ে আনমনে পাতা ওলটাতে লাগলেন। হঠাৎ এক জায়গায় এসে চোখ আটকে গেল। সব্যসাচীর মাথার মধ্যেকার অন্ধকার যেন এক ধাক্কায় সরে গিয়ে কিছুটা আলো দেখা দিল। চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠে ফোন নিয়ে রূপককে ফোন করলেন।

-"হ্যালো রূপক। এই ম্যাকমোহনপুরে অবাঙালি কিন্তু ভারতীয় কোন ফ্যামিলি আছে?"

-"থাকতেই পারে। হঠাৎ?"

-"একটা ক্লু পেয়েছিলাম মনে হচ্ছে। তুমি কি বাড়ি, না থানায়?"

-"থানায়।"

-"তাহলে আমায় একটু খোঁজ নিয়ে জানাও, জলদি।"

-"ওকে, বাট ক্লুটা কী?"

-"আগে জানাও, দেন শিওর হয়ে বলব।"

-"আচ্ছা। আপনাকে আমি কল ব্যাক করছি।"

ফোনটা রেখে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকেন সব্যসাচী। যা ভাবছেন, সেটা কি ঠিক? নাকি কোথাও ভুল হচ্ছে? এরকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই রূপকের ফোন আসে।

-"স্যর, এখানে অবাঙালি পরিবার একটিই আছে। জুয়েল শর্মা। বাজারে দোকান আছে।"

-"ওহ্," সব্যসাচী একটু যেন দমে যান, "কাপুর পদবির কেউ নেই?"

-"কাপুর? নাহ। ওই একজনই আছে। কিন্তু আপনার হঠাৎ 'কাপুর' দিয়ে কী হবে?"

-"না হে, তাহলে ভুল ইন্টারপ্রেট করেছিলাম। আবার অন্ধকারে ডুবে গেলাম।" সব্যসাচী ফোনটা রেখে আবার বসে পড়েন। কপালটা সাজ্ঘাতিক কুঁচকে আছে। এবার তো মনে হচ্ছে ঋতমকে থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে কিছু করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। খুব বিরক্ত লাগতে শুরু করল নিজের ওপর। তারমধ্যে বাইরের ঘরে অনুকুল টিভিতে কিছু একটা হিন্দি সিনেমা চালিয়েছে। তার 'ধাঁই-ধুঁই' আওয়াজ আসছে। বিরক্তিটা শেষ সীমা স্পর্শ করতেই মনে হল অনুকুলকে বলবেন টিভি বন্ধ করতে। উঠে বাইরের ঘরে এসে দেখলেন অনুকুল দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। টিভি নিজের মনে চলে যাচ্ছে। সিনেমা শেষ, ক্রেডিট উঠছে। রিমোট কন্ট্রোলটা নিয়ে টিভিটা অফ করতে গিয়ে স্ক্রীনে চোখ আটকে গেল। আবার মাথার মধ্যে একটা স্পার্ক।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে খানিকক্ষণ বিছানায় চুপচাপ বসে রইলেন। কাল রাতেই কেসটা প্রায় সল্‌ভ করে ফেলেছেন, শুধু শুভর কাছ থেকে একটা খবর জানতে চেয়েছেন। সেটা এলেই হয়ে যাবে। বসে বসে সেই কথাই ভাবছিলেন। এরকম অদ্ভুত কেস তিনি আগে কখনও পাননি। কত রকম মানুষ হয়। আসলে সবাই পাগল, সাইকো। কারও ক্ষেত্রে সেই পাগলামোগুলো আর একজনের ক্ষতি করে, তখনই তারা সমাজের চোখে অপরাধী হয়ে যায়। কাল রাতে কলেজের দুজন বন্ধুকে ফোন করেছিলেন। একজন ইংলিশের মৈত্রেয়ী বসু, আর একজন সাইকোলজির সৌমিত্র সেন। ওদের কথার ওপর ভরসা করেই কেসটাতে ইতি টানলেন। আর একটা খটকা কাটানোর জন্য শুভকে বলতে হল একটা খবর জোগাড় করে দিতে।

খবরটা শুভ সময় মতই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কেসটার ফলাফল নিয়ে কথা বলার জন্য সবাই মিলে রূপকের কোয়ার্টারে জড়ো হলেন ঠিক বিকেল ছটায়। সবাই বলতে সব্যসাচী, রূপক, শুভ আর জয়ন্ত বসাক। সব্যসাচী ফোন করে সবাইকে বলে দিয়েছিলেন যে অ্যাকশন প্ল্যান বানানোর জন্য এই মিটিংটা দরকার।

এক রাউন্ড কফি পর্ব শেষ হতেই সব্যসাচী ধীরে ধীরে বলতে শুরু করেন, "এই গল্পের শুরু আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে। সুজানের বাবা, ক্রিস্টোফার তখন চা বাগানের মালিক। এক রাত্রে হাতি তাড়াতে গিয়ে বন্দুকের গুলিতে এক কর্মীর ছোট ছেলেকে আহত করেন। তার দুদিন পরে ছেলেটি মারা যায়। এটা নিয়ে পুলিশ কেস হতে পারত, কিন্তু হয়নি ক্রিস্টোফারের

প্রচুর প্রভাব আর পয়সার জোরে। সেই কর্মচারী এই অঞ্চল ছেড়ে চলে যান — কোথায় জানা যায় না। এই গল্পটা আমি জানতে পেরেছিলাম যোহানের বাবার কাছ থেকে। টাকাপয়সা দিয়ে হয়ত মুখ কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখা যায়, কিন্তু বুকের ভিতরের আগুন তো বন্ধ হয় না। প্রতিশোধের জ্বালা থেকেই যায়। সেই কর্মচারীর বড় ছেলে ম্যাকমোহনপুরে ফিরে আসেন ওই ঘটনার প্রায় বাইশ বছর পর। ক্রিস্টোফারকে খুঁজে বের করতে কষ্ট হয়নি। কারণ তিনি তখন এখানকার এম এল এ। ক্রিস্টোফারের ছোট মেয়ে সুজান তখন স্কুলের শেষ পর্যায়ে। ঋতমের সাথে ব্রেক-আপ হওয়ার পর খুব মনমরা। সবার চোখের আড়ালে সুজানের সাথে বন্ধুত্ব শুরু হয় তার। সুজান নিজে খুব চাপা হওয়ায় এ কথা কেউই জানতে পারে না, একমাত্র ওর নিজের ডায়েরি ছাড়া। তাও সহজভাবে নয় — কৌশলে। সেটা কী কৌশল সেটায় পরে আসছি। এদিকে দুজনের বন্ধুত্ব প্রেমে পরিণত হয় বছরখানেকের মধ্যে। সুজান নিজের পছন্দগুলো শেয়ার করতে পারত। তাকেই ফেরত দেওয়ার জন্য একটি বই নিয়ে সুজান সেই খ্রিসমাসে রাতে বেরিয়েছিল এবং দেখা করার জন্য তাড়াতাড়ি যোহানের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। এর মধ্যে সাম্যরা মজা করার জন্য তাকে ফলো করতে শুরু করে। এবং তাকে ওই বাড়িটার সামনে গিয়ে হারিয়ে ফেলে। এখানে বলে রাখি যে সেদিন যে বাইকের আওয়াজ পেয়ে সাম্যরা লুকিয়ে পড়ে, সেই বাইকে আমাদের খুনি ছিলেন না। সেটা কে ছিল এখনও জানা যায়নি। খুনি তথা সুজানের প্রেমিক ইতোমধ্যেই ওই বাড়িটার মধ্যে হাজির ছিলেন। কারণ ওটাই ছিল তাদের মিটিং পয়েন্ট। প্রতিশোধের এই মওকা ছাড়তে রাজি ছিল না সে। সুজান কবিতা ভালোবাসত। তাকে এক কবিতা অবলম্বনেই হত্যার ছক করে অপরাধী।"

-"কবিতা অবলম্বনে মৃত্যু?" জয়ন্ত বসাক অবাক। সব্যসাচী পকেট থেকে একটি কাগজ বের করে বলেন, "তাহলে পড়ি, শুনুন...।

...While I debated what to do.
That moment she was mine, mine, fair,
Perfectly pure and good: I found
A thing to do, and all her hair
In one long yellow string I wound
Three times her little throat around,
And strangled her. No pain felt she;
I am quite sure she felt no pain.
As a shut bud that holds a bee,
I warily oped her lids: again
Laughed the blue eyes without a stain.
And I untightened next the tress
About her neck; her cheek once more
Blushed bright beneath my burning kiss:..."

-"রবার্ট ব্রাউনিং। পরফাইরিয়াস্ লাভার।" রূপক ধীরে ধীরে বলে।

-"তুমিও কবিতা পড় নাকি?" জয়ন্ত বসাক বলেন।

-"কবিতা না পড়লে কি এভাবে কাব্যিক খুন করা যায়, জয়ন্তবাবু?" সব্যসাচী বলে ওঠেন।

-"মানে?" জয়ন্ত বসাক সাংঘাতিক অবাক।

-"মানেটা আমার কাছেও পরিষ্কার ছিল না। পরিষ্কার হয় সুজানের কাছ থেকে।"

-"সুজানের কাছ থেকে পরিষ্কার হয়? কি আবোল-তাবোল বকছেন?" জয়ন্ত বসাকের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে মনে হয়।

-"মানুষ মারা যাওয়ার পরেও তার থেকে যাওয়া জিনিসপত্র তার হয়ে কথা বলে। যেমন সুজানের ডায়েরি। আমি হঠাৎ একটা লিমেরিক আবিষ্কার করি। লিমেরিক হল পাঁচ লাইনের কবিতা, প্রথম দু-লাইন আর শেষ লাইনে একই ছন্দ থাকে, আর মাঝের দুলাইন থাকে আলাদা ছন্দে। এরকম কবিতা বিশেষত মজার কবিতা হয়। যেমন এডোয়ার্ড লিয়ার লিখে গেছেন। সুজানের অন্যান্য কবিতা অনেক বেশি ভাবগম্ভীর। সেখানে লিমেরিকের জায়গা নেই। তার মধ্যে হঠাৎ একটি লিমেরিক দেখে আমার খটকা লাগে। কবিতাটি পড়ি, শুনুন -

খবর পেলাম দখিন হাওয়ায় তোমার বাড়ির কাছে
আমার নামে ছোট্ট এক ঠিকানা রাখা আছে
প্রদীপ নিয়ে হাতে
উতলা হৃদয়েতে
রাতের আলোয় তোমায় পেলাম কদম বনের মাঝে।

কবিতাটা পরে কিছু বুঝলেন? নাহ। আমিও কিছু বুঝিনি। সেদিন হঠাৎ বৃষ্টিতে আটকে পড়ে এখানে এসে মধুসূদন রচনাবলী ওলটাতে গিয়ে মানেটা খুঁজে পাই। মধুসূদন তাঁর প্রিয় বন্ধু গৌরকে নিয়ে যে acrostic লিখেছিলেন, এ হল তাই। কিন্তু তাও বেশ জটিল ভাবে। কবিতাটা বাংলায় লেখা থাকলে কিছুই মানে বেরোয় না। মানে বেরোয় এটাকে phonetically যদি রোমানে লেখেন।"

-"অ্যাক্রস্টিক কী বস্তু?" জয়ন্ত বসাক প্রশ্ন করেন।

-"ওহ, জয়ন্ত বাবু, একটু সাহিত্য ওলটান। তাহলে কাজে সুবিধা হয়। Acrostic হল একরকমের কবিতা যার প্রতিটা লাইনের প্রথম অক্ষরটা নিলে কারোর একজনের নাম পাওয়া যায়। যেমন Through the looking glass-এ Alice কে নিয়ে Carroll লিখেছেন।

A boat, beneath a sunny sky
Lingering onward dreamily
In an evening of July -

Children three that nestle near,
Eager eye and willing ear,...

যাইহোক, সুজানের এই কবিতাটিকে যদি রোমান হরফে লেখেন, তাহলে পাঁচটি লাইনের প্রথম লেটারগুলো হয় যথাক্রমে – K, A, P, U, R – অর্থাৎ Kapur. আমি রূপককে কাল রাতে জিজ্ঞেস করি কাপুর পদবির কেউ আছে কিনা এখানে। কিন্তু কেউ নেই। হঠাৎ টিভিতে কোন একটি সিনেমার ক্রেডিট লিস্টে রনবীর কাপুরের নাম দেখে আমার মাথায় আসে যে কাপুররা বানান লেখেন KAPOOR, KAPUR নয়। সুতরাং আমি এটাকে জাস্ট উলটে দিতেই আমার কাছে সব পরিস্কার হয়ে গেল – RUPAK."

জয়ন্তবাবুর চোয়াল প্রায় ঝুলে বুকের কাছে নেমে এসেছে — এত অবাক হয়ে গেছেন। অনেক কষ্টে সামলে বললেন, "মা-নে?"

-"মানেটা আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে যদি আপনাদের একটা জিনিস দেখাই।" বলে সব্যসাচী টেবিলের ওপর থেকে ব্রাউনিংয়ের একটা বই হাতে নেন। পকেট থেকে একটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো বের করে বলেন, "এই কাগজটা মনে আছে, জয়ন্তবাবু? সুজান যেখানে খুন হয় সেখান থেকে পেয়েছিলাম। এবার দেখুন ছেঁড়া পাতার টুকরো কেমন মিলে যাবে এই বইটার একটি ছেঁড়া পাতার সাথে।" সব্যসাচী বইটা খুলে একটি পাতার কোণায় ওই টুকরোটা লাগিয়ে বলেন, "আমি এলিসার কাছ থেকে জানতে পারি যে ওইদিন সুজান একটি বই নিয়ে বেরিয়েছিল এবং জোহানের কাছ থেকে জানতে পারি ওইদিন সুজানের কাছে ব্রাউনিংয়ের একটা কবিতার বই দেখেছিল সে। বাকিটা দুই-এ দুই-এ চার। খুনের সময় কোনওভাবে বইএর ছেঁড়া পাতার টুকরো ঘটনাস্থলে পড়ে যায়। রূপক বইটা নিয়ে পালিয়ে আসে, কিন্তু এটা তার চোখ এড়িয়ে যায়।"

ঘরে পিন পড়লে শব্দ শোনা যাবে। সব্যসাচী টেবিল থেকে জলের বোতল নিয়ে জল খেতে যায়। রূপক ধীরে ধীরে বলে, "আমি আমার কয়েকটা জিনিস সাথে নিতে চাই। কয়েকটা বই। যদি পাশের ঘরে গিয়ে নিয়ে আসার অনুমতি দেন। ভয় নেই, পালাব না।"

সব্যসাচী মাথা নেড়ে অনুমতি দেন। রূপক উঠে যায়। জয়ন্তবাবু হতভম্ভ ভাবটা কাটিয়ে উঠেছেন খানিকটা। পকেট থেকে হ্যান্ডকাপ বের করে বলেন, "আমি তো ভাবতেও পারছি না।" শুভ এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। এবার বলেন, "আপনি ভাবতে পারবেন না বলেই তো, কাজটা সব্যসাচীকে দেওয়া হয়েছিল। থ্যাঙ্কস রে।" সব্যসাচী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু একটা জোর শব্দ শুনে সকলে চমকে উঠলেন। "বন্দুক, গুলি" বলেই জয়ন্ত বাবু পাশের ঘরে ছুটে গেলেন, পিছনে বাকিরা। রূপক সার্ভিস রিভলবার থেকে নিজেকে গুলি করেছে। হাতের মুঠোয় বন্দুক। অন্য হাতে একটা কাগজ।

ফেরার সময় শুভ গাড়ি করে বন্ধুকে পৌঁছে দেবেন বলেছিলেন। আসতে আসতে বললেন, "সুইসাইড নোটে কী লেখা রে? তোকে উদ্দেশ করে..."

সব্যসাচী খুব মনমরা হয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়ে ছিলেন বাইরে। আজকাল এই মৃত্যু জিনিসটা আর সহ্য করতে পারছেন না তিনি। শুভর কথাটা শুনে বললেন,

-"কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন,
চক্রে-পিষ্ট আঁধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন।

ওগো বন্ধু, সেই ধাবমান কাল
জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল—
তুলে নিল দ্রুতরথে
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে
তোমা হতে বহুদূরে।
মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে
পার হয়ে আসিলাম
আজি নব প্রভাতের শিখরচূড়ায়,
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম।
ফিরিবার পথ নাহি;
দূর হতে যদি দেখ চাহি
পারিবে না চিনিতে আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।”

অলংকরণঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

চিত্রকাহিনী

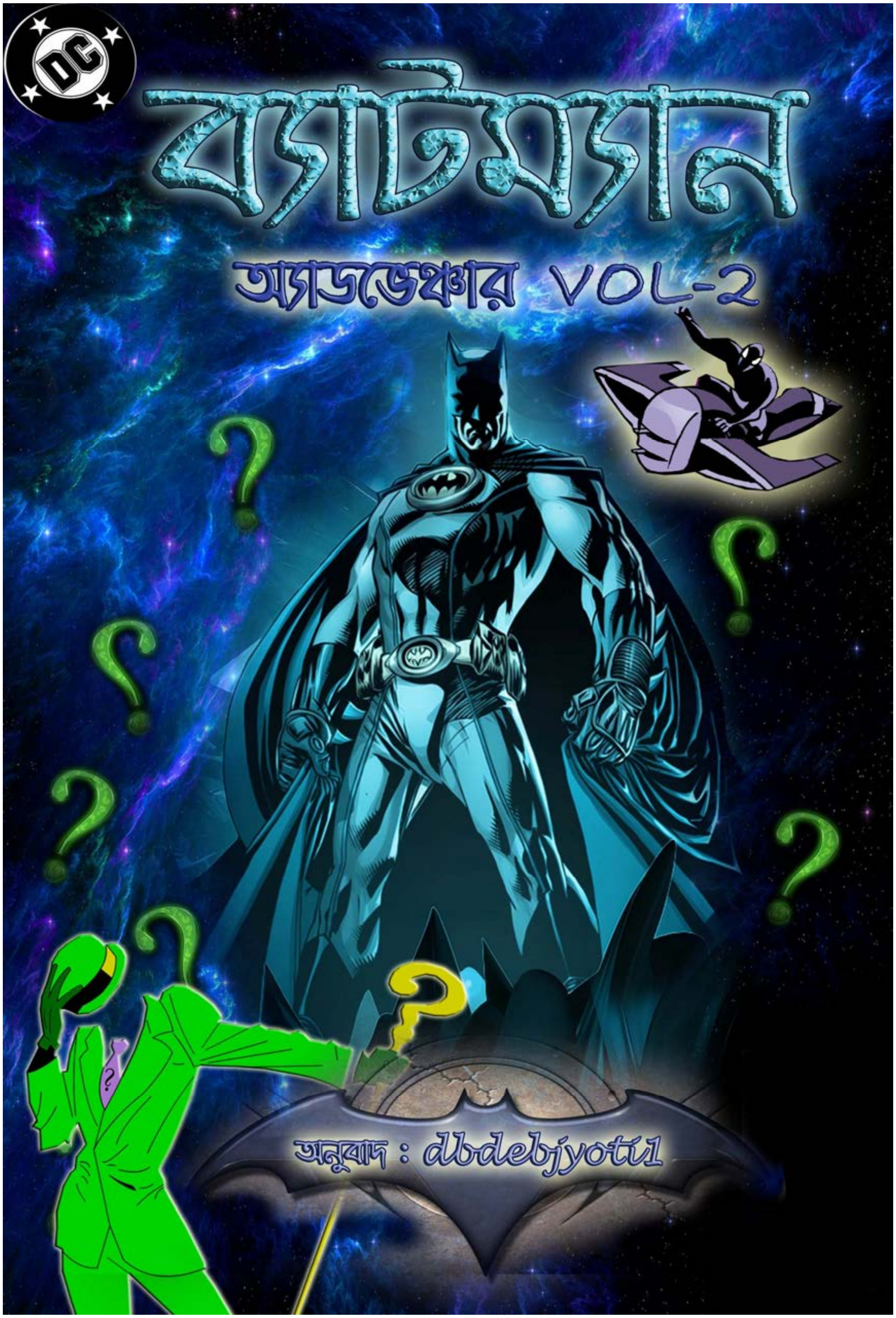

ওমনিকর্প বার্তা সংগঠন কোম্পানি এডওয়ার্ড নিগমা ওরফে 'রিডলার'-এর সাথে একটি ব্যবসায়ীক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চায় !

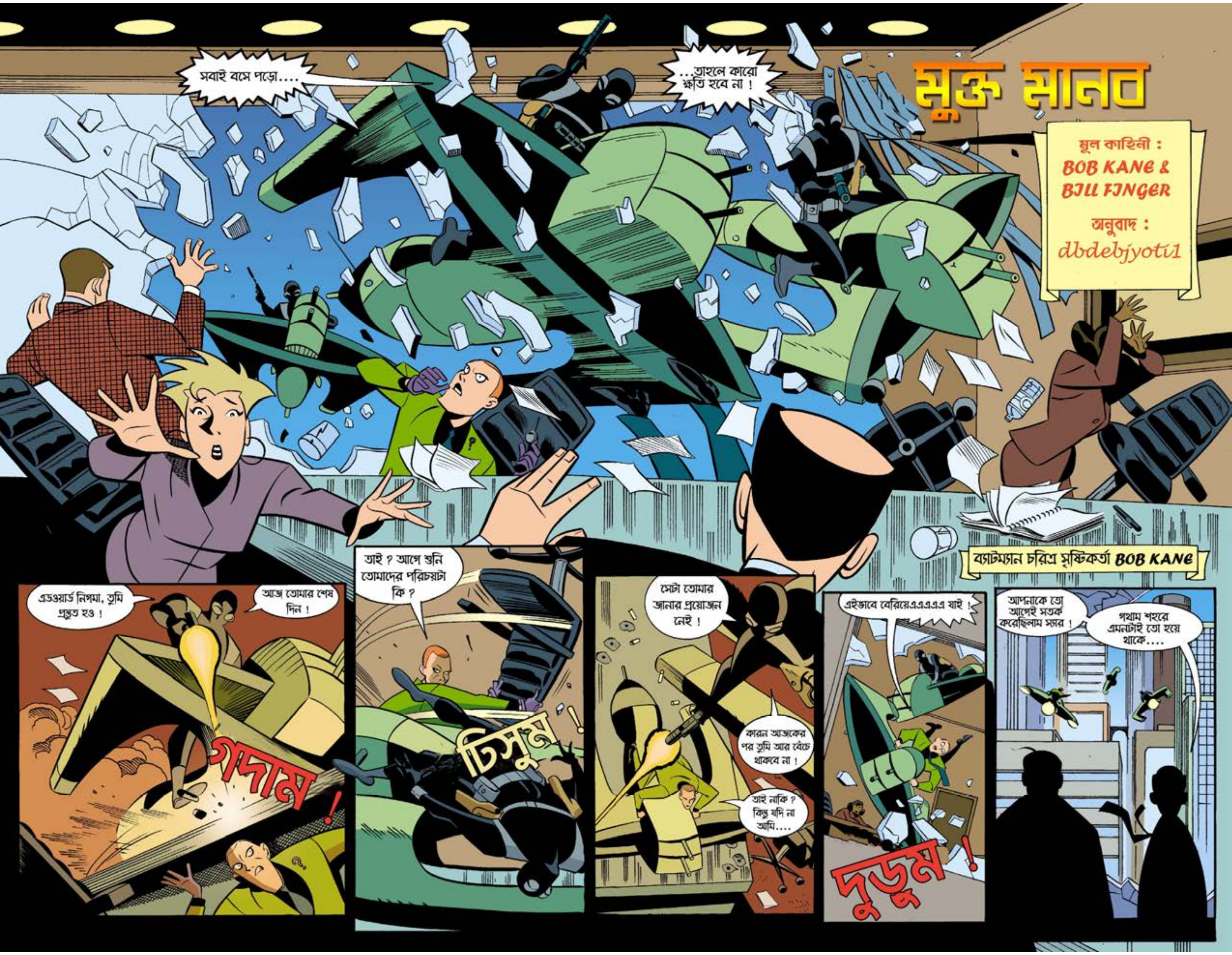
সবাই বসে পড়ো....
...তাহলে কারো ক্ষতি হবে না !
মুক্ত মানব
মূল কাহিনী :
BOB KANE & BILL FINGER
অনুবাদ :
dbdebjyoti1
ব্যাটম্যান চরিত্র সৃষ্টিকর্তা BOB KANE
এডওয়ার্ড নিগমা, তুমি প্রস্তুত হও !
আজ তোমার শেষ দিন !
গদাম !
তাই ? আগে শুনি তোমাদের পরিচয়টা কি ?
টিসুম !
সেটা তোমার জানার প্রয়োজন নেই !
কারন আজকের পর তুমি আর বেঁচে থাকবে না !
তাই নাকি ? কিন্তু যদি না আমি....
এইভাবে বেরিয়েএএএএএ যাই !
দুড়ুম !
আপনাকে তো আগেই সতর্ক করেছিলাম স্যর !
গথাম শহরে এমনটাই তো হয়ে থাকে....

আমাদের বসার সিটটা দারুন ব্রুস, তবে কিনা এত উপরে যে....
আসলে তুমি বলেছিলে 'সবার উপরে আমি তোমাকে চাই....' তাই এই সিটটাই আমি বেছে নিয়েছি !
গথাম নাইটস
গথাম গ্লোবস
গথাম
বুঝলাম ! আজ এটা নিয়ে আমাদের তৃতীয় সাক্ষাৎ। তোমার সম্পর্কে শুনেছিলাম তুমি নাকি একদিনের বেশি কোনো মেয়েকেই ডেট করো না ?
আমার সম্পর্কে ওসব গুজবে কান দিও না জুলি !
অবশ্যই চেষ্টা করব ব্রুস !
তবে কিনা তোমার সম্পর্কে গুজব না শুনে শহরের রাস্তায় হাঁটাই মুশকিল !
ইসস ! আর আমি দেখছি আমাদের মেয়রের মুখ দর্শন না করে কোথাও যাওয়াই দায় ! চারিদিকেই ওর মুখ দেখা যাচ্ছে !
মেয়র অসওয়াল্ড বলেন ' শহর আবর্জনা মুক্ত রাখুন ! '
এসব বিজ্ঞাপনে আর আমি বিরক্ত হই না !
বলো কি জুলি !! তুমি পেঙ্গুইনকে ভোট দিয়েছিলে ?!
শোনো ব্রুস, এই শহরের বেশিরভাগ মানুষই ওকে ভোট দিয়েছে ! তাই তো এবারের নির্বাচনে জয়ী হয়েছে, তাই না ?
হাজার হোক, আমি তো ওকেই ভোট দিয়েছিলাম !

কিন্তু তাই বলে পেঙ্গুইন ?!
নিশ্চয়ই ! কারনটা খুব স্পষ্ট ! সে বলেছিল ঐ ভয়ঙ্কর ব্যাটম্যানের হাত থেকে আমাদের মুক্ত করবে, সঙ্গে জোকার সমেত আর যারা যারা আছে তাদের হাত থেকেও....
??
কিন্তু ব্যাটম্যান আর জোকার কখনোই এক হতে পারে না....
এসব রাজনীতির ব্যপার নিয়ে তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছ ব্রুস ! আমরা তো এই প্রথমবার ঝগড়া করছি তাই না ?
মাস্টার ব্রুস ! দয়া করে এটা একবার শুনুন...
পানীয়
দয়া করে এটা একবার শুনুন... হে গথাম শহরের বিমূঢ় অধিবাসীবৃন্দ ! কোনো এক বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছিলেন 'মাধ্যমই হোলো বার্তার প্রতিরূপ'...
...আজ আমি বিপদে পড়ে এই বার্তা আপনাদের সামনে রাখছি !
কেউ আমাকে খুন করতে চাইছে ! দয়া করে আমাকে বাঁচান !
এটা জীবন-মরন সমস্যা ! কেউ দয়া করুন !
খুট্টুস !
খটাস !
জানতে চান আমি এখন কোথায় ?
খুব সহজ - একটা গরু চিত্রশিল্প দেখতে যেখানে যায়, আমিও এখন সেখানে !!!
দয়া করে জলদি আসুন !

এবার কী করবেন স্যর ?
ব্যপারটা তো ঠিক বুঝলাম না ! এ তো সেই লোকটা যে নিজেকে রিডলার বলে দাবী করে ! ও তো জেল ভেঙ্গে পালিয়েছিলো তাই না ?
বিপ ! বিপ !
হ্যালো ?
আমাদের সাথে নিশ্চয়ই কেউ মজা করেছে তাই না ? এটা কঠিন হতে পারে না....
হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি !
হ্যাঁ, সম্প্রচারটা আমিও দেখেছি !
নিঃসন্দেহে রিডলারের ধাঁধার উত্তর হল সংগ্রহশালা ! কিন্তু প্রশ্ন হল কোন সংগ্রহশালা ? এই শহরে এক ডজনেরও বেশি সংগ্রহশালা আছে ! আমি চেষ্টা করছি সম্প্রচারের উৎস খুঁজে বের করার ...
বেশ, তাই করো !
তুমি কি আদৌ আমার কথা শুনছ ব্রুস ?!
অত্যন্ত দুঃখিত জুলি ! একটা জরুরি কাজ পড়ে গিয়েছে ! অ্যালফ্রেড তোমাকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেবে !
অবশ্য যদি না আপনি পুরো ম্যাচটা এখানে বসে দেখতে চান....
কী বললে ?
তুমি নিশ্চয়ই আমার সাথে মজা করছ !!

ঘটাং !
ঘটাং !
ঘটাং !
ঘটাং !
আআআআ !
এটা কিভাবে চালায় রে বাবা ?!
সম্প্রচার সংক্রান্ত ঐতিহাসিক সংগ্রশালা
ঝড়াং !
আপনার সৌভাগ্যের দিন
আগুনে বন্দুক
তোমরা সত্যি কে বলোতো ?
আমি তোমাদের কী ক্ষতি করেছি ?
কোনো প্রশ্ন নয় এডওয়ার্ড !
কিন্তু আমি সত্যি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না ! তোমাদের কে পাঠিয়েছে ? এখানে এসব হচ্ছেটা কী ?
বেশ, আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করছি...
ঈশ্বর, বুদ্ধ না আল্লাহ, ?
কার নাম স্মরণ করবে ঠিক করো !!

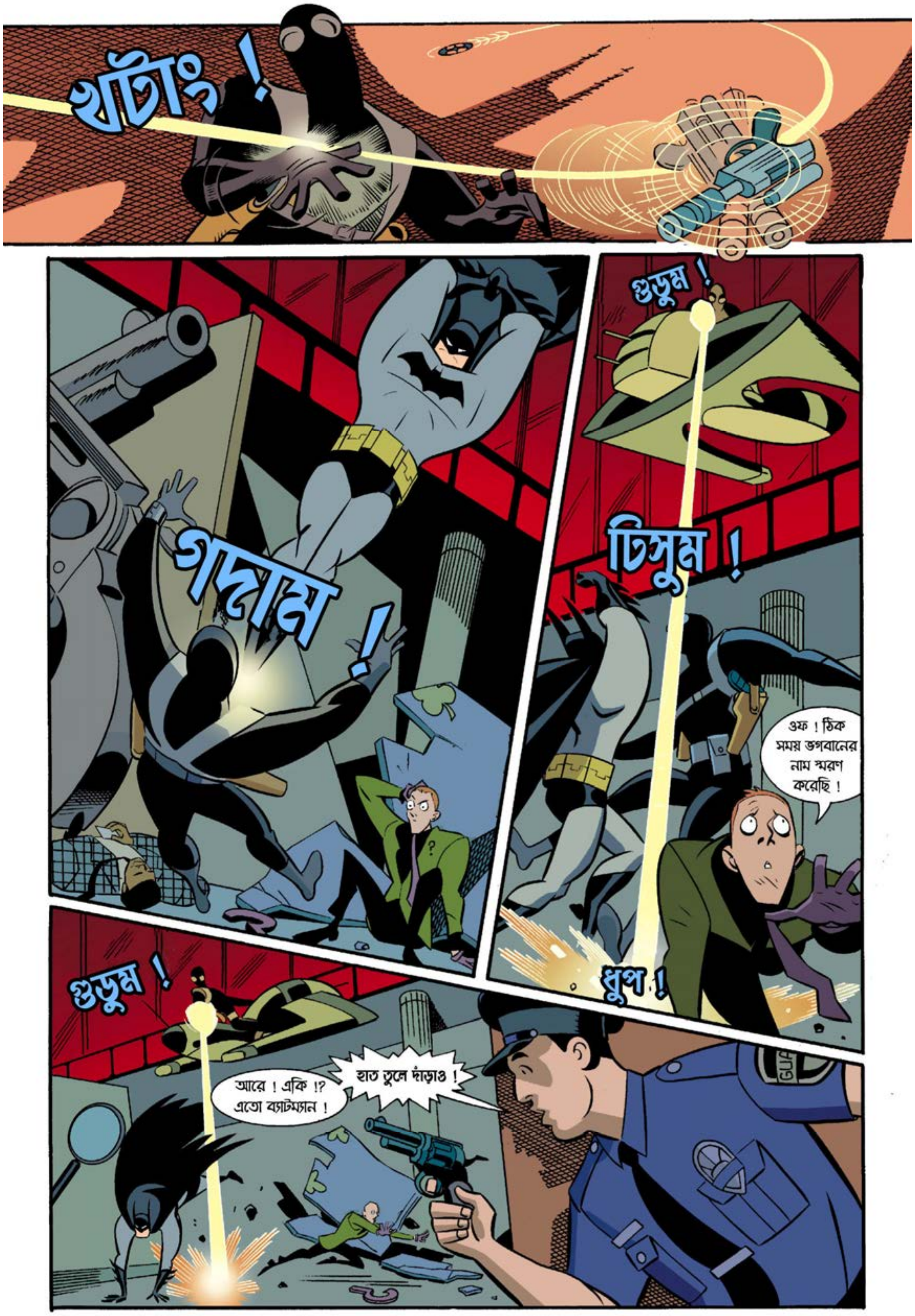
খটাং !
গদাম !
গুড়ুম !
টিসুম !
ওফ ! ঠিক সময় ভগবানের নাম স্মরণ করেছি !
ধুপ !
গুড়ুম !
হাত তুলে দাঁড়াও !
আরে ! একি !? এতো ব্যাটম্যান !

দ্যাখো ! এবার তুমি আমায় গোলাগুলির মধ্যে এনে ফেললে !
এই নাকি তুমি আমায় বাঁচাতে এসেছিলে !!
গুড়ুম !
চুপ করো এডি !
গুড়ুম !
ঐ দ্যাখো, অন্যজন পালাচ্ছে !
আমি মোটেই ওকে পালাতে দিচ্ছি না !
গুড়ুম !
দড়াম !

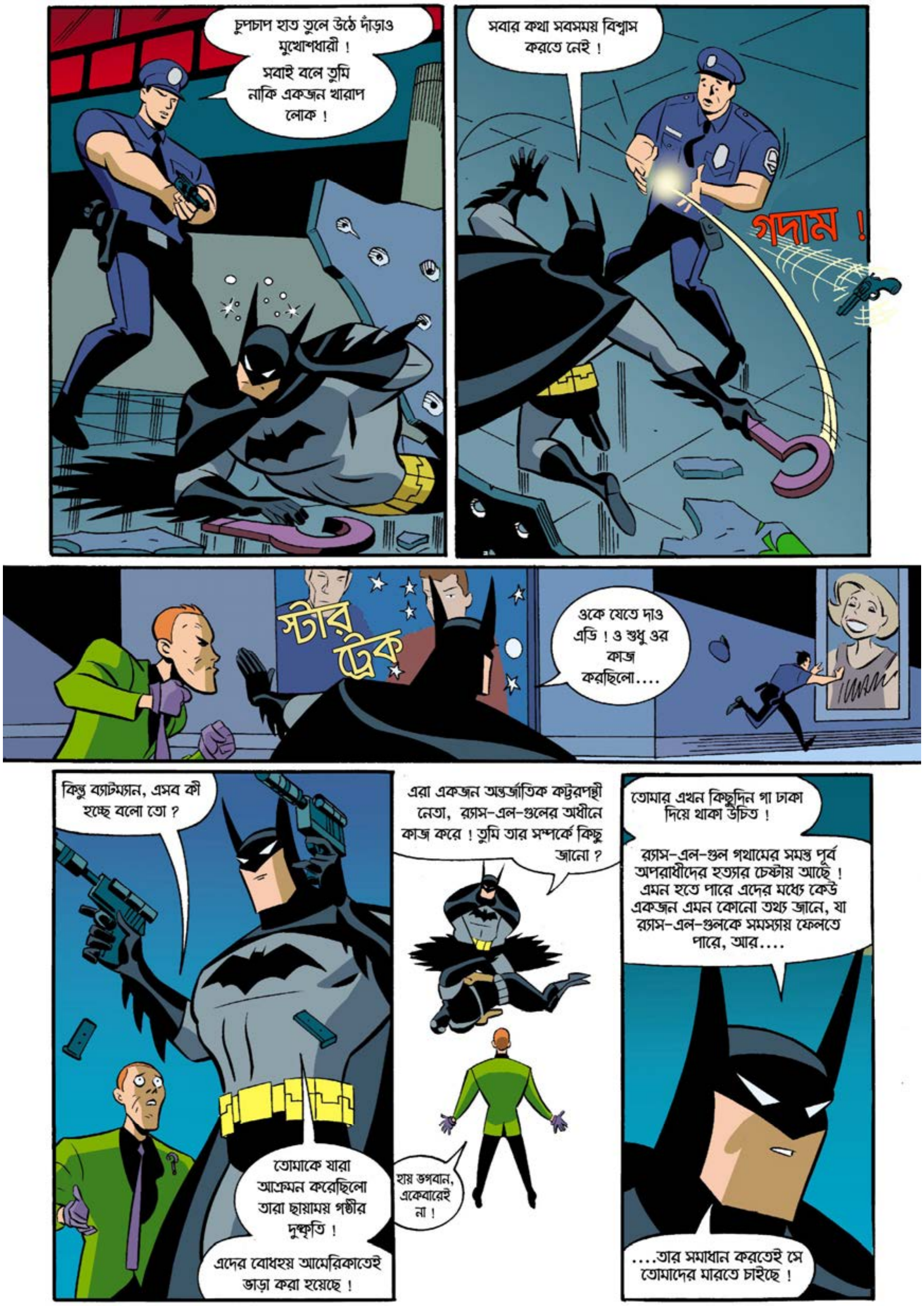
চুপচাপ হাত তুলে উঠে দাঁড়াও মুখোশধারী !
সবাই বলে তুমি নাকি একজন খারাপ লোক !
সবার কথা সবসময় বিশ্বাস করতে নেই !
গদাম !
স্টার ট্রেক
ওকে যেতে দাও এডি ! ও শুধু ওর কাজ করছিলো....
কিন্তু ব্যাটম্যান, এসব কী হচ্ছে বলো তো ?
তোমাকে যারা আক্রমন করেছিলো তারা ছায়াময় গম্ভীর দুষ্কৃতি !
এদের বোধহয় আমেরিকাতেই ভাড়া করা হয়েছে !
এরা একজন অন্তর্জাতিক কট্টরপন্থী নেতা, র‍্যাস-এল-গুলের অধীনে কাজ করে ! তুমি তার সম্পর্কে কিছু জানো ?
হায় ভগবান, একেবারেই না !
তোমার এখন কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকা উচিত !
র‍্যাস-এল-গুল গথামের সমস্ত পূর্ব অপরাধীদের হত্যার চেষ্টায় আছে ! এমন হতে পারে এদের মধ্যে কেউ একজন এমন কোনো তথ্য জানে, যা র‍্যাস-এল-গুলকে সমস্যায় ফেলতে পারে, আর....
....তার সমাধান করতেই সে তোমাদের মারতে চাইছে !

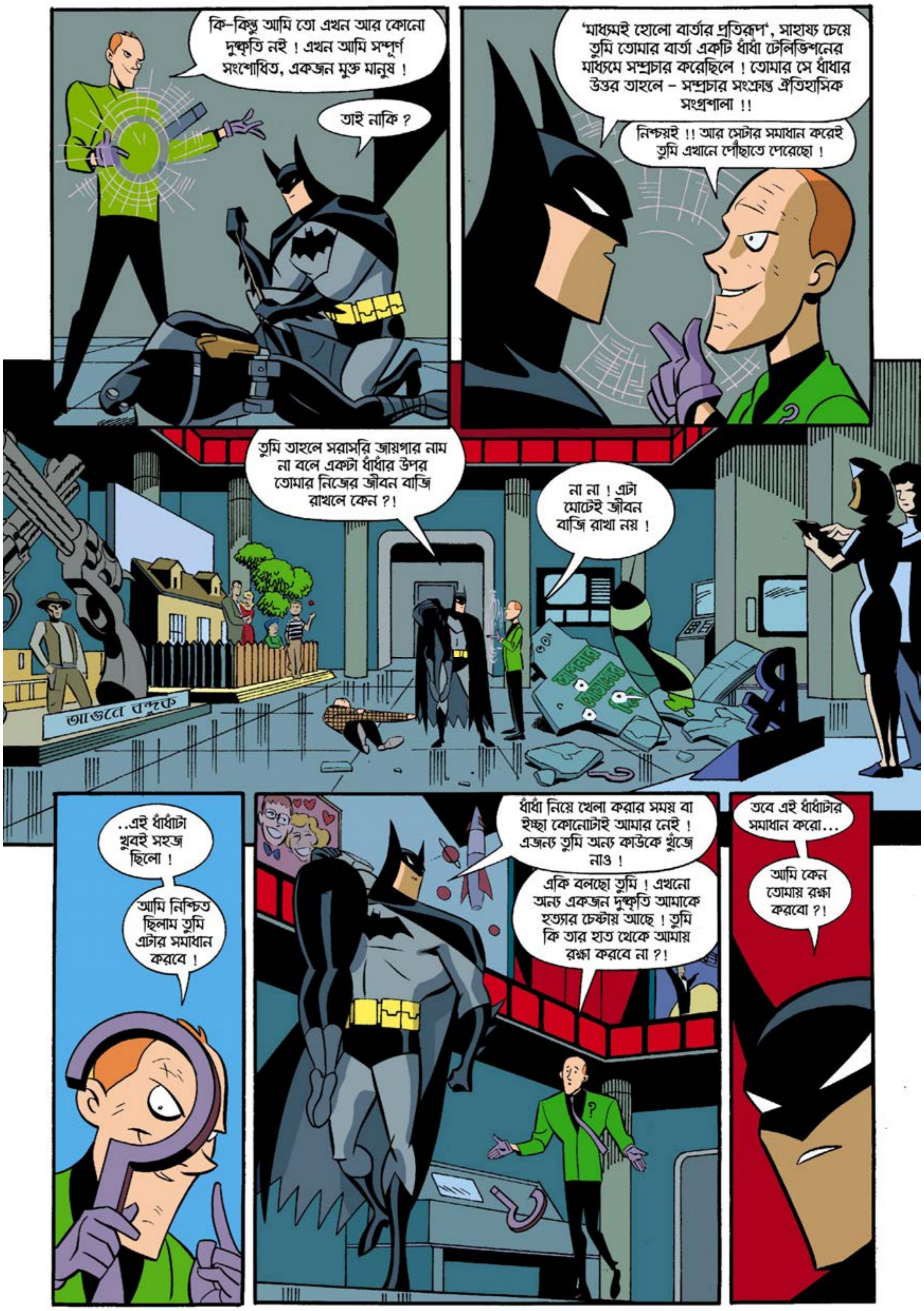
কি-কিন্তু আমি তো এখন আর কোনো দুষ্কৃতি নই ! এখন আমি সম্পূর্ণ সংশোধিত, একজন মুক্ত মানুষ !
তাই নাকি ?
'মাধ্যমই হোলো বার্তার প্রতিরূপ', সাহায্য চেয়ে তুমি তোমার বার্তা একটি ধাঁধা টেলিভিশনের মাধ্যমে সম্প্রচার করেছিলে ! তোমার সে ধাঁধার উত্তর তাহলে – সম্প্রচার সংক্রান্ত ঐতিহাসিক সংগ্রশালা !!
নিশ্চয়ই !! আর সেটার সমাধান করেই তুমি এখানে পৌঁছাতে পেরেছো !
তুমি তাহলে সরাসরি জায়গার নাম না বলে একটা ধাঁধার উপর তোমার নিজের জীবন বাজি রাখলে কেন ?!
না না ! এটা মোটেই জীবন বাজি রাখা নয় !
আগুনে বন্দুক
..এই ধাঁধাটা খুবই সহজ ছিলো !
আমি নিশ্চিত ছিলাম তুমি এটার সমাধান করবে !
ধাঁধা নিয়ে খেলা করার সময় বা ইচ্ছা কোনোটাই আমার নেই ! এজন্য তুমি অন্য কাউকে খুঁজে নাও !
একি বলছো তুমি ! এখনো অন্য একজন দুষ্কৃতি আমাকে হত্যার চেষ্টায় আছে ! তুমি কি তার হাত থেকে আমায় রক্ষা করবে না ?!
তবে এই ধাঁধাটার সমাধান করো...
আমি কেন তোমায় রক্ষা করবো ?!

পরিস্থিতিটা আমার ভালো ঠেকছে না !
আমরা আমাদের ভাই মার্টিনকে হারিয়েছি !
হুমম ! পরিস্থিতি সত্যিই জটিল দেখছি !
আরো খারাপ খবর হল লক্ষ্যবস্তুর সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে !
কিভাবে ?!
আমাদের ব্যাটম্যানের সাথে সংঘর্ষ হয়েছিলো ! আমরা ঐখান থেকে বেরিয়ে আসার আগেই আমার সঙ্গী ব্যাটম্যানের হাতে ধরা পড়ে !
মূল নির্দেশ অনুসরণ করো ! বেশি ঘাঁটিয়ে লাভ নেই, পরবর্তী লক্ষ্যবস্তুর পিছনে ধাওয়া করো !
কিন্তু প্রভু, আমি এখনও এই কাজটা শেষ করতে পারি !
না ! তুমি এখন.... হারিয়ে ফেলেছ..... ঘটাং !
নমস্কার বন্ধুগন, যারা টিভির পর্দায় চোখ রেখেছেন !
রাম, শ্যাম, যদু, মধু এবং আরো যারা টেলিভিশনের দর্শক আছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আরো একবার সম্প্রচারে বাধাদান করার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী ! কিন্তু মনে রাখবেন এটা জীবন-মরণ সমস্যা...
...আর আমার কাছে ব্যাটম্যানের বাড়ির ফোন নম্বরটাও নেই !

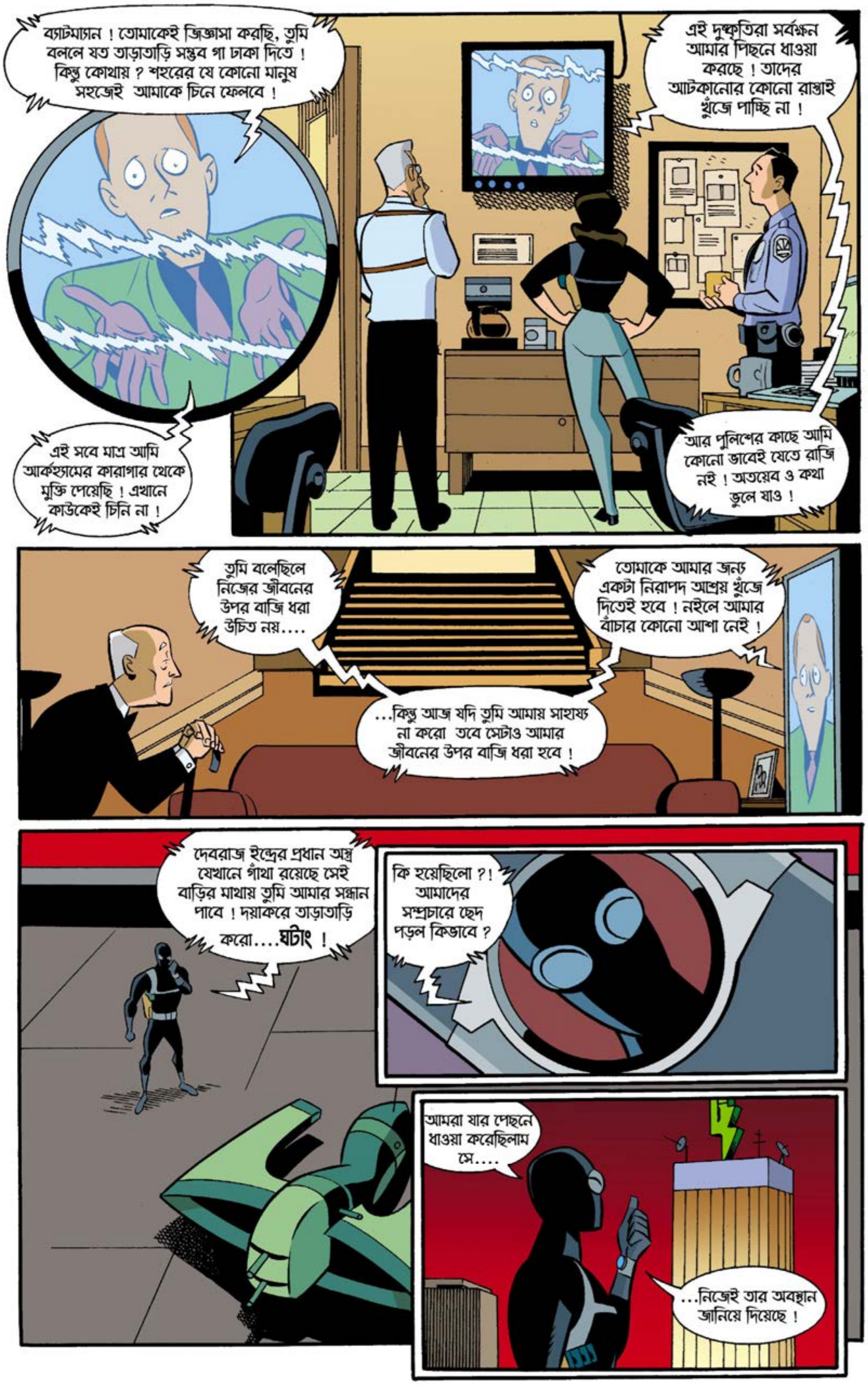
ব্যাটম্যান ! তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি, তুমি বললে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গা ঢাকা দিতে ! কিন্তু কোথায় ? শহরের যে কোনো মানুষ সহজেই আমাকে চিনে ফেলবে !
এই সবে মাত্র আমি আর্কহ্যামের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছি ! এখানে কাউকেই চিনি না !
এই দুষ্কৃতিরা সর্বক্ষন আমার পিছনে ধাওয়া করছে ! তাদের আটকানোর কোনো রাস্তাই খুঁজে পাচ্ছি না !
আর পুলিশের কাছে আমি কোনো ভাবেই যেতে রাজি নই ! অতয়েব ও কথা ভুলে যাও !
তুমি বলেছিলে নিজের জীবনের উপর বাজি ধরা উচিত নয়....
...কিন্তু আজ যদি তুমি আমায় সাহায্য না করো তবে সেটাও আমার জীবনের উপর বাজি ধরা হবে !
তোমাকে আমার জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে দিতেই হবে ! নইলে আমার বাঁচার কোনো আশা নেই !
দেবরাজ ইন্দ্রের প্রধান অস্ত্র যেখানে গাঁথা রয়েছে সেই বাড়ির মাথায় তুমি আমার সন্ধান পাবে ! দয়াকরে তাড়াতাড়ি করো....ঘটাং !
কি হয়েছিলো ?! আমাদের সম্প্রচারে ছেদ পড়ল কিভাবে ?
আমরা যার পেছনে ধাওয়া করেছিলাম সে....
...নিজেই তার অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে !

দেবরাজ ইন্দ্রের প্রধান অস্ত্র হল বজ্র, যেকোনো বাচ্চা ছেলেও এটা জানে !
ঐ বজ্রের মত চিহ্নটা বহুদিন ধরেই এই বাড়ির ছাদে শোভা পাচ্ছে ! মনে হয় ওখানেই...
তোমার বোধহয় ধারণা সবাই তোমার মতোই মূর্খ !
গুডুম !
গুডুম
গুডুম গুডুম
মোটেই না, বরং একটু বেশি মূর্খ !

ব্যাটম্যান, তুমি জানো যে আমি মৃত্যুবরণ করব, তবুও মুখ খুলব না !
আচ্ছা ? দেখা যাক !
তোমার দাঁতের ফাঁকে যে বিষের বড়িটা আছে, সেটার প্রভাব কাটানোর জন্য এই প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন করলাম !
এটা অবশ্যই তোমাকে শান্ত করবে !
ওফফফফ !
এবার তুমি কিছুদিনের জন্য নিরাপদ এডি !
ক্লিফোর্ড আরভিন বা এমিলি ডি হোরে –এর মত বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে কুখ্যাত জালিয়াতদের কথা আর তাদের সম্পর্কে তোমার মনভাব, সবকিছুই আমি ভালোই জানি !
তোমার এই সাজানো পুতুলের টোপটা দারুন কাজ করেছে তাই না ?!
ওহ ! ওটা শুধু ওকে লোভ দেখিয়ে টেনে আনার জন্য !
আসলে আমার মনে এখন একটা মিশ্র মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে ! এইযে আমার পরিবর্তে এই পুতুলটা গুলির ধাঁধাঁয় ঢাকা পড়ল, আর....
.ওর এই সুন্দর পোষাকটা নষ্ট হয়ে গেল, মানে....
এক মিনিট দাঁড়াও !...
গুলির ধাঁধাঁয় ঢাকা পড়ল !
পুতুলটার জায়গায় তো আমার থাকার কথা ছিলো !!
তোমার কি একথা একবারো মনে হয়নি !?!

আহা, ঐ পুতুলটার জায়গায় আমি থাকলে সেটাই হত আমার সঠিক পরিণতি !
এবার কী হবে ? একদিন আমি বাথটাবে শুয়ে থাকবো আর একটা বাস এসে আমায় চাপ দেবে ?! সেটা কী উচিত হবে ?
এরকম সুযোগ আর পাব না !
এবার একেবারে সঠিক সুযোগ এসেছিলো, তুমি সব বরবাদ করে দিলে !
তোমার মাথার ঠিক নেই এডি !
এভাবে বাইরে ঘোরা ফেরা করা তোমার উচিত নয় !
তুমি তোমার ডাক্তার আর আইনজীবীর চোখে ধুলো দিতে পারো, কিন্তু আমাকে ধোঁকা দিতে পারবে না !
তুমি এখন শহরের পানশালাগুলোর আশেপাশে ইচ্ছামতো ঘোরাফেরা করতে পারো...
...কিন্তু একজন মুক্ত মানুষ তুমি কখোনোই নও !
আগামী সংখ্যায় :
হার্লে
এবং
জোকার
এবং
দুষ্কৃতিরা
শীঘ্রই আসছে !